তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বিতীয় পারা

২

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

দ্বিতীয় খন্ড

তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বিতীয় খন্ড

২

দ্বিতীয় পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, সাবেক ইমাম ও খতীব
লালবাগ শাহী মসজিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক-মাসিক আল-বালাগ,
বহুগ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহঃ)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
ঢাকা

تفسير نور القران
للعلامة محمد امين الاسلام
الجزء الثانى

তৃতীয় প্রকাশ	ঃ	রজব ১৪২৯ হিঃ আগষ্ট ২০০৮ইং শ্রাবণ ১৪১৫ বাং
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম তারেক ১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা–১২০৭
সর্বস্বত্ত্ব	ঃ	প্রকাশকের
মূল্য	ঃ	তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র
মুদ্রণে	ঃ	সোবহান প্রিন্টিং প্রেস ৩০, প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
ফোন ঃ ০৩৭৭২০০৩৫৫৮

আন্-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭১৭৩৭২১

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার
ঢাকা

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
চকবাজার, ঢাকা
ফোন ঃ ৭৩২১৩৬৫

গাওসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, বাংলাবাজার, (ইসলামী টাওয়ার) ঢাকা

Tafsir-e-Nurul Quran (2): By Hazrat Moulana Mohammed aminul Islam, Published by Al-Balag Publications, 12/17, Sir Sayed ahmed Road, Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Price :350 $22.

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম করুণায় তফসীরে নূরুল কোরআনের দ্বিতীয় খণ্ড (পারা-২) প্রকাশিত হলো। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে পেশ করি সেজদায়ে শোকরানা।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, যাঁর উছিলায় আমরা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত অহরহ ভোগ করছি তাঁর প্রতি অগণিত দরূদ ও সালাম।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের কালাম, বিশ্ব-মানবের নামে আল্লাহ্ পাকের সর্বশেষ পয়গাম, মানব জাতির জন্যে আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত শুধু তাই নয়, বরং পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে মানুষের নিকট আমানতও বটে।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ

"নিশ্চয় আমি এ আমানত পেশ করেছি আসমান, যমীন এবং পাহাড়ের ওপর। অতঃপর তারা এ আমানত বহন করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ভয় করে আর মানুষ তা বহন করে"।

যদিও তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের "আমানত" শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু তফসীরকারদের একদল এই আমানতের ব্যাখ্যা করেছেন কোরআনে করীম।

হাদীস শরীফে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক লওহে মাহফুজকে পবিত্র কোরআনের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেনঃ আমার আমানত কোথায়? অর্থাৎ কোরআনে করীম যা তোমার নিকট আমানত রেখেছিলাম তা কি করেছ? লওহে মাহফুজ বলবে, হে রব ! আমি তা ইস্রাফিল (আঃ)-কে দিয়েছি। আল্লাহ্ পাক তখন ইস্রাফিল (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করবেন, হে ইস্রাফিল! তুমি আমার আমানত কি করেছ?

ইস্রাফিল (আঃ) বলবেন, আমি তা মিকাঈলকে দিয়েছি। মিকাঈল (আঃ) বলবেন, তা আমি জিব্রাঈল (আঃ)-কে দিয়েছি। আল্লাহ্ পাক জিব্রাঈলকে বলবেন, তুমি আমার আমানত কি করেছ? তিনি বলবেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার আমানত তোমার প্রিয় হাবীব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে দিয়েছি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, তোমরা আমার পেয়ারা হাবীবকে পেশ করো, তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর নিকট হাযির হবেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করবেন, হে আমার প্রিয় হাবীব! জিব্রাঈল (আঃ) আপনার নিকট আমার আমানত পৌছিয়েছে? তিনি জবাব দেবেন, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, আপনি আমার আমানত কি করেছেন? তিনি বলবেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আপনার আমানত আমার উম্মতের নিকট পৌছে দিয়েছি। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, হে আমার ফেরেশতাগণ! তোমরা আমার প্রিয় হাবীবের উম্মতকে হাযির করো, যেন আমি আমার আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরজ করবেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মত দুর্বল, তোমার মহান দরবারে হাযির হতে অক্ষম। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে অনুমতি দান কর, আমি যেন আদম (আঃ)-এর নিকট যেতে পারি। আল্লাহ্ পাক তাঁকে অনুমতি দান করবেন। তিনি তখন হযরত আদম (আঃ)-এর নিকট গমন করবেন এবং বলবেনঃ হে আদম! আপনি সমগ্র মানব জাতির পিতা, আর আমি তাদের নবী; যদি তারা কষ্ট পায় তবে তা আমাদের উভয়ের দুশ্চিন্তার কারণ হবে। অতএব, আমার উম্মতের সমস্ত গুনাহর অর্ধেকের দায়িত্ব আপনি গ্রহণ করুন, আর অর্ধেকের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করি– যাতে করে তারা হিসাব কিতাব এবং সওয়াল জবাব থেকে রক্ষা পায়। তখন হযরত আদম (আঃ) বলবেনঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমি আমার নিজের ব্যাপারেই অত্যন্ত পেরেশান রয়েছি, আমি কারো দায়িত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম নই। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যাবর্তন করবেন এবং আরশের ছায়া তলে সেজদারত হবেন এবং অত্যন্ত বেশী ক্রন্দন করতে থাকবেন এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মিনতি প্রকাশ করে বলবেনঃ হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার নিকট আমার নিজের ব্যাপারে কিছু চাই না এবং আমার কন্যা ফাতেমার ব্যাপারেও আমি কিছু চাইনা, হাসান হোসাইনের ব্যাপারেও আমি কিছু চাই না, আমি শুধু চাই আমার উম্মতের ব্যাপারে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ হে মোহাম্মদ! আপনি মাথা উত্তোলন করুন, আপনি যা চাইবেন তাই আপনাকে দেয়া হবে। আপনার উম্মতকে এমন কিছু দান করা হবে যা আপনার পছন্দনীয় হবে। কোরআন করীমে এ সম্পর্কে ঘোষণা রয়েছেঃ

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

অর্থাৎ আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে এমন কিছু দান করবেন যাতে করে আপনি সন্তুষ্ট হন।

এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কেয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনের আমানত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এমনিভাবে কেয়ামতের দিন পবিত্র কোরআনের ধারক-বাহক, পাঠক, গবেষক, প্রচারক ও অনুসারীদেরকে যে উচ্চ মর্তবা প্রদান করা হবে তারও ঘোষণা রয়েছে হাদীস শরীফে।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদেরকে জানাব যে কেয়ামতের দিন এই উম্মতের উত্তম লোক কারা হবে? সকলে বলল, হ্যাঁ, ইয়া রসূলাল্লাহ। তখন তিনি এরশাদ করলেন, যারা কোরআনে করীম পাঠ করে তারা। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক জিব্রাঈল (আঃ)-কে আদেশ দেবেন একটি ঘোষণা করার জন্য। ঘোষণাটি এই, যারা দুনিয়াতে পবিত্র কোরআন পাঠ করতো তোমরা দাঁড়াও। তখন জিব্রাঈল (আঃ) তিনবার এই ঘোষণা করবেন, অতঃপর কোরআন পাঠকগণ আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাতার বন্দী হয়ে দণ্ডায়মান হবে, তাদের মধ্যে কেউ কথা বলবে না। অবশেষে আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আঃ) দণ্ডায়মান হবেন। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তোমরা পবিত্র কোরআন পাঠ করো এবং উচ্চ স্বরে পাঠ করো। প্রত্যেকে তখন পবিত্র কোরআন পাঠ করবে, যতখানি আল্লাহ পাক তওফিক দান করবেন। তখন যারা পবিত্র কোরআন পাঠ করবে তাদের সুমধুর কণ্ঠ, মনের একাগ্রতা, ভয়-ভীতি এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তাদের চিন্তা–গবেষণার নিরীখে তাদের প্রত্যেকের মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ

"হে আমার আপন বন্দাগণ! তোমরা কি সে সব লোকের পরিচয় পাবে যারা দুনিয়াতে তোমাদের একান্ত আপন ছিল। তারা সকলে বলবে, হ্যাঁ, হে আমাদের পরওয়ারদেগার। তখন আল্লাহ পাক ঘোষণা করবেনঃ তোমরা হাশরের মাঠে ফিরে যাও, তোমাদের সকল আপনজনকে সঙ্গে নিয়ে নাও, তারাও তোমাদের সাথে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

অতএব, পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত করা এবং তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার প্রতি আমল করা ও তাঁর মহান বাণীকে সারা বিশ্বে পৌঁছে দেয়া মুসলমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

এ কর্তব্য পালনার্থেই তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা অব্যাহত রয়েছে। এ পর্যন্ত যে দু' খণ্ড প্রকাশিত হলো তা শুধু আল্লাহ পাকের অশেষ দয়া ও মেহেরবাণী

এবং তওফিকেই সম্ভব হয়েছে। আল্লাহ্ পাক দয়া করে যেন অবশিষ্ট খণ্ডগুলো পাঠক সমাজে পেশ করার তওফিক দান করেন এজন্যে সকলের নিকট আমরা দোয়া প্রার্থী।

প্রথম খণ্ডের সুদীর্ঘ-ভূমিকায় পবিত্র কোরআন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। পবিত্র কোরআনের জ্ঞান-পিপাসু মাত্রকে প্রথম খণ্ডটি সংগ্রহ করার অনুরোধ করি।

দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশের জন্য যারা আমাকে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের মধ্যে জনাব কে, বি আহমদ, জনাব কাজী আবদুল গোফরান, জনাব আলহাজ মোহাম্মদ জাফর সাদেকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

نیز جناب عارفین صاحب، جناب محمد احمد صاحب، جناب قمر صاحب، جناب عاشقین صاحب، جناب عبد المجید قاسم صاحب، اورجناب شکیل صاحب نے تفسیر نور القران جلد دوم کی اشاعت میں جس طرح تعاون کیا اللہ پاك ان کو اجر عظیم عطا فرمائے

আল্লাহ্ পাক তাদের মর্তবা বুলন্দ করুন এই মুনাজাত করি।

আমীন

মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম

১৫/১১/৮৫

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

সূচীপত্র

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
১। তফসীরুল কোরআন ২
২। শানে নুজুল ৪
৩। কেবলা পরিবর্তনের কারণ ৪
৪। কেবলা নির্দিষ্ট করার কারণ ৬
৫। সর্বোত্তম উম্মত ১০
৬। তোমরা সাক্ষী হবে মানুষের জন্য ১১
৭। শানে নুযুল ১৪
৮। মসজিদুল হারামের আকার ও আয়তন ১৮
৯। বায়তুল মোকাদ্দাস কতদিন কেবলা ছিল? ১৯
১০। শানে নুযুল ২১
১১। তফসীরুল কোরআন ২৫
১২। কেবলা পরিবর্তনের হেকমত ২৮
১৩। আল্লাহ পাকের স্মরণের তাৎপর্য ৩১
১৪। জিকরের ধারা ৩৩
১৫। জীবন-সমস্যার সমাধানে আল্লাহর সাহায্য কামনা ৩৯
১৬। সবরের তাৎপর্য ৪০
১৭। নামায হলো মোমেনের মে'রাজ ৪২
১৮। নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হলো নামায ৪২
১৯। শহীদ চিরঞ্জীব ৪৩
২০। পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৪৭
২১। সম্পদের ক্ষতি ৪৯
২২। প্রাণের ক্ষতি ৪৯
২৩। আ'মালুল কোরআন ৫৪
২৪। পূর্ববতী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৫৪
২৫। শানে নুযুল ৫৭
২৬। আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান ৫৯
২৭। আসাফ ও নায়েলা ৬১
২৮। জ্ঞানের কথা গোপন করা ৬২
২৯। তওবাকারীর জন্যে খোশখবরী ৬৪
৩০। শরীয়তের বিধান গোপনকারীর জন্যে সতর্কবাণী ৬৫

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
৩১। প্রিয়নবী (সঃ)-এর- বৈশিষ্ট্য ৬৬
৩২। এস্‌মে আজম ৬৯
৩৩। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ৭৬
৩৪। আল্লাহর মহব্বত সর্বাধিক ৮৩
৩৫। হযরত আবু বকরের (রাঃ) দৃষ্টান্ত ৮৪
৩৬। হযরত ওমরের (রাঃ) দৃষ্টান্ত ৮৪
৩৭। আ'মালুল কোরআন ৮৬
৩৮। প্রাণী জগতের রিয্‌ক দাতা কে ৮৮
৩৯। শয়তান ও তার অনুসরণ ৮৯
৪০। ইবলিস কখন আনন্দিত হয় ৯০
৪১। দোয়া কবুল হওয়ার কয়েকটি শর্ত ৯৫
৪২। হারাম বস্তুর কিছু বিবরণ ৯৬
৪৩। মাসআলা ৯৬
৪৪। بِغ শব্দের তফসীর ও কয়েকটি কথা ৯৯
৪৫। মাসআলা ৯৯
৪৬। পদ মর্যাদার মোহই তাদের ইসলাম গ্রহণে অন্তরায় হলো ১০১
৪৭। ইহুদীদের অপচেষ্টা ১০৩
৪৮। জঘন্য অপরাধ ১০৩
৪৯। সত্য-গোপনকারীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী ১০৪
৫০। প্রকৃত কল্যাণ ১০৬
৫১। আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ১০৯
৫২। কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ১১১
৫৩। নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ১১১
৫৪। আত্মীয়-স্বজনকে দান করা ১১২
৫৫। এতীম, মিসকীন এবং মুসাফির ১১৩
৫৬। আবেদনকারী ১১৪
৫৭। তফসীরুল কোরআন, শানে নুযুল ১১৫
৫৮। কয়েক ব্যক্তি দ্বারা এক ব্যক্তি নিহত হওয়া ১১৭
৫৯। এক ব্যক্তি দ্বারা কয়েক ব্যক্তি নিহত হওয়া ১১৭
৬০। অনিচ্ছাকৃত হত্যা ১১৮
৬১। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২০
৬২। অসিয়তঃ ওয়াজিব ১২০

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
৬৩। অসিয়তঃ মোস্তাহাব ১২১
অসিয়ত বৈধ ১২১
অসিয়ত অপছন্দনীয় ১২১
অসিয়ত অবৈধ ১২১
যে অসিয়ত কার্যকর হবে না ১২১
৬৪। তফসীরুল কোরআন ১২৪
৬৫। রোজা ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ ১২৪
সিয়াম সাধনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ১২৫
৬৬। সিয়াম সাধনা সম্পর্কে প্রিয়নবী (সঃ)-এর মহান বাণী ১২৬
৬৭। রোজার স্তর সমূহ ১২৮
৬৮। রোজা ঢাল স্বরূপ ১২৮
৬৯। মাগফেরাত লাভের অপূর্ব সুযোগ ১২৯
৭০। রোজার বিধানে তিনটি পরিবর্তন ১৩৩
৭১। পবিত্র কোরআন আল্লাহর নূর ১৩৬
৭২। মাহে রমজানের বৈশিষ্ট্য ১৩৭
৭৩। কয়েকটি মাসআলা ১৩৯
৭৪। আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব নেয়ামত ১৪০
৭৫। শানে নুযুল ১৪৮
৭৬। পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১৫৪
৭৭। উপার্জনের অবৈধ পন্থা সমূহ বাতিল ১৫৪
৭৮। আল্লাহর নাম বুলন্দ করার সাধনা ১৬২
৭৯। আল্লাহর রাহে জেহাদ পরিত্যাগ ধ্বংস ডেকে আনে ১৬৮
৮০। এহ্সানের তাৎপর্য ১৭০
৮১। হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম ১৭২
৮২। একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ১৭৩
৮৩। নিয়ত সঠিক করার তাগিদ ১৭৩
৮৪। হজ্জের তাৎপর্য ও নিয়ম কানুন ১৭৫
৮৫। তওয়াফের নিয়ম ১৭৮
৮৬। হজ্জের উপকারিতা ১৭৯
৮৭। এহরাম বাঁধার নিয়ম ১৮২
৮৮। কি কারণে হজ্জ বাতিল হয় ১৮৩
৮৯। কি কি কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় ১৮৩

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
৯০। হজ্জের পাঁচ দিন ১৮৩
৯১। প্রাণের মদীনায় ১৮৮
৯২। হজ্জের সফরে পাথেয় সংগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য ১৯৫
৯৩। হজ্জের সফরে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ নয় ১৯৬
৯৪। আরাফাত নামকরণের কারণ ১৯৮
৯৫। মাশআরে হারাম ১৯৯
৯৬। একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ২০০
৯৭। হজ্জের পর আল্লাহর জিকর থেকে গাফলতি না করার নির্দেশ ২০৪
৯৮। ইসলামের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার শুভ পরিণতি ২১৭
৯৯। ত্যাগ-তিতিক্ষা হতে হবে শরীয়ত মোতাবেক ২১৮
১০০। আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দান ২১৮
১০১। বেদআতের দুর্গ বিনষ্ট করাই হলো এ আয়াতের উদ্দেশ্য ২২০
১০২। বেদআতের প্রতি ভর্ৎসনা ২২১
১০৩। ইসলাম শুধু এবাদত বন্দেগীতে সীমিত নয় ২২১
১০৪। মূর্খতা ও আধুনিকতার ব্যাপারে সতর্কবাণী ২২২
১০৫। ইমাম রাজী (রঃ)-এর ব্যাখ্যা ২২২
১০৬। আল্লামা আলুসী (রঃ)-এর ব্যাখ্যা ২২৪
১০৭। বনী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত জ্বলন্ত নির্দশন সমূহ ২২৭
১০৮। চির শাশ্বত নীতি ২২৮
১০৯। পিতা-মাতার হক্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২৪১
১১০। মাসায়েলুল কোরআন ২৪২
১১১। জেহাদের ফজিলত ২৪৩
১১২। জেহাদ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য ২৪৭
১১৩। জেহাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী (দঃ)-এর প্রতি নির্দেশ ২৪৮
১১৪। একটি প্রশ্ন ২৫০
১১৫। মাসায়েলুল কোরআন ২৫৮
১১৬। মদ ও জুয়ার বিধান ২৬১
১১৭। আল্লাহ্র রাহে দানের পরিমাণ ২৬৬
১১৮। ব্যয় সম্পর্কে কর্তব্য ২৬৯
১১৯। এতীমের হক্ব ২৬৯
১২০। অমুসলিমের সাথে বিবাহ প্রসঙ্গ ২৭২
১২১। মাসআলা ২৭৪

বিষয় ..... পৃষ্ঠা
১২২। মাসআলা ২৭৪
১২৩। আল্লাহ্‌র নামে শপথ করা একটি মন্দ কাজ ২৮৫
১২৪। কসমের প্রকারভেদঃ পিতা-মাতার নামে কসমঃ ২৮৮
১২৫। ঈলা ২৮৯
১২৬। তালাকের প্রকারভেদ ২৯১
১২৭। তালাকের আহকাম ও মাসায়েল ২৯৫
১২৮। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কার? ২৯৯
১২৯। নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার ৩০০
১৩০। আমলের ব্যাপারে পার্থক্য নেই ৩০১
১৩০। স্ত্রী অপছন্দনীয় হলে, দ্বিতীয় বিবাহ করলে ৩০১
১৩১। একাধিক বিবাহের শর্ত ৩০২
১৩২। মতবিরোধ হলে ৩০২
১৩৩। যদি তিন তালাক প্রদত্ত হয় ৩০৫
১৩৪। অত্যন্ত অপছন্দনীয় বৈধ কাজ ৩০৬
১৩৫। শিশুকে স্তন্য দানের সময়-সীমা ৩১৪
১৩৬। ইদ্দতের বিধান ৩১৬
১৩৭। নামায ৩২৪
১৩৮। প্রিয়নবী (সঃ)-এর নামায ৩২৭
১৩৯। আবদুল্লাহ এবনে জোবায়ের (রাঃ)-এর নামায ৩২৮
১৪০। ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ)-এর নামায ৩২৮
১৪১। নামায ধর্মের খুঁটি ৩৩২
১৪২। আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা ও জবাব ৩৩২
১৪৩। সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব ৩৩৪
১৪৪। নামায পাপ প্রতিরোধক ৩৩৫
১৪৫। আধুনিক বিশ্বের সমস্যা সমাধানে নামায ৩৩৫
১৪৬। হযরত হাতেম আসেমের (রঃ) নামায ৩৩৭
১৪৭। নামায জাতীয় জীবনে (রহ.)-এর উন্নতির কারণ হয় ৩৩৮
১৪৮। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নামায ৩৪০

بسم الله الرحمٰن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

তফসীরে নূরুল কোরআন

দ্বিতীয় খণ্ড — দ্বিতীয় পারা

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي
كَانُوا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَنْ يَّشَآءُ إِلٰى
صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ
الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى
عَقِبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

তরজমা

(১৪২) অচিরেই নির্বোধ লোকেরা বলবে মুসলমানরা যে কেবলার অনুসারী ছিল সে কেবলা থেকে তাদেরকে কোন্ জিনিস ফিরিয়ে দিল? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, পূর্ব ও পশ্চিম একমাত্র আল্লাহ পাকেরই, তিনি যাকে ইচ্ছা সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেন।

(১৪৩) আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী জাতিরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি। যাতে তোমরা সমগ্র মানব মণ্ডলীর জন্য সাক্ষী হবে এবং রসূল সাক্ষী হবেন তোমাদের জন্যে, (হে রসূল!) ইতোপূর্বে আপনি যে কেবলার অনুসারী ছিলেন, আমি তাঁকে শুধু এজন্যই কেবলা করেছিলাম যেন একথা পরীক্ষা করে (প্রকাশ্যে) জেনে নেই– কে আমার রসূলের অনুসরণ করে আর কে পশ্চাদপসরণ করে। আর নিশ্চয় তা

অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক যাদেরকে হেদায়েত করেন, তাদের জন্য কঠিন নয়। আর আল্লাহ্ পাক এমন নন যে তোমাদের বিশ্বাস বিনষ্ট করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্য অত্যন্ত স্নেহশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন তখন প্রায় ষোল বা সতের মাস যাবত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে তথা বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায আদায় করেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাকের হেকমত এবং মর্জি মোতাবেক কা'বা শরীফকে কেবলা নির্দিষ্ট করতঃ নামায সু-সম্পন্ন করেন। আল্লাহ্ পাকই তাঁর অন্তরে কা'বা শরীফকে কেবলা বানাবার আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করেন। সে আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন, এমনকি বারে বারে আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। অবশেষে একদিন যখন কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণের আদেশ এসেছে তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে শুরু করেন, এতে ইহুদী, মুশরেক এবং মুনাফেকরা প্রশ্ন করে যে, এতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়তে আপত্তি হলোনা এখন হঠাৎ কি কারণে মুসলমানদের কেবলা পরিবর্তন হলো? তবে কি ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের কোন সন্দেহ রয়েছে? যে কারণে একবার বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা করা হয়, আবার কা'বা শরীফকে কেবলা নিদিষ্ট করা হয়। অথবা ইহুদীদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষের কারণেই কেবলার এ পরিবর্তন?

ইহুদী, পৌত্তলিক এবং মুনাফেকরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করার পূর্বেই আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের এ সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীর মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। এবনে জরীর তাবারী (রঃ) এর তফসীরে বলেছেনঃ اَلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ মূর্খ লোকেরা অচিরেই বলবে, এ মূর্খ লোক হলো ইহুদী এবং মুনাফেকরা।[১] এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ অদূর ভবিষ্যতে মূর্খরা বলবে, মুসলমানগণ যে কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করছিলেন সে কেবলা থেকে কোন্ জিনিস তাদেরকে ফিরিয়ে দিল? কোন্ কারণে তারা কেবলা পরিবর্তন করলেন?

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক দূরাত্মা কাফের মুশরেকদের এবং ইহুদী ও মুনাফেকদের এহেন ভিত্তিহীন প্রশ্নের জবাব দিয়ে এরশাদ করেছেন ঃ

(হে রসূল!) আপনি বলুন, তাদের এ সমস্ত আস্ফালন সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অবান্তর। তাদের এসব কথাবার্তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। ইহুদীদের বিরোধিতা বা ইসলাম সম্পর্কে কোন প্রকার সন্দেহ এর কারণ নয়।

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১

বরং আল্লাহ পাকের আদেশ পালন, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশই এর মূল কারণ। যখন বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণের আদেশ হয়েছে তখন সে আদেশ পালন করেছি। আর যখন কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশ হয়েছে তখন তাকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছি। আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশই ইসলাম ধর্মের মূলকথা। এখানে নিজের ইচ্ছা-মাফিক কোন কিছু করার কোন ব্যবস্থা নেই। এজন্যে আমাদের নিকট আল্লাহর কোন নির্দেশের কারণ জানতে চাওয়া নির্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই হতে পারেনা।

পৌত্তলিক, ইহুদী ও মুনাফেকরা পরে কি বলবে তার খবর পবিত্র কোরআন পূর্বেই দিয়েছে, এতে পবিত্র কোরআনের সত্যতা প্রমাণিত হলো এবং কাফেরদের জ বাব দেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ হলো। এতদ্ব্যতীত হঠাৎ কোন পরিবর্তনকে গ্রহণ করে নেয়া কখনো অসুবিধাজনক হয়ে যায়। এজন্য পূর্বেই খবর দিলে, সে পরিবর্তনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করা সহজ হয়।[১]

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ

(হে রসূল!) আপনি বলুনঃ পূর্ব পশ্চিম তো আল্লাহরই অর্থাৎ সকল দিক, সকল স্থান, সকল কাল এক কথায় সব কিছুই তো আল্লাহ পাকেরই। তিনিই তো একমাত্র মালিক মোখতার? তিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান। একচ্ছত্র কর্তৃত্ব শুধু তাঁরই। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথের দিকে হেদায়েত করেন। অতএব, কেবলা নির্ধারণ মূল উদ্দেশ্য নয়, আর তা এবাদতও নয়; বরং আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণই হলো মূল লক্ষ্য। এজন্যে এটি মুসলিম জাতির সৌভাগ্য যে আমরা আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করার গৌরব অর্জন করেছি।

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত বরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত এই হাদীসে রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৬ বা ১৭ মাস যাবত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। তাঁর একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল, কা'বা শরীফ তাঁর কেবলা হিসেবে নিদিষ্ট হোক। তাই আদেশ লাভ করা মাত্র কা'বা শরীফের দিকে ফিরে সর্বপ্রথম আছরের নামায আদায় করেন। তাঁর সাথে যারা নামায আদায় করেছিলেন তন্মধ্যে একজন অন্য একটি মসজিদের পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে মুসুল্লীগণকে রুকু অবস্থায় দেখে বলেছিলেনঃ আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি মক্কার দিকে ফিরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করে এসেছি, একথা শ্রবণ করা মাত্র সকলে মক্কার দিকে ফিরেছেন।[২]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৭

(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪

শানে নুযুল

এখানে উল্লেখ্য, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করেন তখন বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার আদেশ হয়। সে কারণে ১৬ বা ১৭ মাস যাবত বায়তুল মোকা-দ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়া হয়। কিন্তু হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আকা-ক্ষা ছিল কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ দিলেন। ফলে ইহুদীরা ঈর্ষান্বিত হলো এবং অনেক আপত্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করলো। তারই জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ

অর্থাৎ পূর্ব-পশ্চিম তথা সকল দিক একমাত্র আল্লাহরই। তিনিই এর একমাত্র মালিক এবং অধিকর্তা। অতএব, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তথা তিনি যেদিকে ফিরে নামায আদায় করার নির্দেশ দেন সেদিকে ফিরে নামায আদায় করাই হলো প্রকৃত মোমেনের কর্তব্য। আর এ কর্তব্য পালনের তৌফিক আল্লাহ পাক যাকে দান করেন তাকেই সরল সঠিক পথ তথা সীরাতুল মুস্তাকীমের হেদায়েত করেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পথ প্রর্দশন করেন।

কেবলা পরিবর্তনের কারণ

(১) তফসীরকারগণ কেবলা পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক বর্ণনা করেছেন, যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে জীবন বিধান নিয়ে এসেছেন তা পরিপূর্ণ, তাই তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে সমস্ত নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হয়। আর পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান সমস্ত আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমানেরই নামান্তর। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কেরামের মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তারই সমন্বিত রূপ প্রকাশিত হয়েছে প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে। পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সকল শরীয়তকে একত্রিত করে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান রূপে পেশ করা হয়েছে। কথাটিকে এভাবে বলা যেতে পারে যে, ছোট ছোট কতকগুলো পথকে একটি রাজপথে পরিণত করে দেয়া হয়েছে, ইসলামই সে রাজপথ। অথবা এর আরেকটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে যেমন সকল সুগন্ধি ফুলের নির্যাসকে একত্রিত করে একটি শিশিতে পরিপূর্ণ করে দেয়া হয়েছে, সে পরিপূর্ণ ফুলটির নাম হলো ইসলাম। আর এ পরিপূর্ণতা আনয়নকারী হলেন নবীগণের দলপতি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের দুটি কেবলা রয়েছে– (১) কা'বা শরীফ (২) বায়তুল মোকাদ্দাস। উভয় কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায়ের মধ্যে এ পরিপূর্ণতার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়েছে মক্কা মোয়াজ্জমায়। তাই কা'বা শরীফের সঙ্গে তাঁর যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। পরবর্তীতে দ্বীন ইসলামের প্রয়োজনে আল্লাহ পাকের আদেশক্রমে যখন মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন এবং মদীনা মোনাওয়্যারায় ইসলাম একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে প্রকাশিত ও প্রমাণিত হলো, তখন কিছুদিনের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। কেননা, দুনিয়ায় সকল ধর্ম প্রাণ মানুষের নিকট উভয় কেবলাই অত্যন্ত সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ স্থান, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বকালের সর্বদেশের সকল জাতির নিকট প্রেরিত নবী। এজন্যে উভয় কেবলার দিকে ফিরে তিনি নামায আদায় করেছেন। মদীনা তৈয়্যেবায় যখন তাঁর নবুওয়্যতের যাবতীয় গুণাবলীর পরিপূর্ণতার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে তখন কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায়ের হুকুম হয়েছে কেননা, এটিই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত আকাঙ্ক্ষা।[১]

(২) কেবলা পরিবর্তনের দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফ হিজরত করেন। এ সফরে বায়তুল মোকাদ্দাস অভিমুখে তাঁকে গমন করতে হয়। কেননা মদীনা শরীফ মক্কা শরীফ থেকে উত্তর দিকে, আর বায়তুল মোকাদ্দাস মদীনা শরীফে থেকে উত্তর দিকে। বায়তুল মোকাদ্দাস পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাধনার কেন্দ্র এবং কেবলা ছিল। হিজরতের এ জাহেরী সফরে যেহেতু তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরেছেন তাই নামাযও বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে আদায় করেছেন। কেননা, নামায হলো আল্লাহ পাকের দিকে বাতেনী সফর। অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জাহেরী এবং বাতেনী সফরে একটা সামঞ্জস্য বিধান হলো কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে।

(৩) কেবলা পরিবর্তনের তৃতীয় কারণ হলো, একথা সর্বজন-বিদিত যে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তাঁর বিশেষ দয়ায় মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন সময় বহু মোজেযা দান করেছেন এবং তাঁদের সম্পর্কে মানুষের মনে যেসব সন্দেহের উদ্রেক হয় সেসব সন্দেহ থেকেও তিনি তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন। যেমন প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে নবী ছিলেন তেমনি রাষ্ট্রনায়কও ছিলেন এখন কোন অবুঝ লোকের অন্তরে এ অহেতুক সন্দেহ হতে পারে যে, তিনি ক্ষমতা লাভের জন্যেই সব কিছু করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কেবলা পরিবর্তনের মাধ্যমে একথা প্রমাণিত হলো যে, তিনি স্বেচ্ছায় কিছুই করেন না, স্বীয় ক্ষমতায় কিছু

(১) তফসীরে হক্কানী ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৪।

করেন না; বরং আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয় তাঁর যাবতীয় কর্মকাণ্ড, আর আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হয় তাঁর যাবতীয় সংগ্রাম সাধনা, আর আল্লাহ্ পাকের প্রতিই তাঁর পরিপূর্ণ ভরসা, আল্লাহ পাকের নিকটই তাঁর সকল আশা। এজন্যে কে কি সমালোচনা করল ইহুদী বা মুনাফেকরা কি বলল, তার প্রতি তিনি ভ্রুক্ষেপ করেন না। সর্বদা তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে এক আল্লাহ পাকের হুজুরের দিকে যখন তিনি মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় ছিলেন তখন তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ও কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। মদীনা মোনাওয়্যারায় আগমনের পর আল্লাহ পাকের হুকুমে কিছুদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করেছেন। আর যখন আল্লাহর আদেশ হয়েছে তখন পুনরায় তিনি কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনই তাঁর মিশন এবং বৈশিষ্ট্য।[১] এজন্যেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى- الاية

অর্থাৎ তিনি নিজের ভাবাবেগে কোন কথা বলেন না। যা ওহীরূপে তাঁর নিকট আসে তাই তিনি বলেন। অতএব, তাঁর কোন কথায় বা কাজে সন্দেহ পোষণ করা নিবুর্দ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এ কারণেই কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে কাফের-মুশরেক-মুনাফেকরা যে সন্দেহ পোষণ করবে তার সংবাদ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে পূর্বেই দিয়েছেন এবং যারা সন্দেহ পোষণকারী তাদেরকে "সোফাহা" বলেছেন।

سَيَقُوْلُ السُّفَهَآءُ

সোফাহা শব্দটি "সফিহুন" এর বহুবচন"। অর্থাৎ নির্বোধ। যারা নির্বোধ তারা অদূর ভবিষ্যতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলবে। পূর্বেই খবর দেয়ার কারণে জবাবের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা সহজতর হলো। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এর জবাবও প্রদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত পূর্বেই খবর দেয়া পবিত্র কোরআনের মোজেযা হওয়ারও একটি নিদর্শন।[২]

কেবলা নির্দিষ্ট করার কারণ

এ পর্যায়ে এ আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, নামাযের জন্যে কেবলা নির্দিষ্ট করার মধ্যে কি রহস্য রয়েছে? এ সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) তফসীরে কবীরে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই, নামাযের মধ্যে "হুজুরে ক্বল্ব" বা মনের একাগ্রতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এ "হুজুরে ক্বলব" অর্জনের জন্য

(১) তফসীরে হক্কানী, ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৫।
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯১

নামাযী মাত্রের একটি দিক নির্দিষ্ট করা অত্যন্ত জরুরী। মূলতঃ এ কারণেই নামাযের জন্য কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ পাক মোমেনদের পরস্পরের ঐক্য ও সম্প্রীতি পছন্দ করেন। পবিত্র কোরআনের বহু আয়াতে দুনিয়ার সকল মোমেনদেরকে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য হয়ে জীবন যাপনের তাগিদ রয়েছে। যদি মুসলমানগণ একই কেবলার অনুসারী না হয় তবে তাদের মধ্যে অনেক মতভেদ ও অনৈক্য দেখা দেবে, তাই দুনিয়ার সকল মুসলমানের জন্য অভিন্ন কেবলা নিদিষ্ট করা হয়েছে, যাতে করে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন থাকে।

এতদ্ব্যতীত, কেবলা নির্দিষ্ট হওয়ার ফলে আল্লাহ্ পাক যেন মোমেনদেরকে এভাবে সম্বোধন করেছেনঃ "হে মোমেনগণ! তোমরা আমার বন্দা, আর কা'বা আমার গৃহ, আর নামায আমার খেদমত বা বন্দেগী অতএব, তোমরা আমার গৃহের দিকে ফিরে আমার বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ কর"।

আর মুসলমানদের জন্য কা'বা শরীফকে কেবলা নিদিষ্ট করা হয়েছে–

لِاَنَّهَا قِبْلَةُ خَلِيْلِ اللّٰهِ، وَمَوْلِدُ حَبِيْبِ اللّٰهِ

কেননা, এটি ছিল হযরত ইব্রাহীম খলিলুল্লাহর (আঃ) কেবলা, আর আল্লাহর হাবীব হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্মস্থান। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেনঃ কা'বা শরীফ পৃথিবীর মধ্যস্থল ও কেন্দ্রবিন্দু। কাজেই আল্লাহ পাক সমস্ত মুসলমানদেরকে নামাযে কা'বা শরীফ মুখী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এতে সর্ব বিষয়ে মধ্য-পন্থা অবলম্বনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কা'বা শরীফকে কেবলা নির্ণয়ের মাধ্যমে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর ভালবাসার প্রমাণ দিয়েছেন। কেননা কা'বা শরীফ কেবলা হওয়ার ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই আল্লাহ পাক তাঁর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করে কা'বা শরীফকে কেবলা রূপে ঘোষণা দিলেন। আর এতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, "আপনার পছন্দনীয় কেবলা" (একথা বলেননি) "আমার পছন্দনীয়"।

এতে যেন আল্লাহ পাক এভাবে এরশাদ করেছেনঃ "হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! সকলেই আমার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী আর আমি উভয় জগতে আপনার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী। পৃথিবীতে যে আপনার সন্তুষ্টির প্রত্যাশী তার প্রমাণ হলো কা'বা শরীফকে কেবলা ঘোষণা করা আর আখেরাতের দৃষ্টান্ত হলো–

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ "অচিরেই (আখেরাতে) আপনার প্রতিপালক আপনাকে এত নেয়ামত দান করবেন যাতে আপনি সন্তুষ্ট হবেন"।[১]

وَكَذٰلِكَ অর্থাৎ এভাবেই তথা শুধু এ ব্যাপারেই নয়, বরং হে মুসলমানগণ সব বিষয়ে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী তথা– সর্বোত্তম জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।[২]

كَمَا اَكْرَمْنَاكُمْ بِدِيْنِ اِبْرٰهِيْمَ

وَكَذٰلِكَ অর্থাৎ হে মুসলিম জাতি! যেভাবে দ্বীনে ইব্রাহীম দ্বারা তোমাদেরকে সম্মানিত করেছি এভাবে তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি।

অর্থাৎ যেভাবে সর্বোত্তম কেবলা কা'বা শরীফকে তোমাদের কেবলা করেছি, হে মুসলিম জাতি! এভাবে তোমাদেরকে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছি।[৩]

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ– الاية

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে মধ্য-পন্থী তথা সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি"।

وَكَذٰلِكَ অর্থাৎ এভাবে। প্রশ্ন হলো কিভাবে? তফসীরকারগণ এর একাধিক জবাব দিয়েছেনঃ

(১) হে উম্মত মোহাম্মাদিয়া! যেভাবে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছি ঠিক এভাবেই তোমাদেরকে উত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি।

(২) অথবা এ অর্থও হতে পারে, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছি তেমনি হে মুসলমানগণ! আমি তোমাদেরকেও সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছি।[৪]

শায়খুল ইসলাম আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, হে মোমেনগণ! যেভাবে তোমাদের কেবলা নির্দিষ্ট হয়েছে কা'বা শরীফ যা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলা এবং সর্বোত্তম কেবলা, ঠিক তেমনি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মনোনীত করেছি এবং তোমাদের পয়গম্বরকে সর্বশ্রেষ্ঠ পয়গম্বর নবীগণের দলপতি বা সাইয়্যেদুল মুরসালীন করেছি। যাতে করে তোমাদের এ শ্রেষ্ঠত্ব ও উচ্চ মর্যাদার গুণে কেয়ামতের কঠিন দিনে অন্য সমস্ত উম্মতের তুলনায়

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৫
তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫
(২) তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ২০
(৩) খোলাসাতুত্তাফাসীর পৃষ্ঠা, ৮৬
(৪) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩৮

অধিকতর নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত সাক্ষী প্রমাণিত হও এবং তোমাদের নিকট প্রেরিত নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে সাক্ষ্য দান করতে পারেন।[১]

এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন যে, কেয়ামতের দিন পূর্বকালের উম্মত সমূহের কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত আম্বিয়ায়ে কেরামের কথাকে অস্বীকার করবে এবং বলবে পৃথিবীতে আমাদেরকে হেদায়েত করার জন্য কেউ আসেনি তখন নবীগণের পক্ষে উম্মতে মোহাম্মদীয়া এ সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গম্বরগণ ধ্রুব সত্য কথা বলেছেন, তাঁরা তাঁদের উম্মতের হেদায়েতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এ ভাগ্যাহত লোকেরা তাঁদের হেদায়েত মেনে চলেনি। এর প্রতি-উত্তরে কাফেররা বলবে আমাদের ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না কেননা, তারা আমাদের যুগ দেখেনি তারা আমাদের অনেক পরে এসেছে। তখন উম্মতে মোহাম্মদীয়া জবাব দেবে, আমরা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ পবিত্র কোরআনের প্রতি এবং আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমেই আমরা অবগত হয়েছি যে, নবীগণ তাদের হেদায়েত করেছেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দেবেন যে, আমার উম্মত ঠিকই বলেছে, তাদের সাক্ষ্য সম্পূর্ণ সত্য।[২]

মসনদে আহমদে রয়েছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন নূহ (আঃ)-কে সর্ব প্রথম ডাকা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তুমি কি আমার পয়গাম আমার বন্দাদেরকে পৌঁছিয়েছ? তখন হযরত নূহ (আঃ) বলবেন, হে আল্লাহ! আমি পৌঁছিয়েছি।[৩]

এরপর হযরত নূহ (আঃ)-এর উম্মতকে হাযির করে জিজ্ঞাসা করা হবে, নূহ (আঃ) কি আমার কথা তোমাদের নিকট পৌঁছিয়ে ছিলেন? কিন্তু তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করবে এবং বলবে আমাদের নিকট কোন ভয় প্রর্দশক আসেননি। তখন নূহ (আঃ)-কে বলা হবে তুমি সাক্ষী হাযির কর, নূহ (আঃ) বলবেন, আমার সাক্ষী সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর উম্মত।[৪] ইমাম এবনে জরীর তাবারীও (রঃ) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[৫]

---

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ২৭
(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ২৭
(৩) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫
(৪) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭
(৫) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৬

তাই এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ তোমরা হবে সাক্ষী সমগ্র মানব জাতির জন্যে।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থ 'তফসীরে কবীরে' বলেছেন, এর অর্থ হলো, হে মোমেনগণ! যেভাবে তোমাদেরকে আমি হেদায়েতের নেয়ামত দান করেছি তেমনি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত রূপে গড়ে তুলেছি।

أُمَّةً وَّسَطًا

এ উম্মতকে উম্মতে 'ওসাত' বলা হয়েছে। 'ওসাত' বলা হয় এমন জিনিসকে যা ঠিক মাঝামাঝি হয়, যার কোনদিকে বাঁকা নয়। আরবী ভাষায় এ শব্দটি প্রশংসার উদ্দেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন কোরআনে করীমে রয়েছেঃ

قَالَ اَوْسَطُهُمْ

আর হাদীস শরীফেও রয়েছেঃ

خَيْرُ الْاُمُوْرِ اَوْسَطُهَا

অর্থাৎ 'যা মাঝামাঝি তাই উত্তম'।

ইমাম রাযী (রঃ) বলেছেন, যেহেতু এ উম্মত 'এফরাত ও তফরীতের' মাঝে মধ্য-পন্থী কেননা, নাসারারা আল্লাহ্‌র বন্দা ও নবী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে চরম অন্যায় করেছে। অপরপক্ষে ইহুদীরা আল্লাহ্‌র কোন কোন নবীকে হত্যা করেছে এবং আসমানী কিতাব সমূহে পরিবর্তন করেছে। এ উভয় অন্যায়কারী উম্মত সীমা লংঘন করেছে। অথচ উম্মতে মোহাম্মদীয়া হলো মধ্য-পন্থী তথা সঠিকপন্থী। তাই উম্মতে মোহাম্মদীয়া সম্পর্কে এরশাদ হয়েছেঃ 'তারা হলো সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত'। আর অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ 'এ উম্মত সর্বোত্তম উম্মত'। এরশাদ হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

সর্বোত্তম উম্মত

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত সমগ্র মানব জাতির উপকারার্থেই তোমাদের সৃষ্টি"।

ইমাম রাযী (রঃ) আরও লিখেছেনঃ তত্ত্বজ্ঞানী ওলামায়ে কেরাম এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী সংবিধান প্রণয়ণে অথবা কোন ইসলামী বিষয়ে উম্মতের ওলামায়ে কেরাম যদি ঐক্যমত প্রকাশ করেন তবে তা শরীয়তের অন্যতম দলিল হিসাবে গণ্য হবে। আল্লাহ্ পাক এ উম্মতকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম উম্মত বলে ঘোষণা

করেছেন।[১] এজন্যেই হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছেঃ

لَنْ تَجْتَمِعَ اُمَّةُ مُحَمَّدٍ عَلَى الضَّلَالَةِ

"উম্মতে মোহাম্মদীয়া কখনো গোমরাহীর উপর একমত হবে না"।

তোমরা সাক্ষী হবে মানুষের জন্য

বিখ্যাত তফসীরকার এবনে জরীর তাবারী (রঃ) তাঁর তফসীর গ্রন্থে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক হই। যখন জানাযা শেষ হলো তখন উপস্থিত লোকেরা বললোঃ লোকটি অত্যন্ত ভাল ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'ওয়াজিব হয়েছে'। অতঃপর আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে অন্য একটি জানাযায় শরীক হলাম, মৃত ব্যক্তির প্রতি জানাযার নামায শেষে লোকেরা বললোঃ লোকটি মন্দ ছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'ওয়াজিব হয়েছে'। তখন হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) দণ্ডায়মান হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি উভয় স্থানে 'ওয়াজিব' এরশাদ করেছেন, একথাটির তাৎপর্য কি?

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের কালামে রয়েছে ঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

"তোমরা সাক্ষী হবে মানুষের জন্য"।

এর অর্থ হলো যে ব্যক্তির জন্য মানুষ এ মন্তব্য করেছে যে, "লোকটি ভাল ছিল" সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়েছে, পক্ষান্তরে যে ব্যক্তিকে মানুষ মন্দ বলেছে মানুষের সাক্ষ্য মোতাবেকই সে ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম ওয়াজিব হয়েছে।

এমনিভাবে আল্লামা এবনে জরীর তাবারী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের তফসীরে আরেকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ হাদীসখানি বর্ণিত হয়েছে ইয়াস এবনে সালমা এবনে আকওয়া (রাঃ) থেকে। তিনি বলেনঃ আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম, তিনি একটি জানাযায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। লোকেরা সে মৃত ব্যক্তির খুব প্রশংসা করলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ 'ওয়াজিব হয়েছে'। অতঃপর তিনি আরেকটি জানাযায় তশরীফ নিয়ে গেলেন, সেখানে মৃত ব্যক্তির ব্যাপারে অন্য রকম কথা বলা হলো, তখনও তিনি এরশাদ করলেনঃ 'ওয়াজিব হয়েছে'। তখন উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, ইয়া

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৯৮

রসূলাল্লাহ! কি ওয়াজিব হয়েছে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ "ফেরেশ্‌তাগণ আসমানে আল্লাহর সাক্ষী আর তোমরা জমীনে আল্লাহর সাক্ষী, তোমরা যা সাক্ষ্য দিয়েছ তাই ওয়াজিব হয়েছে"। এরপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেনঃ

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আমল করতে থাক। আল্লাহ্ পাক তোমাদের আমল দেখবেন এবং তার রসূলও দেখবেন, মুসলমানগণও দেখবেন।[১]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একদিন আছরের পর দণ্ডায়মান অবস্থায় ভাষণ দান করলেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত যত ঘটনা পৃথিবীতে ঘটবে তার প্রত্যেকটির উল্লেখ করলেন। এমননি যখন সূর্যের আলো বৃক্ষের চূড়ায় এবং দেয়ালের উপর দেখা গেল তখন তিনি এরশাদ করলেন, এখন দুনিয়ার বয়স এতখানি রয়েছে যতখানি এ দিনের সময় রয়েছে। আর দুনিয়ার সময় এতখানি শেষ হয়েছে যতখানি এ দিন শেষ হয়েছে। মনে রেখ এ উম্মত (অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীয়া) সত্তর উম্মতের কাজ করে আর এ সকলের মধ্যে এ উম্মত আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লামা বগভী এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ইমাম তিরমিজী, এবনে মাজা এবং দারমী এই হাদীসকে বাহাজ এবনে হাকীমের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। দারমী এ হাদীসের সঙ্গে একথারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) কা'ব আহবার (রাঃ)-কে একথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তওরাতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিবরণ কিভাবে রয়েছে? তিনি বললেনঃ আমরা তওরাতে পেয়েছি তিনি হলেন মোহাম্মদ এবনে আবদুল্লাহ, তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করবেন। মদীনায় হিজরত করবেন। সিরিয়া তাঁর করতলগত হবে। তিনি অশোভন কথা বলবেন না। বাজারে চিৎকার করবেন না এবং মন্দ ব্যবহারকারীর সাথে তিনি মন্দ ব্যবহার করবেন না; বরং ক্ষমা করবেন। তাঁর উম্মত আল্লাহ্ পাকের অধিকতর প্রশংসাকারী হবে। কঠোরতা, নম্রতা, সুখ এবং দুঃখ এক কথায় সর্বাবস্থায় তারা আল্লাহর হাম্‌দ বা প্রশংসা করবে। এ উম্মত উঁচু স্থানে আরোহণ করতেও তাকবীর বলবে আর অজুর দ্বারা হাত পায়ে নূর লাভ করবে। তারা কোমরের মধ্যস্থলে লুঙ্গি বাঁধবে। নামাযের মধ্যে তারা এভাবে সারিবদ্ধ হবে যেমন লড়াইতে হয়। মসজিদ সমূহে তাদের আওয়াজ মধু মক্ষিকার আওয়াজের ন্যায় বিনম্র এবং ছোট হবে। তবে আওয়াজ এত ছোট হবে না যে, পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি শ্রবণ করতে না পারে।[২]

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২৩৯

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ- الاية

(হে রসূল!) আপনি যে কেবলার অনুসারী ছিলেন তাকে আমি এজন্যে কেবলা করেছিলাম যেন একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে তাঁর অনুসরণ থেকে বিমুখ হয়? একথার তাৎপর্য এই, মূলতঃ কা'বা শরীফই ছিল মোমেনদের প্রকৃত কেবলা, আর এটি নতুন কোন কথা নয়; বরং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় থেকেই কা'বা শরীফ কেবলা রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর সাময়িকভাবে বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পরীক্ষা করে দেখা যে, কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণে অটল থেকে ভাগ্যবান হয়, আর কে তাঁর অনুসরণ পরিত্যাগ করে ভাগ্যাহতদের অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ণিত আছে যে, কেবলা পরিবর্তনের আদেশ অমান্য করে কিছু সংখ্যক বদনসীব লোক ইসলামকে পরিত্যাগ করে মুরতাদ হয়।[১]

وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً

অর্থাৎ কেবলার এ পরিবর্তনের পর ঈমানের উপর অবিচল থাকা অত্যন্ত কঠিন তবে, (হ্যাঁ) যাদেরকে আল্লাহ পাক হেদায়েত নসীব করেন তাদের পক্ষে আল্লাহ পাকের আদেশ বিনা দ্বিধায় মেনে চলা তথা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা আদৌ কঠিন নয়। কেননা, জীবনে পরম আনন্দ ও সাফল্য লাভের এটিই একমাত্র পথ। এ পর্যায়ে হাই এবনে আখতাব ইহুদীর কথা বলা যেতে পারে, যে সে তার সংগীদের নিয়ে মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করেছিল, "এতদিন যে তোমরা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করলে তা কি হেদায়েত ছিল না গোমরাহী"? যদি তা হেদায়েত হয়ে থাকে তবে তোমরা সে হেদায়েতের পথ কেন বর্জন করলে? আর যদি তা গোমরাহী হয়ে থাকে তবে তোমরা গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট হয়ে আল্লাহর এবাদত কেন করলে? মুসলমানগণ জবাব দিয়েছেনঃ যে কাজের নির্দেশ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আসে তা যথাযথ ভাবে পালন করার নামই হেদায়েত। আর যে কাজ থেকে আল্লাহ পাক বিরত থাকতে বলেন সে কাজটি করাই গোমরাহী। যতদিন পর্যন্ত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করার আদেশ ছিল ততদিন সে দিকে নামায আদায় করাই হেদায়েত ছিল। কিন্তু যখন আল্লাহ পাক বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন তখন সেদিকে ফিরে নামায আদায় করা গোমরাহী ব্যতীত আর কিছুই নয়।[২]

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা-২৪৩

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৩

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ

শানে নুযুল ঃ কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদীরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে যেসব নামায আদায় করা হয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো। কোন কোন সরল-প্রাণ মুসলমানের অন্তরেও এমনি প্রশ্ন উত্থিত হয়, ইতোপূর্বে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে যে নামায আদায় করেছি তার কি হবে? যারা জীবিত আছে তারা না হয় নামায কাজা করে নেবে কিন্তু যারা এরই মধ্যে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়েছেন তাদের কি অবস্থা হবে, যেমন বনি নাজ্জার গোত্রের আসাদ এবনে জাররা এবং বনি সালমা গোত্রের বারা এবনে মারুর মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁদের আত্মীয়-স্বজন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে মৃত ব্যক্তিদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ আর আল্লাহ পাক এমন নন যে তোমাদের জিন্দেগীর কাজ তথা নামায বিনষ্ট করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়াময়। অতএব তিনি তোমাদের নেক আমলকে বিনষ্ট করবেন না, তোমরা আল্লাহ পাকের নির্দেশেই উভয় কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায় করেছ। অতএব, তোমাদের সওয়াব বা শুভ পরিণতি বিনষ্ট হবে না। তোমরা করুণাময়ের করুণা-দৃষ্টি লাভ করবে।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে এ সম্পর্কে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন মহিলা কয়েদীকে দেখলেন সে তার হারানো শিশুকে পাগলের ন্যায় খুঁজে ফিরছে। যখন সে শিশুকে পেল না তখন সে কয়েদীদের মধ্যে যে শিশুকেই দেখতো তাকেই বুকে জড়িয়ে ধরতো, অবশেষ তার শিশুটিকে পাওয়া গেলে সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে তাঁকে কোলে নিল, আদর করলো এবং তাঁর মুখে দুধ দিল, এ দৃশ্য দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা বলো এ মাতা কি তার শিশুকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করতে পারবে? উপস্থিত লোকেরা জবাব দিল, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন অবস্থাতেই পারবে না। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! এ মাতা তার শিশুর প্রতি যতখানি স্নেহময়ী এবং মেহেরবান, আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী দয়াবান, অতীব মেহেরবান, অনন্ত অসীম তাঁর দয়ামায়া।[২]

তাই এরশাদ হয়েছেঃ

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড-১ পৃষ্ঠা ২৪৪
(৩) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭

اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল এবং অতীব দয়াময়"।

قَدْ نَرٰى
تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۪ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۭ وَ
اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۭ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَىِٕنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۭ
وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ اِذًا لَّمِنَ
الظّٰلِمِيْنَ ۝ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ ۭ وَ
اِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۝ اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ فَلَا
تَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِيْنَ ۝

তরজমা

(১৪৪) নিশ্চয় আমি আপনাকে বারংবার আসমানের দিকে মুখত্তোলন করতে দেখি, অতএব আপনাকে অবশ্যই সে কেবলার দিকে ফেরাব, যার আকাঙ্ক্ষা আপনি করেছেন, অনন্তর আপনি মসজিদে হারামের দিকে (মক্কা শরীফ) মুখ ফিরিয়ে নিন। আর যে যেখানেই থাক সেদিকেই নিজের মুখ ফেরাও এবং নিশ্চয় যাদেরকে আসমানী কিতাব প্রদান করা হয়েছে তারা একথা সুনিশ্চিত ভাবেই জানে যে, তা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। এবং আল্লাহ পাক তাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে গাফেল নন।

(১৪৫) (হে রসূল!) আপনি যদি আহ্লে কিতাবদের নিকট সমস্ত দলিল-প্রমাণও উপস্থিত করেন, তবু তারা আপনার কেবলাকে স্বীকৃতি দেবে না, এবং আপনিও তাদের কেবলার তাবেদার নন, এমনকি তারাও পরস্পর কেবলার অনুগত নয়। এবং আপনার নিকট যে জ্ঞান এসেছে তারপরও যদি আপনি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করেন তাহলে আপনি অবশ্যই অত্যাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব প্রদান করেছি, তারা আল্লাহর রসূলকে এমনভাবে চেনে যেমন তাদের সন্তানদেরকে তারা চেনে এবং নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক জানা সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করেছে।

(১৪৭) হে নবী! এ বাস্তব সত্যটি আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে এসেছে, অতএব, আপনি কখনও সন্দিহান লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন তখন মদীনা শরীফের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ইহুদী, আল্লাহ পাক তাঁকে আদেশ দিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করতে। এতে ইহুদীরা খুশী হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৬ মাস যাবত বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায় করলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল কা'বা শরীফকে কেবলা রূপে গ্রহণ করার, তাই এ উদ্দেশে তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতেন এবং আল্লাহ পাকের আদেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, এজন্যে বার বার আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করতেন।[১]

এখন প্রশ্ন হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আকাঙ্ক্ষা কেন করলেন? এর জবাবে তফসীরকারগণ কয়েকটি কারণ বলেছেনঃ

(১) ইহুদীরা বলতে লাগলোঃ মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাদের বিরোধিতা করে অথচ আমাদের কেবলার অনুসরণ করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ কা'বা শরীফ ছিল তাঁর পিতামহ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলা।

(৩) তৃতীয়তঃ কা'বা শরীফই হলো প্রাচীনতম কেবলা।

(৪) এতদ্ব্যতীত কা'বা শরীফ কেবলা হওয়া আরববাসীর ঈমান আনয়নে সহায়ক হতে পারে।[২]

মূলতঃ এসব কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এ সম্পর্কে আরজী পেশ করেছেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁর আরজী কবুল করে এরশাদ করেছেন ঃ (قَدْ نَرٰى) অর্থাৎ হে আমার প্রিয়নবী! আপনি যে কেবলাকে পছন্দ করে আমার নিকট আরজী পেশ করেছেন এবং এ সম্পর্কে নির্দেশ লাভের জন্যে

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৩
(২) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮
তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০৯

বারে বারে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করছেন এবং অধীর আগ্রহে আমার নির্দেশের অপেক্ষা করছেন, আমি তা লক্ষ্য করেছি। তাই (হে রসূল!) আপনার সন্তুষ্টির খাতিরে আমি আপনাকে কা'বার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করব। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যা চেয়েছেন আল্লাহ্ পাক তাই দান করেছেন। তিনি যে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্যের অধিকারী, তিনি যে আল্লাহ পাকের সর্বাধিক প্রিয় রসূল এ আয়াত দ্বারা এ সত্য পুনরায় প্রমাণিত ও প্রকাশিত হলো। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, দোয়া করার সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করাতে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে কেননা, এতে উর্দ্ধের সাথে সম্পর্ক স্থাপন হয়, নূরে খোদাওয়ান্দী লাভ হয় এবং ফেরেশতাগণের সান্নিধ্য লাভ হয় ফলে অন্তর স্বচ্ছ হয় এবং পরিপূর্ণ একীন স্থাপনে সাহায্য পাওয়া যায়।

نَرٰى (আমরা দেখেছি) এবং فَلَنُوَلِّيَنَّكَ (আপনাকে অবশ্য অবশ্য ফিরিয়ে দেব) শব্দে দু'টি তাগিদ রয়েছে । এর উদ্দেশ্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পরিপূর্ণ সান্ত্বনা প্রদান করা এবং তাঁর উদ্বেগ দূর করা। অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি কেন উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আমি অবশ্যই এরূপ করবো। এরপর সাথে সাথে আদেশ জারী করলেন যাতে প্রথমে সুসংবাদ দ্বারা আনন্দ এবং পরে হুকুম লাভের দ্বারা সন্তুষ্টি হাসিল হয়। এমন বলা হয়নি যে 'আপনি কা'বার দিকে মুখ করুন'। বরং এভাবে বলা হয়েছে যে 'আপনি যে কেবলা পছন্দ করেন' এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হাকীম হয়ে এখানে হুকুম করা হয়নি; বরং তাঁর পবিত্র আকাঙ্ক্ষাকে মঞ্জুর করা হয়েছে। এটি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কবুলিয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মাওলা এখানে তাঁর প্রিয় বন্দার সন্তুষ্টি চেয়েছেন। এজন্যে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি রসূলের অনুসরণ করেছে সে আল্লাহ্ পাকের ফরমাবরদার হয়ে গেছে। আর এজন্যেই কা'বাকে কেবলা হিসাবে গ্রহণকারী হয়েছেন আল্লাহ্ পাকের সর্বশ্রেষ্ঠ মাহ্বুব এবং প্রিয় পয়গম্বর।

قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে কোরআনে পাকে প্রথম রহিত আদেশ (নসখ) হলো কেবলা রহিতকরণ। যখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে হিজরত করেন তখন সেখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই ইহুদী ছিল। আল্লাহ পাক তাঁকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায আদায়ের নির্দেশ দিলেন, তাতে ইহুদীরা খুব সন্তুষ্ট হলো, কয়েক মাস পর্যন্ত তিনি সেদিকে ফিরেই নামায পড়লেন। কিন্তু তাঁর বাসনা ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলা যেন নিজের কেবলা হয়। এজন্যে তিনি আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতেন এবং আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত

২ : ৬

করতেন যাতে কিছু একটা জবাব পাওয়া যায়। অতঃপর তাঁর দোয়ার জবাব স্বরূপ এ আয়াত নাযিল হয়। এর ফলে ইহুদীরা সমালোচনায় মেতে উঠলো যে, তিনি এ কেবলা কেন পরিত্যাগ করলেন? এর জবাবে বলা হলো, আল্লাহ পাকই পূর্ব এবং পশ্চিমের মালিক। আরও এরশাদ হলো- যেদিকেই তোমরা মুখ ফেরাও সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। পূর্বের কেবলা ছিল পরীক্ষা স্বরূপ- একথাও বলা হলো। একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাযের পর আকাশের দিকে বার বার তাকাতেন। ফলস্বরূপ এ আয়াত নাযিল হয় এবং হুকুম করা হয় যে মসজিদুল হারামের দিকে ফিরে নামায পড়তে থাকুন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর একটি বক্তব্যে এ হুকুমের পরিধি হলো ঠিক কা'বা শরীফের দিকে মনোনিবেশ করা। আবার তাঁরই অপর বক্তব্যে বলা হয়েছে যে কা'বা শরীফকে সম্মুখের দিকে রাখলেই যথেষ্ট হবে। আর অধিকাংশ ইমামের নিকট এ অভিমতটিই গ্রহণযোগ্য হয়েছে।[১]

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে নামায আদায় করুন অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করুন। যেহেতু হরম শরীফে যুদ্ধ-বিগ্রহ, প্রাণী হত্যা এমনকি গাছ-পালা কাটাও হারাম বা নিষিদ্ধ, তাই এ মসজিদকে মসজিদুল হারাম বলা হয় আর এ মসজিদের মর্যাদাও অসাধারণ।[২] এ পর্যায়ে মসজিদুল হারামের আকার ও আয়তনের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মসজিদুল হারামের আকার ও আয়তন

মসজিদুল হারামের বর্তমান আকার ও আয়তন সুলতান ২য় সেলিম (মৃত্যু ১৫৭৭ ইং)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এ পবিত্র মসজিদের আঙ্গিনার পরিধি ৬০০ ফুট বলে বর্ণিত হয়েছে। এর চতুর্দিকের বিরাট প্রশস্ত এমারত সমূহ এই হিসাবের বাইরে রয়েছে। প্রবেশের জন্য ৪১টি দ্বার রয়েছে। ছয়টি মিনারা বিশিষ্ট এ মসজিদের গম্বুজের সংখ্যা ১৫০টির অধিক হবে। অপর একটি বর্ণনা মোতাবেক এর উত্তর ও পশ্চিমের পরিধি ৫৪৫ ফুট, দক্ষিন ও পূর্বের পরিধি ৫৫৩ ফুট, উত্তর-পূর্বের পরিধি ৩৬০ ফুট এবং দক্ষিন-পশ্চিম ৩৬৪ ফুট।

তফসীরকারগণ বলেছেনঃ আল্লাহ পাক কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় কর এ নির্দেশ দেননি; বরং এরশাদ করেছেন ঃ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭
(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ২৮
তফসীরে মাজেদী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৬

অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে ফিরে নামায আদায় করুন কেননা, কা'বা শরীফ বা বায়তুল্লাহ'র চেয়ে অনেক বিস্তৃত স্থান জুড়ে রয়েছে মসজিদে হারাম। তাই দূর দূরান্ত থেকে এ মসজিদের দিকে ফিরে নামায আদায় করা অধিক সহজ। শুধু তাই নয়; বরং যেদিকে মসজিদে হারাম বা কেবলা সেদিকে ফিরে নামায আদায় করাই যথেষ্ট।

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ

অর্থাৎ "তোমরা যেখানেই থাক, কেবলার দিকে মুখ কর"।

পূর্বের আদেশটি ছিল শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, তাঁর উচ্চতম মর্যাদা ও শান মোতাবেক তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তাঁর আকাঙক্ষা মোতাবেক কেবলা পবির্তনের খবর দেয়া হয়েছে। অতঃপর এ আয়াতে তাঁর উম্মতকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে যে, তোমরা যেখানেই থাক, যে দেশেই থাক এমনকি, বায়তুল মোকাদ্দাসেও থাক তবু কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায আদায় কর। কেবলা পরিবর্তনের এ নির্দেশ আসে ঠিক এমন সময় যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা মোনাওয়্যারার বিখ্যাত গোত্র বণী সালেমের মসজিদে যোহরের দু' রাকাআত নামায বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে আদায় করছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেক জিব্রাঈল (আঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কেবলার দিকে ফিরে নামায আদায়ের কথা জানালেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে কেবলার দিকে মুখ করলেন এবং অবশিষ্ট দু' রাকাআত কেবলার দিকে ফিরে আদায় করলেন। এ ঐতিহাসিক কারণেই বনি সালেমের এ মসজিদটিকে "মসজিদুল কেবলাতাইন" বা দু' কেবলার মসজিদ বলা হয়।[১]

বায়তুল মোকাদ্দাস কেবলা হিসাবে কতদিন ছিল?

হিজরতের পরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামায পড়েছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সূত্রে আবু দাউদের মত হলো, তিনি সতের মাস নামায পড়েছিলেন। আর হযরত সাঈদ এবনুল মুসাইয়্যেব (রঃ)-এর বর্ণনার সূত্র অবলম্বনে ইমাম মালেক (রঃ)-এর মত হলো তিনি ষোল মাস নামায পড়েছেন। হযরত বারা বিন আযেব (রাঃ)-এর সূত্রে ইমাম বোখারী (রহ)-এর মত হলো তিনি ষোল অথবা সতের মাস নামায পড়েছেন। মূল কথা তিনি ষোল মাস কয়েক দিন নামায পড়েছেন। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রবিউল আউয়াল মাসের পাঁচ তারিখ সোমবার মক্কা থেকে হিজরত করেন এবং ১২ই রবিউল

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৬

আউয়াল সোমবার মদীনা মোনাওয়্যারায় পৌঁছেন। অতঃপর সঠিক বক্তব্য অনুযায়ী বদরের ঘটনা শুরু হওয়ার দু' মাস পূর্বে দ্বিতীয় হিজরীর ১৫ই রজব দ্বিপ্রহরের পর কেবলা পরিবর্তনের আদেশ হয়। এ বক্তব্যকে অধিকাংশ আলেম নির্ভরযোগ্য হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অনেকের মতে ১৭ মাস হওয়ার কারণ হলো মাসের অংশ বিশেষকে পূর্ণ মাস হিসাবে ধরে নিয়ে তারা ১৭ মাস বলেছেন।

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ- الاية

কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে আহলে কিতাব যেসব আপত্তিকর মন্তব্য করেছে তার জবাবে এ আয়াতে আল্লাহ পাক মোমেনদেরকে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা যত ব্যঙ্গোক্তিই করুক না কেন তারা খুব ভাল ভাবেই জানে যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করবেন। ইহুদীরা তওরাত গ্রন্থের মাধ্যমেই এ সত্য সম্পর্কে অবগত হয়েছে। কেবলা পবিরর্তন যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাজ নয়, বরং তাঁর সব কিছুই এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের নির্দেশ মোতাবেকই হয়েছে একথাও ইহুদীরা বিলক্ষণ জানে। কিন্তু তাদের হিংসা-বিদ্বেষ এবং জেদের কারণে এ সত্যের বিরোধিতা করেছে। অতএব, মুসলমানদের প্রতি কর্তব্য হলো তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং আল্লাহ পাকের নির্দেশ পালন করা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

এবনে জরীর তাবারী লিখেছেনঃ কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদী ও নাসারারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে বলতে লাগলো তিনি তাঁর মাতৃভূমির (মক্কা শরীফ) দিকে আকৃষ্ট হয়ে কেবলা পরিবর্তন করেছেন। তিনি যদি আমাদের কেবলা মেনে চলতেন তাহলে আমরাও তাঁকে মেনে নিতাম। তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

وَاِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ

আল্লাহ পাক এ আয়াতে একথা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন যে, কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি আল্লাহ পাকের নির্দেশ মোতাবেক হয়েছে, এ সম্পর্কে আহলে কিতাব সম্পূর্ণ অবগত। আর এজন্যেই তাদের উদ্দেশে সর্তকবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাদের কার্যাবলী সম্পর্কে গাফেল নন। অতএব, তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের পরিণাম শোচনীয়।

وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ

শানে নুযুল

কেবলা পরিবর্তনের পর ইহুদী ও নাসারারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে প্রশ্ন করে কেবলা পরিবর্তনের ব্যাপারে আপনার নিকট কি দলিল রয়েছে? এর জবাবে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১] এতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ (হে রসূল!) আহলে কেতাব খুব ভাল ভাবেই জানে যে কা'বা শরীফই সত্যিকার কেবলা। তারা আপনার নিকট সকল দলিল-প্রমাণ দাবী করেছে। যদি আপনি তাদের নিকট সকল দলিল-প্রমাণ এবং যাবতীয় বিস্ময়কর নির্দশনও উপস্থিত করেন তবু তারা মানবে না আপনাকে, মানবে না আপনার কেবলাকে। তারা একথা বলে আপনাকে তাদের কেবলার দিকে টেনে নেয়ার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছে অথচ তা কখনোই সম্ভব হবে না। আর তারা নিজেরাও একে অন্যের কেবলা মানে না। কেননা, ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দাসের "সখরাকে" কেবলা মানে। পক্ষান্তরে নাসারা সম্প্রদায় বায়তুল মোকাদ্দাসের পূর্বদিককে কেবলা মানে। (হে রসূল!) আপনার নিকট সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপিত হরার পর আপনি যদি তাদের অন্যায় আচরণের অনুসরণ করেন, তারা হেদায়েত লাভ করবে এ আশায় তাদের কেবলা (মেনে নেন) তবে এমন অবস্থায় আপনিও জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

অর্থাৎ হে রসূল কোন অবস্থাতেই আপনি তাদের কেবলা মানবেন না কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত কা'বা শরীফই কেবলা হিসাবে নিদিষ্ট হলো, এ বিষয়ে আর কোন পরিবর্তন হবে না।

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ

"যদি আপনি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করেন"।

এ আয়াতে যদিও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু সতর্ক করা হয়েছে মুসলিম জাতিকে যে, ইহুদী-নাসারাদের যেন অনুসরণ করা না হয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে আল্লাহর নাফরমানীর কথা এবং ইহুদী-নাসারাদের অনুসরণের কথা কল্পনাতীত। তবে মুসলমানদের এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে যে, কোন অবস্থাতেই তাদের অনুসরণ করে যেন জালেমদের অন্তর্ভুক্ত না হয়।[২]

এ সতর্কবাণীর দৃষ্টান্ত এই, কোন শাসনকর্তা তার অধীনস্থ লোকদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে নিজের প্রিয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলে, দেখ তুমিও যদি এ অন্যায় কর তবে তোমাকেও শাস্তি ভোগ করতে হবে। এমন অবস্থায় অন্যদের জন্যে তা হয় অত্যন্ত কঠিন সতর্কবাণী।

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৮

(২) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬

ঠিক এমনিভাবে মুসলিম জাতিকে সতর্ক করার লক্ষ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে- "(হে রসূল!) এমনকি যদি আপনিও ইহুদী-নাসারাদের ইচ্ছার অনুসরণ করেন তবে আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।[১]

বর্তমান যুগে যারা কাফের-মুশরেক, ইহুদী ও নাসারাদের অনুসরণকে ফ্যাশন মনে করে তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ সতর্কবাণী। মূলতঃ অনুসরণ করতে হবে একমাত্র প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে, আর এতে রয়েছে মুসলিম জাতির তথা সমগ্র মানব মণ্ডলীর চরম এবং পরম সাফল্য বা কামিয়াবী।

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ

"যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি তারা (প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) চেনে"।

এ আয়াতের মর্মাথ হলো, আহ্‌লে কেতাব আলেমরা একথা ভাল ভাবেই জানতো যে, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম-ই সেই নবী যাঁর আবির্ভাবের কথা তওরাতে উল্লেখিত হয়েছে এবং যাঁকে সহযোগিতা করা ও যাঁর প্রতি ঈমান স্থাপন বা বিশ্বাস করার হুকুম তাদের প্রতি প্রদত্ত হয়েছে।

كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

(সেভাবে চেনে যেভাবে তারা নিজেদের সন্তানদেরকে চেনে) –দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। কেননা যে সন্তান নিজের ঔরষে জন্ম গ্রহণ করেছে তার পরিচয় নিজের কাছে গোপন থাকতে পারে না। সুতরাং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবী হওয়াকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ভিত্তি শুধু ছিল ক্ষোভ এবং দুশমনি। অন্তরে তারা ঠিকই জানতো যে তিনি সন্দেহাতীত ভাবে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রিয়নবী ও রসূল। বর্ণিত আছে যে, হযরত ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ) প্রাক্তন ইহুদী আলেম হযরত আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনারা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে নিজের সন্তানকে চেনার মত করে কিভাবে চিনতেন? তিনি জবাব দিলেন, যখন আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম দেখেছিলাম তখনই আমি তাঁকে নবী হিসাবে এমনভাবে চিনে ফেললাম যেভাবে আমি নিজের সন্তানকে চিনি, বরং তাঁর চেয়েও অধিক পরিমাণে নবী হিসাবে তাঁকে চিনে নিলাম। হযরত ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি একথা ঠিকভাবে বলতে পারলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ পাক আমাদেরকে তওরাত কিতাবে আখেরী নবীর যে সব বৈশিষ্ট্য এবং নিদর্শন বর্ণনা করেছেন তা দেখে আমি নিশ্চিত হলাম যে ইনিই আল্লাহর সর্বশেষ নবী। আর নিজের

(১) খোলাসাতুত্যাফাসীর পৃষ্ঠা ৮৯

সন্তানকে যদিও কয়েকটি প্রকাশ্য ইঙ্গিত এবং লক্ষণ দ্বারা চেনা সম্ভব তবুও সন্দেহের অবকাশ থাকে কারণ স্ত্রীকে অবিশ্বাস করার সম্ভাবনা থেকে যায় (কিন্তু নবীকে চেনার পর আর কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না)। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে কল্যাণময় বস্তু গ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন।

وَاِنَّ فَرِيْقًا

আহলে কেতাবদের মধ্য থেকে কিছু লোক এ সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রসূল, কিন্তু এতদসত্বেও তারা এ সত্য গোপন করে। তওরাতে তাঁর গুণাবলীর যে বিবরণ রয়েছে সে-সম্পর্কেও তারা পূর্ণ ওয়াকেফহাল, কিন্তু তবু তারা শুধু জেদের কারণে এ সত্যকে গোপন করে চলেছে।

اَلْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ

"সত্য যা তাই আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এসেছে"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে জরীর তাবারী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীর গ্রন্থে বলেছেনঃ আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করেছেন, "সত্য তাই যা আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে জানিয়ে দিয়েছেন এবং যা তাঁর পক্ষ থেকে আপনার নিকট নাযিল হয়েছে। আর তা সত্য নয় যা ইহুদী এবং নাসারারা বলছে।

অর্থাৎ কা'বা শরীফই সত্য কেবলা এবং সকলের জন্যে চিরন্তন কেবলা, আর এটিই ছিল হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলা এবং তাঁর পরবর্তী আম্বিয়া (আঃ)-এর কেবলা। অতএব (হে রসূল!) আপনি এ সত্যের উপর অটল অবিচল থেকে নেক আমল করুন এবং এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।[১]

(১) তফসীর মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯-৫০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫০
তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৭

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ؕ
اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يَاْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٤٨﴾
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَاِنَّهٗ لَلْحَقُّ
مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ
وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ؕ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ
شَطْرَهٗ ۙ لِئَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ۗ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ
فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِىْ ۗ وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ ﴿١٥٠﴾
كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَ
يُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٥١﴾
فَاذْكُرُوْنِىْٓ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِىْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ ﴿١٥٢﴾

তরজমা

(১৪৮) প্রত্যেকের জন্যেই এক একটি দিক বা কেবলা রয়েছে যেদিকেই সে মুখ করে থাকে। অতএব, তোমরা সৎ কার্যের সাধনায় দ্রুতগামী হও। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, আল্লাহ পাক তোমাদের সকলকেই সমবেত করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সমস্ত কিছুর উপর ক্ষমতাবান।

(১৪৯) (হে রসূল!) আপনি যে স্থান থেকেই গমন করবেন অবশ্যই আপনার মুখ পবিত্রতম মসজিদের দিকেই ফেরাবেন। (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার নিকট থেকে এটিই সত্য। আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ পাক আদৌ গাফেল নন।

(১৫০) আর আপনি যে স্থান থেকেই গমন করবেন আপনার মুখ পবিত্রতম মসজিদের দিকেই ফেরাবেন। আর তোমরাও যে যেখানেই থাক স্বীয় মুখ সেদিকেই ফেরাবে। তাহলে, অত্যাচারী লোকেরা ব্যতীত অন্য কারো সাথে তোমাদের কলহ হবে না। অতএব, তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা। শুধু আমাকেই ভয় কর। আর যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করি, এবং তোমরাও যেন সুপথ লাভ করতে পার।

(১৫১) যেমন আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকট আয়াত সমূহ পাঠ করেছেন এবং তোমাদেরকে জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা শিক্ষা দিচ্ছেন এবং তোমরা যে সম্পর্কে অবগত ছিলে না, তা তোমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছেন।

(১৫২) অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, অকৃতজ্ঞ হয়োনা।

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক উম্মতের বা প্রত্যেক জাতির জন্যেই আল্লাহ্ পাক এক একটি কেবলা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সেদিকে ফিরে তারা এবাদত করে। যেমন ইহুদীদের জন্যে বায়তুল মোকাদ্দাসের একদিক এবং নাসারাদের জন্য বায়তুল মোকাদ্দাসের অন্য দিক এবং মুসলমানদের জন্যে কা'বা শরীফ। এসবই আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। অতএব কেবলা সম্পর্কে কলহ-দ্বন্দ্ব সম্পূর্ণ অবান্তর। কে কোন্ দিকে ফিরে এবাদত করলো এ বিষয়টি গৌণ। মুখ্য বিষয় হলো কে আল্লাহর এবাদতে অগ্রগামী হলো, কে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করলো। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীর জন্যেই একটি কেবলা নির্দিষ্ট রয়েছে কিন্তু সঠিক কেবলা হলো কা'বা শরীফ, যা মুসলমানদের কেবলা। আবুল আলিয়া বলেছেন ঃ ইহুদীদেরও কেবলা রয়েছে নাসারাদেরও কেবলা রয়েছে। তবে হে মুসলমানগণ! তোমাদের কেবলাই সঠিক। মুজাহেদ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল কেবলার অনুসারী প্রত্যেক জাতিরই সৎ কাজে অগ্রগামী হতে সচেষ্ট হওয়া উচিত।[১]

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক এ আয়াতে বিশ্ব-মুসলিমকে বিশেষভাবে তাগিদ করেছেন সৎ কাজের সাধনায় অন্য উম্মত সমূহ থেকে অগ্রগামী হতে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ভাষায় ঃ

فَبَادِرُوْا بِالطَّاعَاتِ يَا اُمَّةَ مُحَمَّدٍ مِّنْ جَمِيْعِ الْاُمَمِ

অর্থাৎ-হে উম্মতে মোহাম্মদী! কেবলা নিয়ে ইহুদী ও নাসারাদের সঙ্গে তর্কে-বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে তোমরা সৎ কাজের সাধনায় দ্রুত অগ্রসর হও।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) বলেছেনঃ অতএব তোমরা সৎ কাজে অগ্রগামী হও। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে মোমেনগণ! আমি তোমাদের জন্যে যা সত্য তা বর্ণনা করেছি এবং তোমাদেরকে সঠিক কেবলা গ্রহণের হেদায়েত দান করেছি। অথচ ইহুদী নাসারাসহ অন্যান্য জাতি কেবলা সম্পর্কে পথভ্রষ্ট হয়েছে। অতএব তোমরা সৎ কার্য সম্পাদনে দ্রুতবেগে অগ্রসর হও। তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চরম সাফল্য লাভের লক্ষ্যে নেক আমলের সম্পদ অর্জন কর। আমি তোমাদের জন্যে নাজাতের পথ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি, অতএব এ পর্যায়ে তোমাদের আর কোন ওযর রইল না।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, হে মোমেনগণ! তোমরা তোমাদের কেবলাকে আঁকড়ে ধর কেননা, তোমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের সার্বিক কল্যাণের অধিকারী। দুনিয়ার কল্যাণ এজন্যে যে, তোমরাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর কেবলার অনুসারী হওয়ার সম্মান লাভ করেছ। আর আখেরাতের কল্যাণ এজন্যে যে তোমরা আল্লাহ্ পাকের হুকুমের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করেছ। যেমন বায়তুল মোকাদ্দাসকে যখন কেবলা হিসেবে গ্রহণ করার হুকুম হয়েছে তখন মুসলমানগণ তা মেনে নিয়েছেন। পরবর্তীতে যখন ঐ হুকুম রহিত হলো এবং কা'বা শরীফকে কেবলা রূপে গ্রহণের আসমানী নির্দেশ আসলো তখনো মুসলমানগণ অনতিবিলম্বে সে নির্দেশ মেনে নিলেন, এমনকি নামাযের মধ্যেই আল্লাহ পাকের হুকুম মোতাবেক কা'বা শরীফের দিকে ফিরে কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। এ আনুগত্যের জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে মুসলমানদের জন্যে রয়েছে পরকালে মহান উচ্চ মরতবা এবং বিরাট সাফল্য। ইমাম রাজী (রঃ) একথাও বলেছেন যে, এর অর্থ হলো আল্লাহর এবাদতের সঠিক সময়ে দ্রুত হাযির হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন, এজন্যেই নামাযের সময় হওয়া মাত্রই তা আদায় করা উত্তম। দলিল হিসাবে তিনি কোরআনে করীমের অন্য একখানি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

وَسَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

অর্থাৎ– "যে কাজে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে মাগফেরাত লাভ হয় সে কাজের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও"।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– নামাযের সময়ের প্রথম ভাগে নামায আদায় করলে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা যায় আর শেষভাগে আদায় করলে ক্ষমা পাওয়া যায়।[২]

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৮
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৩

أَيْنَ مَا تَكُونُوا

অর্থাৎ– তোমরা কেবলার যে কোন দিকে যে কোন স্থানে থাক না কেন আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে অবশেষে হাশরের মাঠে একত্রিত করবেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের কার্যাবলী মোতাবেক পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করা হবে। একথাটি অন্য আয়াতে এভাবে এরশাদ হয়েছে–

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِى بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ

অর্থাৎ তোমরা যেখানেই থাক না কেন এবং যত লৌহ-নির্মিত সুরক্ষিত এমারতে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাকড়াও করে আনবে। আর এ কাজটি আদৌ কঠিন নয় এজন্যে যে, আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে সর্বোপরি সর্ব শক্তিমান। অতএব, তোমাদেরকে একত্রিত করা আদৌ কঠিন কাজ নয়। এজন্যে পরিণামদর্শী মানুষের কর্তব্য হলো আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর মহান সাফল্যের লক্ষ্যে সত্য-সাধনায় আত্মনিয়োগ করা, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট থাকা, আল্লাহ পাকের হুকুম যথাযথভাবে পালন করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। তাই পরবর্তী আয়াতে পুনরায় কেবলা সম্পর্কে তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে–

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

অর্থাৎ– (হে রসূল!) আপনি যেখান থেকে বের হন নামাযের সময় মসজিদে হারাম তথা কা'বা শরীফের দিকে মুখ করবেন। আর এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সঠিক নির্দেশ আর তোমাদের কার্যাবলী সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক আদৌ গাফেল নন, অর্থাৎ কে আল্লাহর এ নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করলো, আর কে অবাধ্য হলো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব যে অনুগত হলো তার শুভ পরিণতি সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে, যে অবাধ্য হলো তার শাস্তি অবধারিত। অতঃপর পুনরায় কেবলার ব্যাপারে তাগিদ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন–

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ

(হে রসূল) আপনি যেখান থেকে সফরে বের হন না কেন নামাযের সময় মসজিদে হারামের দিকে মুখ করে নিন। হে উম্মতে মোহাম্মদী! তোমরা যেখানেই থাক না কেন নামাযের সময় কা'বা শরীফের দিকে মুখ কর যাতে করে যালেম ব্যতীত আর কেউ যেন তোমাদের সাথে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ না পায়। অতএব, (হে মোমেনগণ!) তোমরা তাদেরকে ভয় করোনা আর শুধু আমাকে ভয় কর যেন আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করি এবং তোমরা যেন পৃথিবীতে সঠিক পথে থাকতে পার।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতে পৃথিবীর সকল মুসলমানকে কা'বা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় করার তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে তিনবার তাগিদ করা হলো। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (রঃ) তিনবার তাগিদী হুকুম জারী করার কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন ঃ প্রথম হুকুম ছিল তাদের জন্যে, যারা কা'বা শরীফকে দেখে। দ্বিতীয় হুকুম ছিল তাদের জন্যে যারা মক্কা শরীফে অবস্থান করা সত্ত্বেও কা'বা শরীফকে দেখে না। তৃতীয় হুকুম তাদের জন্যে যারা সারা পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে আছে। ইমাম কুরতবী (রঃ) এ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন যে, প্রথম হুকুম হলো মক্কাবাসীর জন্যে, দ্বিতীয় হুকুম অন্যান্য শহরের অধিবাসীদের জন্যে, আর তৃতীয় হুকুম মুসাফিরদের জন্যে।

এ সম্পর্কে এ ব্যাখ্যাও পেশ করা হয়েছে যে, প্রথম হুকুমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কা'বা শরীফকে কেবলা হিসাবে গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ও তাঁর কবুলিয়তের উল্লেখ রয়েছে। দ্বিতীয় হুকুমে এ বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইচ্ছাও আল্লাহ্ পাকের মর্জি মোতাবেকই ছিল। আর তৃতীয় হুকুমে ইহুদীদের অযৌক্তিক কথাবার্তার প্রতি উত্তর রয়েছে যে, তোমাদের তওরাতে রয়েছে ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কেবলা হবে কা'বা শরীফ। কা'বা শরীফকে কেবলা হিসেবে গ্রহণের নির্দেশের মাধ্যমে তওরাতে বর্ণিত সে ভবিষ্যদ্বাণীই বাস্তবায়িত হলো। এতদ্ব্যতীত আরবের পৌত্তলিকরা বিশ্বাস করতো কা'বা শরীফ হলো বরকতময় স্থান, অতএব তাদেরও কর্তব্য হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা কেননা, তিনি কা'বা শরীফকে কেবলা গ্রহণের জন্যে আকাঙ্ক্ষা করেছেন।[১]

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ এ অত্যাচারীরা যত প্রকার সন্দেহ প্রকাশ করুক না কেন হে মোমেনগণ! তোমরা তাদের ন্যায় আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনের ব্যাপারে আদৌ সন্দিহান হয়োনা। আর আল্লাহর অবাধ্যতা, নাফরমানীর কারণে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়োনা, তাদেরকে ভয় করোনা, ভয় কর শুধু এক আল্লাহ পাককে।

কেবলা পরিবর্তনের হেকমত

কেবলা পরিবর্তনের মধ্যে কয়েকটি হেকমত ছিল। প্রথমত ঃ প্রশ্নকারীদের মুখ বন্ধ করা। দ্বিতীয়ত ঃ তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করা আর ইসলামী শরীয়তকে পরিপূর্ণ করা। তৃতীয়ত ঃ কেবলার ব্যাপারে অন্যান্য উম্মত পথভ্রষ্ট হয়েছে, কিন্তু তোমরা যেন এ পর্যায়ে হেদায়েত লাভ কর, আর তোমাদের জন্যে কেবলা এ কারণে নিদিষ্ট করে দিয়েছি যেন উম্মত সমূহের মোকাবেলায় তোমাদের ফজিলত ও উচ্চ মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০-১১

كَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلاً

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেন ঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর এক মহান নেয়ামতের কথা এরশাদ করেছেন। সে নেয়ামত হলো– প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি আল্লাহ্ পাকের সুস্পষ্ট এবং নূরে পরিপূর্ণ কিতাবের আয়াত সমূহ আমাদেরকে শুনিয়ে দেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি আমাদেরকে কুফরীর অন্ধকার থেকে আত্মরক্ষা করার পন্থা শিক্ষা প্রদান করেন ও ঈমানের আলোর দিকে পথ প্রদর্শন করেন এবং আমাদেরকে কিতাব ও হেকমতের অর্থাৎ কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা দান করেন। তিনি আমাদের নিকট সে সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন যে সব গোপন তথ্য আজ পর্যন্ত উন্মোচিত হয়নি। তাঁর কারণেই সে সব লোক দুনিয়ার বড় বড় মহাজ্ঞানী ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের ওস্তাদের মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছেন। যারা যুগ যুগ ধরে জাহেলিয়াতের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল এবং দীর্ঘকাল যাবত যাদেরকে কোন কল্যাণ স্পর্শও করতে পারেনি অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের বরকতে তাঁরাই গভীর জ্ঞান, পবিত্র অন্তর এবং সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়েছেন। দুনিয়ার অবস্থার এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে প্রমাণ করার জন্যে যথেষ্ট। এজন্যে কবি বলেছেন ঃ

تیری پیمبری کی سب سے بڑی دلیل ھے ۔

دشت نوکرون کوتونے دی شکوہ قیصری–

অর্থাৎ -তোমার পয়গম্বরীর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হলো এই, যারা বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াত, তাদেরকে তুমি দান করেছ বাদশাহী শান্ শওকত।

পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ– الخ

অর্থাৎ – এমন এক মহান নবীকে প্রেরণ করা মোমেনদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের এক বিরাট মেহেরবাণী। এ নেয়ামতের কদর যারা করেনা পবিত্র কোরআন তাদের সম্পর্কে এভাবে ইঙ্গিত করেছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا– الخ

"তুমি কি তাদেরকে দেখ না যারা আল্লাহ্ পাকের সেই মহান নেয়ামতের বদলে কুফরীকে গ্রহণ করেছে এবং নিজ জাতিকে ধ্বংসের গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে"।

এখানে আল্লাহর নেয়ামত বলতে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বোঝানো হয়েছে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর নেয়ামতের আলোচনা করে মানুষকে তাঁর জিকর ও শোকরের নির্দেশ প্রদান করেছেন। অর্থাৎ যেভাবে আমি তোমাদের প্রতি এ দয়া প্রর্দশন করেছি তোমরাও সেরূপ আমার জিকর ও শোকর করতে অবহেলা করোনা। হযরত মূসা (আঃ) একবার আল্লাহ পাকের মহান দরবারে বিনীত আরজ করলেন– 'হে আল্লাহ! আমি তোমার শোকর কি পদ্ধতিতে আদায় করবো'? এরশাদ হলো– 'আমাকে স্মরণে রাখ এবং কখনও ভুলো না'। স্মরণে রাখাটাই শোকর আর ভুলে যাওয়া হলো কুফরী। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন ঃ আল্লাহকে যারা স্মরণ করে আল্লাহ্ পাকও তাদেরকে স্মরণ করেন। তাঁর শোকর যারা আদায় করে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক প্রচুর পরিমাণে দান করে থাকেন এবং যারা শোকর করেনা তারা তাঁর কোপগ্রস্ত হয়। আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন বলেছেন ঃ আল্লাহ্কে পরিপূর্ণভাবে ভয় করার তাৎপর্য হলো তাঁর ফরমাবরদার হওয়া এবং কখনো নাফরমানী না করা। সর্বদা তাঁর জিকরে মশগুল থাকা। কখনো অবহেলা না করা। তাঁর শোকর গুজার থাকা কখনো না শোকরী না করা। বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ 'যেনাকারী, মদ্যপায়ী, চোর এবং হত্যাকারীকেও কি আল্লাহ্ পাক স্মরণ করে থাকেন'? তিনি জবাব দিলেন– 'হ্যাঁ, ক্রোধের সাথে'। হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ আমাকে স্মরণ কর অর্থাৎ আমার হুকুম সমূহ পালন কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো অর্থাৎ আমার নেয়ামত সমূহ দান করবো।

সাঈদ বিন যোবায়ের (রঃ) আল্লাহ্ পাকের কথাটি এভাবে ব্যক্ত করেন, 'আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব এবং রহমত সমূহ তোমাদের উপর নাজিল করবো'।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ পাককে তোমাদের স্মরণ করার চেয়ে আল্লাহ্ পাক যে তোমাদেরকে স্মরণ করেন তা এক মহান নেয়ামত। একখানি হাদীসে কুদসীতে আছে– 'যে ব্যক্তি মনে মনে আমাকে স্মরণ করে আমিও তাকে মনে মনে স্মরণ করি, আর আমাকে যারা দলবদ্ধ হয়ে স্মরণ করে, আমিও তাদের চেয়ে উত্তম দলের মধ্যে তাদের আলোচনা করি'। মসনদে আহ্মদে আছে, সে উত্তম দলটি হলো ফেরেশতাদের। আর যে ব্যক্তি আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর হে আদমের সন্তান! তুমি যদি আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আস তবে আমি তোমার দিকে দু' হাত অগ্রসর হই, আর তুমি যদি আমার দিকে পদব্রজে আস তবে আমি তোমার দিকে দ্রুত অগ্রসর হই। ছহীহ্ বোখারী শরীফেও এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ্ পাকের রহমত এর চেয়েও নিকটবর্তী। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ আমার শোকর আদায় কর এবং না শোকরী করোনা। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

অর্থাৎ তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সাধারণ ভাবে ঘোষণা করা হচ্ছে যে, যদি তোমরা শোকর আদায় কর তবে আমি তোমাদের প্রতি নেয়ামত বৃদ্ধি করে

দেব। আর যদি না শোকরী কর তবে মনে রেখ, আমার আযাব অত্যন্ত কঠিন। মসনদে আহমদে আছে, হযরত এমরান বিন হোছাইন (রাঃ) একবার অতি মূল্যবান পোশাক পরে আসলেন এবং বলতে লাগলেন আল্লাহ্ পাক মানুষকে যখন কোন নেয়ামত প্রদান করেন তখন তার মধ্যে সে নেয়ামতের প্রতিক্রিয়া দেখতে পছন্দ করেন।[১]

আল্লাহ্ পাকের স্মরণের তাৎপর্য

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ

"অতএব, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব"।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেন, আল্লাহ্ পাক এতে এরশাদ করেন যে, হে বন্দাগণ! তোমরা আমাকে আমার এবাদতের মাধ্যমে স্মরণ কর। অর্থাৎ আমার এবাদত করতে থাক আমি মাগফেরাত দানের মাধ্যমে তোমাদেরকে স্মরণ করবো তথা তোমাদের গুনাহ্ মাফ করবো। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাদীসে রয়েছে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ "বন্দা আমাকে যেমন মনে করে আমি তার জন্যে তেমনই হয়ে থাকি। আর সে যখন আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার হয়ে যাই"।

হযরত আবদুল্লাহ বিন শাকীক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে দুটি কক্ষ আছে। একটিতে ফেরেশতা থাকে এবং অপরটিতে শয়তান। যখন মানুষ আল্লাহ্র জিকরে মশগুল হয় তখন শয়তান দূরে সরে যায় এবং যখন জিকর থেকে গাফেল হয়ে পড়ে তখন শয়তান নিজের ঠোঁট তার অন্তরে স্থাপন করে এবং কু-মন্ত্রণা দিতে থাকে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ "মোফরাদ" ব্যক্তিগণ বিজয়ী হয়ে গেছে। সাহাবাগণ আরজ করলেন–ইয়া রসূলাল্লাহ! মোফরাদ ব্যক্তি কারা? এরশাদ হলো, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র জিকরকারী নারী ও পুরুষ। এই হাদীস মুসলিম শরীফে আছে। মূলতঃ আল্লাহ্র জিকরই গাফলতকে দূর করে থাকে। আর গাফলতের কারণেই অন্তরে কঠোরতা আসে। অতঃপর জিকর হলো এমন একটি বরকতময় কাজ যা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে এখলাছ এবং আন্তরিকতার সাথে সম্পাদন হয়ে থাকে। আর এ কাজটিতে এখলাছ না থাকলে তা এক প্রকার শেরকে পরিণত হয় এবং গাফলতের সাথে সম্পাদন করা হলে তা অনর্থক ও অগ্রাহ্য হয়। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১-১২

"নিশ্চয় তারা সফলকাম হয়েছে, যারা নিজেদের নামাযের মধ্যে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে"।

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ

"অকল্যাণ সে সব নামাযীদের, যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে"।

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ উত্তম জিকর হলো لا اله الا الله এবং উত্তম দোয়া হলো الحمد لله। হযরত সামুরা বিন জুন্দব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ চারটি বাক্য সবচেয়ে উত্তম ঃ

لا اله الا الله- الحمد لله -سبحان الله- الله اكبر

মুসলিম শরীফে এই হাদীস সংকলিত হয়েছে। অন্য একটি বর্ণনায় আছে- কোরআনে পাকের পরে একথাগুলো উত্তম। আর এগুলো পবিত্র কোরআন থেকেই সংগৃহীত। এ বর্ণনাটি ইমাম আহমদ (রঃ)-এর। হাদীসে কুদসীতে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি পবিত্র কোরআন নিয়ে মশগুল থাকে আর এ কারণে আমার জিকর করা এবং তার কোন প্রয়োজনের জন্যে দোয়া করার অবসর পায় না সে আরজী পেশ করে যতটুকু লাভ করত তার চেয়ে অধিকতর আমি তাকে দান করবো। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ অন্যের কথার চেয়ে আল্লাহ্ পাকের কালামের মর্যাদা সেরূপ, যেরূপ সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপর আল্লাহ্ পাকের মর্যাদা।[১]

এসব হাদীসের আলোকে সুফীগণ কল্‌বের মাধ্যমে অথবা মৌখিক কিংবা মৌন অথবা স্বশব্দে الله لا اله الا الله কে জিকর হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু মোজাদ্দেদ আলফেসানী (রঃ)-এর মতে কোরআনে পাকের তেলাওয়াত জিকর হিসাবে অধিক পছন্দনীয়। কারণ একদিকে কোরআনে পাকের ফজিলত অত্যধিক অন্যদিকে কোরআনে পাক আল্লাহ্ পাকের সরাসরি "ছেফাতে হাকীকিয়্যাহ"। যেন এই কোরআন এমন একটি রজ্জু যার এক প্রান্ত আল্লাহ্ পাকের কাছে এবং অপর প্রান্ত আমাদের দিকে রয়েছে। তাই এর মধ্যে যারা নফ্‌সকে 'ফানা' করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পেরেছে তার চেয়ে অধিক আর কেউ হাসিল করতে পারেনি। এতদ্ব্যতীত, মোজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ)-এর মতে অধিক নফল পড়াও জিকরের অন্তর্ভুক্ত, কারণ নামায মোমেনের মে'রাজ। কিন্তু তিনি নফ্‌স ফানা হওয়ার পর কোরআন করীম তেলাওয়াত

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০

এবং নফল নামায পড়ায় নিয়োজিত হওয়ার পথ অবলম্বন করতে বলেছেন এবং নফ্স ফানা হওয়ার পূর্বে শুধুমাত্র "নফী" "এছবাত" এর জিকরকেই যথেষ্ট মনে করতে বলেছেন। কারণ নফ্স ফানা হওয়ার পূর্বে কোরআনে পাক নিয়ে মশগুল হয়ে পড়া সঠিক ব্যবস্থা নয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

لَا يَمَسُّهٗۤ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ

"পবিত্র ব্যক্তি ব্যতীত পবিত্র কোরআন কেউ স্পর্শ করতে পারেনা"।

অর্থাৎ যারা অন্তরের কলুষতা থেকে এখন পর্যন্ত পবিত্রতা অর্জন করতে পারেনি তাদের জন্যে কোরআন নিয়ে মশগুল হয়ে পড়ার চেয়ে অধিক সমীচীন হবে জিকরে মশগুল হওয়া।[১]

জিকরের ধারা

فَاذْكُرُوْنِىْۤ

জিকর রসনা দ্বারা হয়ে থাকে অথবা মনে মনেও হতে পারে। আবার কল্পনার মাধ্যেমে জিকরও হয়ে থাকে। এমনকি আল্লাহ্ পাকের হুকুম পালন করাকেও জিকর হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে। দুর্‌রে মনছুর কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন –

مَنْ اَطَاعَ اللّٰهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللّٰهَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করেছে সে আল্লাহ্‌র জিকর করেছে"।

হযরত মা'আজ এবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলাম– "কোন্ আমলটি সবচেয়ে ভাল"? তিনি এরশাদ করলেন–

اَنْ تَمُوْتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِّنْ ذِكْرِ اللّٰهِ

"মৃত্যুর সময় আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের জিকরে যেন তোমার রসনা সিক্ত থাকে"।

দুর্‌রে মনছুর গ্রন্থে হযরত আবু মূসা (রাঃ)-এর এ বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের জিকর করে সে জীবিত। আর যে ব্যক্তি জিকর করেনা সে যেন মৃত। হযরত মা'আজ এবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬০

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ "জান্নাতবাসীদের কোন আফসোস থাকবে না। তবে শুধুমাত্র সে সময়ের জন্যে আফসোস থাকবে যে সময়টি দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র জিকর ব্যতীত অতিবাহিত হয়েছে"।

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ জিকরকারীগণকে চারটি বস্তু প্রদান করা হয়– (১) তাদের উপর "সাকীনা" নাযিল হয় অর্থাৎ তারা নিশ্চিন্ত জীবন লাভ করে, (২) আল্লাহ্‌র রহমত তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখে, (৩) ফেরেশতাগণ তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং (৪) আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে সে মজলিসে আলোচনা করেন যে মজলিসটি তাদের মজলিসের চেয়ে উত্তম। হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে–

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ উত্তম জিকর হলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং উত্তম শোকর হলো اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ হযরত এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– যখন যেনাকারী এবং মদ্যপায়ী আল্লাহ্‌র জিকর করে তখন আল্লাহ্ পাক তারা বিরত না হওয়া পর্যন্ত লা'নতের ভাষায় তাদেরকে স্মরণ করে থাকেন। আর শোকর হলো, আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের অসদ্ব্যবহার না করা এবং তাঁর নির্দেশ মোতাবেক আমল করা। যেমন সম্পদ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, এলম, জ্ঞান ইত্যাদি তাঁর সন্তুষ্টি অনুযায়ী ব্যবহার করা। "দুররে মনছুরে" রয়েছে শোকর হলো গুনাহ পরিত্যাগ করা। হযরত জুনায়েদ (রঃ) বলেন, একদিন আমাকে হযরত সের্‌রী সাকতী (রঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "শোকর কাকে বলে"? আমি আরজ করলাম, "আল্লাহ পাকের দান ও নেয়ামত সমূহকে গুনাহর কাজে ব্যবহার না করা"। মূলতঃ আলোচ্য আয়াতখানি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফজিলত, তাঁর উচ্চ মর্যাদার স্তর এবং তাঁর মোজেযা সমূহের বর্ণনা প্রদান করছে। তাঁর ফরমাবরদারী এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর মহব্বতের প্রমাণও এ আয়াতখানি বহন করছে। কারণ নেয়ামত সমূহ লাভ করে তা যথাযথ ভাবে স্মরণ রাখা এবং তাঁকে গণিমত মনে করাই হলো জিকর এবং শোকর।[১]

বস্তুতঃ যারা আল্লাহর জিকরে নিজেকে ব্যস্ত রাখে তাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে আল্লাহর মহব্বত বা ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর জিকরের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে আল্লাহ্‌র মহব্বত ও ভালবাসা তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে এমন একদিন আসে যখন আল্লাহ্‌র প্রেমিক বন্দা তাঁর স্মরণে, তাঁর ধ্যানে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে দেয়।

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে আমাদেরকে দু'টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন–(১) জিকর এবং (২) শোকর। জিকর মৌখিক হতে পারে, আন্তরিকও হতে পারে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারাও হতে পারে। মৌখিক জিকর অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের হাম্দের তস্বীহ পাঠ করা এবং আল্লাহ্র কালাম তেলাওয়াত করা। আর অন্তরের জিকর হলো (ক) আল্লাহ পাকের একত্ববাদের যে সমস্ত নির্দশন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিতে ছড়িয়ে আছে তা সম্পর্কে চিন্তা করা। (খ) দলিল প্রমাণ সম্পর্কে কোন সন্দেহের উদ্রেক হলে তার প্রতি-উত্তর সম্পর্কে চিন্তা করা। (গ) আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ এবং পুরস্কারের অঙ্গীকার ও শাস্তি সম্পর্কে সর্তকবাণীর ব্যাপারে চিন্তা করা। (ঘ) সমগ্র সৃষ্টিজগত সম্পর্কে চিন্তা করা এবং সে সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে গবেষণা করা, যেন সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু সে ব্যক্তির জন্যে একটি দর্পণের ন্যায় হয়ে যায় আর সে স্বচ্ছ দর্পণে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের জ্বলন্ত নির্দশন সমূহ সে অবলোকন করতে পারে। এটি এমনি একটি মকাম যার কোন সীমা নেই এবং শেষও নেই।

আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা জিকরের তাৎপর্য হলো মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনে ব্যস্ত থাকা এবং তাঁর নিষিদ্ধ কাজ থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা। ইমাম রাজী (রঃ) আরও বলেন ঃ এ অর্থেই মূলত ঃ আল্লাহ্ পাক নামাযকে জিকর বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন সূরা জুমআ'য় এরশাদ হয়েছে–

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ

অর্থাৎ "(জুমআর দিন আযান হওয়া মাত্র) তোমরা দ্রুত আল্লাহর জিকরের জন্যে তথা নামাযের জন্যে হাযির হও"।

অতএব– فَاذْكُرُوْنِىْ অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর"– একথার মধ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য এবং সকল প্রকার এবাদত অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এজন্যেই ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

(১) "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার প্রতি আনুগত্যের দ্বারা, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আমার রহমত দ্বারা।

(২) মূলতঃ আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে আদেশ দিয়েছেন যেন প্রতিটি মানুষ তাঁর রহমতের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং তাঁর আযাবের ভয়-ভীতি নিয়ে তাঁকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ পাককে স্মরণ করে এখলাছ তথা পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে। তাহলে আল্লাহ্ পাক বন্দাদেরকে স্মরণ করবেন দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে তথা তাঁর মহান দানে তিনি তাদেরকে ধন্য করবেন এবং তাদের প্রতি বর্ষিত হবে তাঁর করুণা-বৃষ্টি।

(৩) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার প্রশংসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে। তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো প্রশংসা এবং নেয়ামতের মাধ্যমে।

(৪) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" দুনিয়াতে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আখেরাতে।

(৫) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" একাকী, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো মজলিস সমূহে।

(৬) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" সুখ-শান্তি ও নেয়ামত লাভের সময়, আর আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমাদের বিপদ মুহূর্তে।

(৭) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার এবাদতের মাধ্যমে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমাদের প্রতি সাহায্যের মাধ্যমে।

(৮) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার পথে সাধনার মাধ্যমে, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো আমার হেদায়েত দানের মাধ্যমে।

(৯) فاذكرونى অর্থাৎ "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" পূর্ণ সততা, এখলাছ আন্তরিকতার সঙ্গে, তাহলে আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করবো বিশেষভাবে দোযখ থেকে নাজাত প্রদানের মাধ্যমে।

(১০) فاذكرونى "তোমরা আমাকে স্মরণ কর" আমার লালন-পালনের কথা স্মরণ করে, তাহলে আমি তোমাদেরকে স্মরণ করবো তোমাদের প্রতি রহমত নাজিলের মাধ্যমে।

وَاشْكُرُوْا لِىْ

অর্থাৎ তোমরা আমার প্রদত্ত নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় কর এবং আমার নেয়ামতকে অস্বীকার করে অকৃতজ্ঞ হয়োনা। আল্লামা এবনে জরীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন– আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মোমেনদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন ঃ হে মোমেনগণ! তোমাদেরকে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দিয়েছি তার জন্যে তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। বিশেষত দ্বীন ইসলামের হেদায়েতের মাধ্যমে তোমাদেরকে যে নেয়ামত দান করেছি তার জন্যে তোমরা শোকর গুজার হও তথা দ্বীন ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন কর। আর আমার অকৃতজ্ঞ হয়োনা, অবাধ্য হয়োনা, আমার নেয়ামতকে অস্বীকার করোনা। এমন অবস্থায় আমার নেয়ামত আমি তোমাদের থেকে ছিনিয়ে নেবো। কেননা আমি আমার সৃষ্টির সঙ্গে অঙ্গীকার করেছি, যে আমার নেয়ামতের শোকর আদায় করবে তার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব, আর যে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হবে তাকে নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করবো।[১]

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৩

বিখ্যাত সুফি-সাধক হযরত ফুযাইল এবনে ইয়ায (রঃ)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিল, ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন আশংকা আছে কি? ফুযাইল এবনে ইয়ায (রঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ, আছে। প্রশ্নকারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো ঃ কখন? তিনি উত্তর দিলেন ঃ "যখন কোন মুসলমান ইসলামের নেয়ামত লাভের জন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজার না হয় তখন ইসলামের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা থাকে"।[১]

উল্লেখ্য, ইসলামের নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পন্থা হলো ইসলামকে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ নেয়ামত বলে উপলব্ধি করা এবং ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধকে সঠিক ভাবে পালন করা।

এজন্যেই সময় থাকতে তার সদ্ব্যবহার করতে হবে। আর সময়ের সদ্ব্যবহারের সর্বোত্তম পন্থা হলো– যিনি জীবনের মালিক, খালেক, যিনি স্রষ্টা ও পালনকর্তা তাঁর স্মরণে আত্মনিয়োগ করা, তাঁর সন্তুষ্টি লাভে সচেষ্ট হওয়া, তাঁর নৈকট্য এবং সান্নিধ্যে লাভের সাধনায় রত হওয়া।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দুনিয়া অভিশপ্ত, দুনিয়াতে যা কিছু আছে সবই অভিশপ্ত, কিন্তু আল্লাহর জিকর ও যা কিছু তার নিকটবর্তী হয় এবং আলেম, তালেবে এলম অর্থাৎ আল্লাহ্র জিকরে যে মশগুল হয় আর এ জিকর অব্যাহত রাখার জন্যে যেসব পানাহার, বাসস্থান প্রভৃতি জিনিসপত্রের প্রয়োজন হয় সেগুলো ব্যতীত আলেম ও (জ্ঞানের অন্বেষণকারী) তালেবে এলম ব্যতীত আর সবাই এই হাদীসের আওতায় পড়ে। এজন্যে নাজাত লাভের সহজ পথ হলো আল্লাহ্র জিকরে মশগুল হওয়া, মনে মনে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করা এবং দ্বীনি এলম হাসিল করার জন্যে সর্বদা সচেষ্ট থাকা।

আর একখানি হাদীসে রয়েছে, হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) সহ একদল সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্র জিকরে মশগুল ছিলেন। এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে আগমন করলে তাঁরা নির্বাক হয়ে গেলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তোমরা কি করছিলে? তাঁরা আরজ করলেনঃ আমরা আল্লাহ্র জিকরে মশগুল ছিলাম।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ আমি লক্ষ্য করছিলাম যে, আল্লাহর রহমত তোমাদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছিল তখন আমার মনে চাইলো আমি তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করি। অতঃপর তিনি আরও এরশাদ করলেনঃ "আলহামদুলিল্লাহ"। আল্লাহ পাক আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক সৃষ্টি করেছেন যাদের সঙ্গে উপবিষ্ট হবার আদেশ আমার প্রতি হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৪৪

(রাঃ) থেকে বর্ণিত অন্য একখানি হাদীসে হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের এরশাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তুমি ফজরের নামাযের পর এবং আছর নামাযের পর কিছুক্ষণ আমার স্মরণে মশগুল থাক তাহলে এর মধ্যবর্তী সময়ে আমি তোমার জন্যে যথেষ্ট হব।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۳﴾ وَلَا
تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا
تَشْعُرُوْنَ ﴿۱۵۴﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ
الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ؕ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِيْنَ اِذَآ
اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ ۙ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ اُولٰٓئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۟ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ﴿۱۵۷﴾

তরজমা

(১৫৩) হে মোমেনগণ! সবর এবং নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সাথেই আছেন।

(১৫৪) যারা আল্লাহ পাকের রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে কখনও মৃত বলোনা, বরং তাঁরা জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি কর না।

(১৫৫) আর নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা, ধন-সম্পদের ক্ষতি ও প্রাণহানি এবং ফল-শস্যের ক্ষতি দ্বারা। (হে রসূল!) আপনি সুসংবাদ দিন সেই লোকদেরকে–

(১৫৬) যাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলেঃ নিশ্চয় আমরা আল্লাহ পাকেই জন্যে এবং আমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তনকারী।

(১৫৭) এমন লোকদের উপরই তাদের পালনকর্তার নিকট থেকে অনুগ্রহ এবং রহমত নাযিল হয় এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত।

তফসীরুল কোরআন

ইসলামের দুশমনরা কেবলা পরিবর্তনের কারণে মুসলমানদেরকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার অপচেষ্টায় মেতে উঠেছিল, তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে

মুসলমানদেরকে সত্যের উপর অটল অবিচল এবং সুদৃঢ় থাকার ও দুশমনের কথায় কর্ণপাত না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্যে প্রয়োজন হলো আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের। আর আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের দুটি পন্থা রয়েছে (১) সবর (২) নামায। এ দুটি পন্থা অবলম্বনের তাগিদ করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

জীবন-সমস্যার সমাধানে আল্লাহর সাহায্য কামনা করো

হে মোমেনগণ! দুশমনরা ইসলামের উপর যত প্রশ্নই করুক এবং তোমাদের জীবন-সমস্যা যত কঠিন ও জটিলই হোক, তাতে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়োনা; বরং জীবন-সমস্যার সমাধানে আল্লাহ পাকের সাহায্য কামনা কর সবর এবং নামায দ্বারা। কেননা, যে সবর অবলম্বন করে ও নামাযের মাধ্যেমে আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তার ভয়ের কোন ন্যায্য কারণ থাকেনা, বস্তুত যারা সবর অবলম্বন করে আল্লাহ পাক তাদের সঙ্গে থাকেন। আল্লাহ পাকের নৈকট্যর কারণেই তাদের সকল সমস্যার সমাধান হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় এ বিষয়টি লক্ষ্য করি যে, কোন শক্তিশালী বা সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক থাকলে আর বিপদাপদে সে হাযির হলে মনে এক প্রকার সান্ত্বনা দেখা দেয়। এমনকি রুগ্ন হলে যদি কোন চিকিৎসক এসে দেখে তবু মনে শান্তি আসে। এমনি অবস্থায় যদি কোন মানুষ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে লাভে ধন্য হতে পারে তবে এ জীবনে ও পরজীবনে তার কোন সমস্যাই থাকতে পারেনা। মূলতঃ মানুষের এ জীবন অত্যন্ত কন্টকাকীর্ণ তা আদৌ ফুল শয্যা নয়। এখানে প্রতিযোগিতা আছে, বাধা-বিপত্তি আছে, এমনকি বিপদাপদও আছে আর এসব বিপদাপদ ব্যক্তি জীবনে হোক কি জাতীয় জীবনে তার মোকাবেলা করতে হবে ধৈর্য সহকারে এবং শক্তি সঞ্চয় করতে হবে নামাযের মাধ্যমে। কেননা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের সান্নিধ্য লাভ করার সর্বাধিক সুযোগ আসে তখন যখন মানুষ সেজদারত হয়, অতএব, বিপদে ধৈর্য্যহারা হলে চলবে না, বরং যে কোন অবস্থায় ধৈর্যের মুকুট পরিধান করতে হবে, অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে হবে যথাযথভাবে এবং আদেশের প্রতি সুদৃঢ় এবং পূর্ণ আস্থাবান থাকতে হবে। সবর অবলম্বনের মাধ্যেমে পর্বতের ন্যায় অবিচল থাকতে হবে এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করতে হবে। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"হে মোমেনগণ! তোমরা সাহয্য প্রার্থনা কর সবর এবং নামায দ্বারা"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববতী আয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে শোকর গুজারীর নির্দেশ ছিল। আর এ আয়াতে সবরের তা'লীম রয়েছে। শোকর এবং সবর-দুটিই ইসলামের বিশেষ ও বুনিয়াদী শিক্ষা সমূহের অন্যতম। মানুষের জীবনে দুটি অবস্থা,

অর্থাৎ সুখ বা দুঃখ সর্বদা পরিলক্ষিত হয়। সুখ হলে এর জন্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের কর্তব্য। পক্ষান্তরে দুঃখ হলে মানুষকে সবর অবলম্বন করতে হয়। এটিই ইসলামের শিক্ষা। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "মোমেনের অবস্থা অত্যন্ত বিস্ময়কর, সব কিছুই তার জন্যে কল্যাণকর। আর এ অবস্থা মোমেনেরই বৈশিষ্ট্য। কেননা মোমেন যখন আনন্দ লাভ করে তখন সে আল্লাহর দরবারে শোকর আদয় করে। আর তা হয় তার জন্যে কল্যাণকর। আর যখন সে কোন বিপদাপদের সম্মুখীন হয় তখন সে সবর অবলম্বন করে, আর তা-ও হয় তার জন্যে কল্যাণকর"।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন– "দুনিয়াতে যদি কোন ব্যক্তিকে সবর অবলম্বনের গুণ প্রদত্ত হয় তবে মনে করতে হবে যে তাকে সর্বোত্তম এবং ব্যাপকতম নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে"।

সবরের তাৎপর্য

মূলতঃ সবর বা ধৈর্যের তাৎপর্য হলো নিজেকে আল্লাহ্ পাকের নাফরমানির কাজ থেকে বিরত রাখা, আল্লাহর আযাবের ভয়ে ভীত হওয়া, তাঁর রহমতের আশায় আশান্বিত হওয়া এবং বিপদে ধৈর্যে ধারণ করা, এমনিভাবে আসন্ন নেয়ামতের আশায় সবর অবলম্বন করা অথবা প্রাপ্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করে বর্তমান বিপদে সবর অবলম্বন করা। এসবই সবর অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত।

বস্তুত জীবনের সকল সাধনাই যে সার্থক হবে এমন নয়। কখনো কখনো মানুষকে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়, বিপদের মোকাবেলা করতে হয়। অনেক লোভনীয় মোহনীয় অন্যায় থেকেও নিজেকে বিরত রাখতে হয়। এমন নাজুক সময়ে সবর অবলম্বনের নীতি অবলম্বন ব্যতীত কোন গত্যন্তর থাকে না। এজন্যেই পবিত্র কোরআনে মুসলমানদেরকে সবর অবলম্বনের তথা ধৈর্য ধারণের তাগিদ করা হয়েছে বারে বারে। এ সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত বিশেষভাবে লক্ষণীয়ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِاللّٰهِ وَاصْبِرُوْا

"হে মোমেনগণ! আল্লাহ্ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর আর ধৈর্য ধারণ কর"।

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ

"এবং ধৈর্য ও নামাযের দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর"।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا

"হে মোমেনগণ! তোমরা ধৈর্য ধারণ কর এবং অন্যকেও ধৈর্য ধারণের তা'লীম দাও"।

وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

"ধৈর্য ধারণ কর, তোমার ধৈর্য শুধু আল্লাহর জন্যে"।

وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ

"যারা বিপদ এবং যুদ্ধের সময় ধৈর্য ধারণ করে"।

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

"আল্লাহ পাক ধৈর্য ধারণকারীদের ভালবাসেন"।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন"।

وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ

"যদি তোমরা ধৈর্য ধারণ করতে তবে তাই হতো তোমাদের জন্যে উত্তম"।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْٓا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

" যারা ধৈর্য ধারণ করবে তাদের অবশ্যই দান করবো উত্তম বিনিময়"।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

"(হে রসূল!) এই কাফেররা যেসব অন্যায় কথা বলছে, তার উপর আপনি ধৈর্য ধারণ করুন এবং আপনার প্রতিপালকের হাম্‌দের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন"।

অতএব, জীবন-সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে সবর অবলম্বন তথা–ধৈর্য ধারণ একান্ত কর্তব্য। এটিই ইসলামের মহান শিক্ষা। এটিই পবিত্র কোরআনের নূরানী তা'লীম এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শ। আলোচ্য আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আরোপিত ফরজ সমূহ আদায়ে এবং আল্লাহ নাফরমানী থেকে বিরত থাকায় তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর সবর এবং নামায দ্বারা।

اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদেরকে স্বীয় বিধি-নিষেধ পালনে সাহায্য করেন, তিনি তাদেরকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করেন, আল্লাহ পাকের খাছ রহমত লাভে ধন্য হন সবর অবলম্বনকারীগণ।[১]

নামায হলো মোমেনদের মে'রাজ

এখানে এ প্রশ্ন অবান্তর নয় যে, আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে আছেন, তবে কি নামাযীদের সঙ্গে তিনি নেই? তফসীরকারগণ এর জবাবে বলেছেনঃ যখন একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সবর অবলম্বনকারীদের সঙ্গে রয়েছেন তখন নামাযীদের সঙ্গেও আছেন একথা বলার কোন প্রয়োজন হয়নি। কেননা হাদীস শরীফে রয়েছে, নামায হলো মোমেনদের মে'রাজ এবং নামাযের মাধ্যমেই আল্লাহ পাকের অধিকতর নৈকট্য লাভ করা সম্ভব হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَسَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ

(মুসলিম শরীফ)

অর্থাৎ বন্দা যখন সেজদারত থাকে তখনই তাঁর প্রতিপালকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। অতএব সেজদারত অবস্থায় তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া কর।

নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হলো নামায

এতদ্ব্যতীত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেনঃ

قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ

অর্থাৎ আমার নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হলো নামায। নামাযের মাধ্যমে সাহায্য লাভের একটি ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) অসুস্থতার কারণে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। সকলেই উপলব্ধি করল যে, তাঁর এন্তেকাল হয়ে গেছে। তাঁর দেহ বস্ত্রাবৃত করা হলো। এরই মধ্যে তাঁর স্ত্রী উম্মে কুলছুম মসজিদে গমন করলেন এবং এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ অনুযায়ী নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। অল্পক্ষণ পরেই হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) জ্ঞান ফিরে পেলেন।

দ্বিতীয়তঃ ঈমানের হেফাজত সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

(১) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ২১

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

অর্থাৎ নামায হলো ইসলামের স্তম্ভ। আরও এরশাদ হয়েছে যে, আমাদের এবং অন্য লোকদের মধ্যে নামায এমন একটি শর্ত যে, যে ব্যক্তি নামায ছেড়ে দিয়েছে সে কুফরী করে বসেছে। এরপর এরশাদ হয়েছেঃ

لَا سِهَامَ فِىْ الْاِسْلَامِ لِمَنْ لَاصَلٰوةَ لَهٗ

অর্থাৎ বে-নামাযীদের জন্যে ইসলামে কোন অংশ নির্ধারিত নাই।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এক রাত্রে আমি দেখতে পেলাম যে আমার উম্মতের এক ব্যক্তির উপর কবরের আযাব হতে যাবে, এমন সময় তার অজু এসে তাকে রক্ষা করল। অপর এক ব্যক্তিকে আযাবের ফেরেশতাগণ ঘিরে ধরেছিল তখন নামায তাকে আযাব থেকে মুক্ত করে দিল। হযরত কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যখন আযাবের ফেরেশতা সকল কবরে আসে তখন মাথার দিক থেকে রোজা, পায়ের দিক থেকে নামায তাদেরকে বিরত করে দেয়।

আরো এরশাদ হয়েছে ঃ আমি (কেয়ামতের দিন) আমার তৃষ্ণার্ত উম্মতের জন্যে হাউজে কাউসারের নিকট থাকব। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আপনি কিভাবে খাদেমদের পরিচয় পাবেন? তখন তিনি এরশাদ করলেন ঃ অজুর কারণে হস্ত, পদ এবং মুখমণ্ডল নূরানী হয়ে যাবে।[১]

وَلَا تَقُوْلُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহর রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তাদেরকে তোমরা মৃত বলোনা।

শানে নুযুল

এ আয়াত বদরের শহীদানের শানে নাযিল হয়েছে। বদরের যুদ্ধে ছয় জন মোহাজের এবং আটজন আনসারী সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। তাঁদের সম্পর্কে কেউ কেউ যখন এ মন্তব্য করলো যে অমুক ব্যক্তির মৃত্যু হলো, সে দুনিয়ার নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো। তখন আল্লাহ পাক তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পে শহীদানের উচ্চ মরতবা সম্পর্কে অবগত করতে এ আয়াত নাযিল করেন।

শহীদ চিরঞ্জীব

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ শহীদানের রূহ সবুজ রংয়ের পাখীর কায়ায় রয়েছে এবং জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানে তারা যাওয়া আসা করে।

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬

অতঃপর তারা আরশের তলদেশে ঝুলন্ত ঝাড় সমূহে এসে উপবিষ্ট হয়। একবার তাদের পরওয়ারদেগার তাদের প্রতি লক্ষ্য করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন কি চাও? তারা জবাব দিল– হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন এমন নেয়ামত দান করেছ যা আর কেউ লাভ করেনি। এরপর আর আমাদের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? অতঃপর তাদেরকে পুনরায় এ প্রশ্ন করা হলো। যখন তারা দেখলো যে, এ প্রশ্নের জবাব অবশ্যই দিতে হবে তখন আরজ করলো– হে আল্লাহ! আমাদেরকে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার প্রেরণ কর, আমরা তোমার পথে যুদ্ধ করি, তৎপর শাহাদাত বরণ করে তোমার দরবারে হাযির হই, শাহাদাতের দ্বিগুণ মরতবা লাভ করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– "তা হয় না"। কেননা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে মৃত্যুর পর পৃথিবীতে কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না। মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, মোমেনের রূহ একটি পাখী, যা জান্নাতের বৃক্ষ সমূহে থাকে আর কেয়ামতের দিন তারা নিজ নিজ দেহের দিকে ফিরে আসবে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন– এতে একথা জানা যায় যে, মোমেন মাত্রেরই রূহ সেখানে জীবিত। কিন্তু শহীদানের রূহ এক প্রকার বিশেষ সম্মান, মর্যাদা, বুযুর্গী এবং শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।[১]

بَلْ اَحْيَاءٌ

"বরং তারা জীবিত"– অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ উৎসর্গ করে তথা শাহাদাত বরণ করে তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জীবিত। তাঁরা অমরত্ব লাভ করে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ পাক শহীদানের রূহকে একটি বিশেষ শক্তি দান করেন যদ্বারা শহীদানের রূহ সমূহ যমীন-আসমান সহ জান্নাতের সর্বত্র ভ্রমণ করতে থাকে। শহীদানের এ অমরত্ব লাভের কারণেই যমীন তাঁদের দেহ এবং কাফনকে বিনষ্ট করতে পারে না।[২]

وَلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ

অর্থাৎ শহীদগণ যে মৃত নয়; বরং চিরঞ্জীব, তাদের অমরত্বের এ রহস্য তোমাদের নিকট উদ্‌ঘাটিত নয়। তাঁদের জীবন আছে সত্য কিন্তু তা এমন নয় যে সকলে উপলব্ধি করতে পারে। আর এমনও নয় যে মানুষের বুদ্ধির দীপ্তি সে পর্যন্ত পৌঁছে। বরং তাঁদের অমরত্বের কথা এই ওহী দ্বারা জানা যায়। এজন্যে এরশাদ হয়েছে, শহীদানের জীবনের প্রকৃত অবস্থা তোমাদের বোধগম্য নয়। এ বাক্যটির তফসীরে আল্লামা বয়জাবী (রঃ) বলেছেন–

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬১

اِنَّمَا هِىَ اَمْرٌ لَا يُدْرَكُ بِالْعَقْلِ بَلْ بِالْوَحْىِ

অর্থাৎ এ বিষয়টি এমন যা বুদ্ধি দ্বারা নয়, বরং শুধু ওহী দ্বারাই জানা যায়।[১] আর আল্লামা আলুসী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলেছেন–

لِاَنَّهَا مِنْ اَحْوَالِ الْبَرْزَخِ اَلَّتِىْ لَا يُطَّلَعُ عَلَيْهَا–وَلَا طَرِيْقَ لِلْعِلْمِ بِهَا اِلَّا بِالْوَحْىِ

অর্থাৎ শহীদানের জীবনের প্রকৃত অবস্থা এজন্যেই তোমাদের বোধগম্য নয় যে এটি হলো আলমে রবজখের কথা, যার খবর পাওয়া সম্ভব নয় এবং এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ ওহী।[২]

আল্লামা বগবী (রঃ) বলেন, বদর যুদ্ধের শহীদগণের রুহ প্রতি রাতে আরশের নীচে সেজদা করে থাকে। কেয়ামত পর্যন্ত এ রকম করতে থাকবে। হাদীস শরীফে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শহীদগণ যখন শহীদ হয় তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে একটি উৎকৃষ্ট দেহের মধ্যে স্থানান্তরিত করেন। রূহকে তখন হুকুম করা হয়– এ দেহে প্রবেশ কর, সে তখন তাতে প্রবেশ করে এবং পূর্বের দেহ দেখতে পায়। সে মনে করে যে মানুষ তাকে দেখছে এবং তার কথা শুনছে। এমন সময় তার কাছে হুর সকল এসে পড়ে এবং সঙ্গে করে তাকে নিয়ে যায়। এই হাদীস এবনে মুনদাহ (রাঃ) থেকে মোরছাল রূপে বর্ণিত হয়েছে। অন্য একখানি হাদীস মুসলিম শরীফে হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, শহীদ ব্যক্তিগণের রূহ সমূহ আল্লাহ পাকের নৈকট্যে সবুজ পাখীদের মধ্যে থেকে জান্নাতের যেখানে খুশী সেখানে উড়ে বেড়াতে থাকে এবং আরশের নীচে যে ঝাড় সমূহ রয়েছে সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করতে থাকে। এই হাদীস সমূহের প্রতি লক্ষ্য রেখে আলেমগণ বলেন যে, এরূপ জীবন শুধু শহীদ ব্যক্তিগণই লাভ করতে পারেন। আর অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো, এরূপ জীবন শুধু শহীদগণই যে পেয়ে থাকেন তা নয়; বরং হাদীসের তথ্য এবং অন্যান্য আহ্কাম থেকে জানা যায় নবীগণ এরূপ জীবন আরও অধিক রূপে পেয়ে থাকেন। এমনকি তাঁদের সে জীবন দুনিয়াতেও ক্রিয়াশীল থাকে। যেমন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এন্তেকালের পর তাঁর পবিত্র বিবিগণের বিবাহ হওয়া জায়েয হয় না। অথচ শহীদগণের স্ত্রীদেরকে বিবাহ করা জায়েয। আর যারা ছিদ্দিক তাঁরা শহীদগণের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার জীবন লাভ করে থাকেন। ছালেহীন অর্থাৎ আউলিয়া কেরাম শহীদগণের চেয়ে নিম্ন মর্যাদা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, তবে এদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক রয়েছে যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৪
(২) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

"এরাই হলো সে সব লোক যাদেরকে আল্লাহ্ পাক নেয়ামত প্রদান করেছেন। তারা নবী, ছিদ্দিক, শহীদ এবং ছালেহীন (পূণ্যবান)"।

মর্যাদার ক্রমানুসারে অনেক বাক্যে শব্দ ক্রমান্বয়ে বর্ণিত হয়ে থাকে। এসব কারণে সুফিয়ায়ে কেরাম (রঃ) বলেছেন– আমাদের দেহটিই আমাদের রূহ এবং আমাদের রূহ-ই আমাদের দেহ। শত শত এমনকি হাজার হাজার এমন সব নির্ভরযোগ্য ঘটনা রয়েছে যা দ্বারা বোঝা যায়, আউলিয়া কেরাম তাঁদের প্রিয়জনের সাহায্য করে থাকেন এবং দুশমনদেরকে ধ্বংস করে থাকেন। আর আল্লাহ্ পাক যার জন্যে হুকুম করেন তাঁকে তাঁরা আল্লাহ্র পথ দেখিয়ে দেন।

এ সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দেদে আলফেসানী (রঃ) বলেছেন, নবুওয়্যতের গুণাবলী ওয়ারিশ সূত্রে চলে আসে। হযরত আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেন, যাদেরকে নবুওয়্যতের গুণাবলী ওয়ারিশ সূত্রে প্রদান করা হয় শরীয়তের পরিভাষায় তাদেরকে ছিদ্দিক এবং মোকার্রাব বলা হয়। আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে বিশেষ মরতবা দান করেন। কয়েকখানি হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম, শহীদগণ এবং কোন কোন নেককারের দেহ যমীন বিনষ্ট করেনা। হাকেম এবং আবু দাউদ আউস এবনে আউসের বর্ণনা সংকলন করেছেন। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– আল্লাহ্ পাক যমীনের উপর আম্বিয়ায়ে কেরামের দেহ হারাম করে দিয়েছেন। এই হাদীস এবনে মাজাহ্ সংকলন করেছেন। বর্ণনা হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর। ইমাম মালেক (রঃ) আবদুর রহমান এবনে দারদা থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি বলেন, আমি এ সংবাদ পেয়েছি যে, হযরত আমর এবনে জুমুহ (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে যুবায়ের (রাঃ)-এর কবর বন্যার কারণে ধ্বসে যায়। তাঁরা উভয়েই ওহুদের দিন শাহাদাত বরণ করেন এবং তাঁদের উভয়কেই একই কবরে দাফন করা হয়। বন্যার কারণে কবর বিনষ্ট হওয়ায় তাঁদেরকে অন্যত্র সরানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যখন তাঁদের কবরের মাটি সরানো হয় তখন দেখা যায় তাঁদের দেহের কোন পরিবর্তন হয়নি, মনে হয় গতকাল দাফন করা হয়েছে। অথচ তাঁদের শাহাদাতের পর ৪৬ বছর অতিবাহিত হয়।

এমনিভাবে বায়হাকী আরেকটি ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) যখন 'কাজমা' নামক খাল খনন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন তখন দেখা গেল ওহুদের শহীদগণের কবর উক্ত খালের পরিকল্পিত স্থানে চলে আসে। এ প্রেক্ষিতে হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রাঃ) ওহোদের শহীদগণের আত্মীয়-স্বজনকে একত্রিত করে এ নির্দেশ দিলেন তারা যেন নিজ নিজ শহীদ আত্মীয়কে অন্যত্র দাফন করেন। তখন দেখা গেল শহীদানের দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত, তাজা এবং তাঁদের চুল বড় হয়ে

গিয়েছিলো। কবর খননের সময় ঘটনাক্রমে একজন শহীদের পায়ে কোদালের আঘাত লাগে ফলে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। আর মাটি খননের সময় এক জায়গা থেকে কস্তুরীর এমন সুগন্ধ আসতে থাকে যে পুরো এলাকা সুগন্ধময় হয়ে গেল। বায়হাকী (রঃ) এ ঘটনা হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে এতটুকু কথা সংযোজন করেছেন যে কোদাল হযরত হামজা (রাঃ)-এর পায়ে পড়েছিল।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস ইমাম তেবরানী সংকলন করেছেন যে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, পবিত্র কোরআনের ধারক ও বাহকের মৃত্যু যখন হয় তখন আল্লাহ্ পাক যমীনকে আদেশ দেন যেন সেই ব্যক্তির গোশত্ ভক্ষণ না করে। তখন যমীন আরজ করে –হে আল্লাহ্! আমি তার গোশত্ কি করে ভক্ষণ করবো কেননা তার উদরে আপনার পবিত্র কালাম রয়েছে। আল্লামা কাজী সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, এই হাদীসে কোরআনের ধারক, বাহক হয়তো ছিদ্দিকগণ হবেন। কেননা পবিত্র কোরআনের বরকতের অধিকারী হওয়া তাঁদেরই বৈশিষ্ট্য।[১]

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে, এরপর আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যারা প্রাণ উৎসর্গ করে তথা সবরের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তাদের অমরত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।[২] এ আয়াতে সবরের মহান আদর্শ গ্রহণের তাগিদ রয়েছে। সবর অবলম্বনকারীদের পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণ করব কিছুটা ভয়ের মাধ্যমে এবং কিছুটা দারিদ্র তথা অন্ন-কষ্টের মাধ্যমে এবং ফলমূলের অনিষ্টের মাধ্যমে। এমন অবস্থায় তোমরা সবর অবলম্বন কর। এ আয়াতের তফসীরে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এখানে খাওফ বা ভয় হলো শত্রুর ভয়।[৩]

আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে মুসলমানদেরকে এই বলে সতর্ক করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তোমাদেরকে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এ পরীক্ষা ধন-সম্পদের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে হতে পারে, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কষ্টের মাধ্যমেও হতে পারে এমনকি, প্রাণের বিনিময়েও হতে পারে। এমন কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একমাত্র পন্থা হলো সবর অবলম্বন করা আর এ পরীক্ষা এজন্যে যেন আল্লাহ পাকের বিধি মোতাবেক তাঁর সিদ্ধান্তের উপর কে সন্তুষ্ট থাকে আর কে না থাকে তা প্রকাশ্যে দেখা যায়।[৪]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬২-৬৪

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৪

(৩)তানবীরুল মেকবাস মীন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ২২

(৪) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৫

বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি কোন লোকের সন্তানের মৃত্যু হয় তখন আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বন্দার শিশুর রূহ কবজ করেছ? ফেরেশতাগণ আরজ করে জ্বী, হ্যাঁ। অতঃপর আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি আমার বন্দার মনের শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছ? তারা আরজ করে জ্বী, হ্যা। এরপর আল্লাহ্ পাক জিজ্ঞাসা করেন, আমার বন্দা এ সময় কি বলেছে? ফেরেশতাগণ আরজ করে সে "ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন" পড়েছে এবং আপনার হাম্দ বা প্রশংসা করেছে, তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, আমার বন্দার জন্যে তোমরা জান্নাতে একটি গৃহ তৈরী কর আর এর নাম বায়তুল হাম্দ রাখ।[১] এই হাদীস সংকলিত হয়েছে তিরমিযী শরীফে। ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিপদগ্রস্ত হবার পূর্বেই এ সম্পর্কে যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন, তাতে রয়েছে বিশেষ হেকমত।

(১) মুসলমানগণ যেন বিপদে ধৈর্য ধারণের পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। আর বিপদ যত বড়ই হোক পূর্ব প্রস্তুতি থাকলে তা সহজ হয়।

(২) যখন আসন্ন বিপদের সংবাদ পাওয়া গেছে তখন থেকে অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে আর তা অধিকতর সওয়াব লাভের কারণ হয়।

(৩) কাফেররা যখন দেখল যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম চরম বিপদাপদের মোকাবেলা করে এবং জীবন ও জীবনের সর্বস্বের বিনিময়েও দ্বীন ইসলামের উপর সুদৃঢ়ভাবে অবিচল রয়েছেন তখন দ্বীন ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে তাদের চিন্তা করার সুযোগ হলো এ মর্মে যে, এত কঠিন বিপদ সত্ত্বেও যখন মুসলমানরা দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরেছেন তখন একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এটিই সত্য ধর্ম।

(৪) বিপদ আসার পূর্বেই কোরআনে করীমে এ সংবাদ অবশ্যই ভবিষ্যদ্বাণী যা শুধু বিস্ময়করই নয়; বরং অলৌকিকও।

(৫) একথা সর্বজন-বিদিত যে, ইসলামের অভ্যুখানের সময় কিছু মুনাফেক অর্থ-সম্পদের লোভে মুসলমানদের সাথে মিশে গিয়েছিল। পবিত্র কোরআন যখন জান-মালের ক্ষয়ক্ষতির মাধ্যমে কঠিন পরীক্ষা হবে বলে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে তখন সুবিধা ভোগের আশায় যারা হাযির হয়েছিল তারা বিদায় গ্রহণ করেছিল। ফলে এ ঘোষণা দ্বারা ইসলামী আন্দোলনের বিরাট উপকার হয়েছে।

(৬) মূলতঃ মানুষ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখনই অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়। এ আন্তরিকতা বা এখলাছ আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাই এ বিপদ বা এ পরীক্ষায়ও রয়েছে বিরাট হেকমত।[২]

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২

(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪-পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ

এ আয়াতের ব্যাখ্যা খোলাসাতুত্যাফাসীরে এভাবে করা হয়েছে ঃ

"আর আমি অবশ্যই কোন এক বস্তু দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো– ভয় দ্বারা, ক্ষুধা দ্বারা, সম্পদের ক্ষতি দ্বারা, প্রাণের এবং ফসলের ক্ষতির দ্বারা"।

অর্থাৎ কোন না কোন বস্তু দ্বারা আমি তোমাদের পরীক্ষা করবোই। তা ভয় দ্বারা হতে পারে অথবা সম্পদের বা দৈহিক ক্ষতি সাধন করেও হতে পারে।

بِشَىْءٍ (কোনো এক বস্তু দ্বারা)।

একথার মধ্যে ঐসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যার পরীক্ষা কম হোক, বেশী হোক অবশ্যই হবে। আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য যার অধিক লাভ হয়েছে এবং মর্যাদার স্তর যার যত উচ্চতর হয়েছে তার পরীক্ষাও তত কঠিন হয়ে থাকে। তবু কোন মুসলমান বা ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের পরীক্ষার পাত্র হওয়া থেকে মুক্ত নয়। কালেমা তওহীদকে মেনে নিয়ে শেরক এবং বাতিল থেকে আত্মরক্ষা করা প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার প্রমাণ। সাধারণ লোকদেরকে 'শেরকে জলী' অর্থাৎ প্রকাশ্য বা বড় শেরক এবং বিশেষ বন্দাদেরকে শেরকে খফীর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। خوف (ভয়) একথাটিতে সর্ব প্রকারের ভয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাকাতের মধ্যে সম্পদের, রোজার মধ্যে দেহের এবং জেহাদের মধ্যে প্রাণের ভয় রয়েছে। শীতকালের গোসল এবং অজুর মধ্যে ভয় আছে। হক্ব কথা বলার মধ্যে জালেম এবং হিংসা-পরায়ণ লোকদের পক্ষ থেকে ভয় রয়েছে। তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করতে গেলে ভ্রাতৃত্বের বিরোধিতা করার ভয় থাকে, নেতৃস্থানীয় লোকদের ঘৃণার সম্মুখীন হতে হয়, বন্ধুত্বে ছেদ, দুনিয়াদারদের উপহাস এবং শত্রুর শত্রুতা করার ভয় থাকে। جوع (ক্ষুধা) অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত হওয়া, অভাবের দরুণ নিজে অথবা পরিবারের সদস্যদের উপবাস করা, রোজা থাকা এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হারাম খাদ্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা।

সম্পদের ক্ষতি

হারাম সম্পদ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকা। ঘুষ খাওয়া, সুদ খাওয়া, আমানতের খেয়ানত করা, ধোকা দেয়া, অবৈধ ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি যে সব না-জায়েয পদ্ধতিতে সম্পদ পাওয়ার আশা করা যায় ঐসব পদ্ধতিতে উপার্জন পরিত্যাগ করা, আসমানী 'বালা' এবং দুর্ঘটনা যেমন আগুন লাগা, চুরি হওয়া, ডুবে যাওয়া ইত্যাদি।

প্রাণের ক্ষতি

মৃত্যু হওয়া, রোগ হওয়া, জেহাদে শরীক হওয়া, সফরে বের হওয়া, হজ্জে শরীক হওয়া এবং ঐসব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ যাতে দেহের ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। এছাড়া নেক কাজ করতে গিয়ে অথবা গুনাহর কাজ পরিত্যাগ করতে গিয়ে যে মেহনত এবং কষ্ট করা হয় সবই প্রাণের ক্ষতির অন্তর্ভুক্ত।

ثَمَرٰت (ফল সমূহ) একথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে সন্তান, গাছের ফল ও শস্য, ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, পরিশ্রম এবং পরীক্ষার ফল, সুখ্যাতি, সুনাম এবং সর্বপ্রকার ফায়দা ইত্যাদি।

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

"আর আপনি সেসব সবর অবলম্বনকারীদেরকে সুসংবাদ দান করুন যারা মুছিবতে পতিত হলে বলে থাকে– আমরা আল্লাহ্‌র মালিকানাধীন এবং আমরা তাঁর নিকটই ফিরে যাবো"।

অর্থাৎ তারা বলে থাকে যে তারা আল্লাহরই বন্দা এবং আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আর যত নেয়ামত তিনি দান করেছেন তা তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের কাছে আমানত রাখা হয়েছে মাত্র। আমাদের উচিত তাঁর হুকুমের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং তাঁর আমানত ফেরত দিতে গিয়ে অকৃতজ্ঞ না হওয়া। কারণ মালিক তার মালিকানাকে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করতে পারেন।

وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ

আমাদেরকে তাঁরই নিকট ফিরে যেতে হবে। অর্থাৎ আমরা পরকালে তাঁর নিকটই ফিরে যাবো এবং দুনিয়াতেও জিকর এবং মুরাকাবার মাধ্যমে তাঁর দিকে ফিরে যাই। সুতরাং সর্বাবস্থাতেই যখন তাঁর নিকট ফিরে যেতে হয় তখন তিনি যদি নিজের দেয়া কোন নেয়ামত ফেরত নিয়েই নেন তবে আমাদের ক্ষতি কি হলো! এতদ্ব্যতীত তিনি তো ফেরত নেয়া বস্তুর বদলে উত্তম জিনিসই দিয়ে থাকেন।

"সুসংবাদ দান করুন" এ নির্দেশটি দান করা হয়েছে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে না হয় যে-ব্যক্তি সুসংবাদ পাওয়ার যোগ্য তাঁকে। 'মুছিবত' বলা হয় সেই অপ্রীতিকর বিষয়কে যা দ্বারা কোন ব্যক্তি আক্রান্ত হয়ে থাকে।

বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পাদুকা মোবারকের ফিতা ছিড়ে গিয়েছিল, তিনি তখন-اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়লেন। সাহাবাগণের মধ্যে একজন আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! একি একটি মুছিবত"? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "যা মনপূত হয় না এমন কিছু দ্বারা আক্রান্ত হওয়াকেই মুছিবত বলে"। এই হাদীস আবু উমামার (রাঃ) সূত্রে তেবরানী বর্ণনা করেছেন। এরপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– যখন তোমাদের জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তখন তোমরা اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পাঠ কর, কারণ এটাও একটা মুছিবত।

এবনে আবি হাতেম, তেবরানী এবং বায়হাকী (রঃ) ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন–

যে-ব্যক্তি মুছিবতের সময় পাঠ করবে اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আল্লাহ্ পাক তাকে অধিকতর ভাল বিনিময় প্রদান করে থাকেন। আর সে বিনির্ময় এত অধিক হয়ে থাকে যে, সে পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হয়ে যায়। হযরত সাঈদ বিন যোবায়ের (রাঃ) বলেন, মুছিবতের সময় এ উম্মতকে যে সব দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়েছে অন্য কোন উম্মতকে তা শিক্ষা দেয়া হয়নি। উম্মতে মোহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে) ছাড়া আর কাউকে যদি এ দোয়া শিক্ষা দেয়া হতো তবে তা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে শিক্ষা দেয়া হতো। কিন্তু তাঁকেও এ দোয়া শিক্ষা দেয়া হয়নি যার দরুণ তিনি পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর বিচ্ছেদ বেদনার সময়– يٰاَسَفٰى عَلٰى يُوْسُفَ (ইউসুফের জন্যে হায় আফসোস!) বলেছেন। কিন্তু যদি তাঁকে এ দোয়া শিক্ষা দেয়া হতো তবে তাই পড়তেন।[১]

মসনদে আহ্মদে রয়েছে, হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, "একবার আমার স্বামী হযরত আবু সালমা (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমত থেকে আমার কাছে আসলেন এবং অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে বলতে লাগলেন, "আজ আমি এমন একখানি হাদীস শুনেছি যা আমার আনন্দের কারণ হয়েছে"। হাদীসখানি এই -যে কোন মুসলমান কষ্টে পতিত হয়ে এ দোয়া পড়বে,

اَللّٰهُمَّ اْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِنْهَا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে কষ্টের দরুণ সওয়াব দান করো এবং এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান করো। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে সওয়াব এবং বিনিময় অবশ্যই দান করে থাকেন। আমি তখন দোয়া মুখস্ত করে রাখলাম। যখন হযরত আবু সালমা (রাঃ)-এর এন্তেকাল হলো তখন আমি اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ পড়ার পর এ দোয়াও পাঠ করলাম। কিন্তু ভাবলাম, আবু সালমার চাইতে উত্তম বিনিময় আর কি হতে পারে! অতঃপর যখন আমার ইদ্দত পূর্ণ হলো তখন একদিন আমি চামড়া পাকা করার কাজে মশগুল ছিলাম। এমন সময় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন এবং ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। আমি শীঘ্র চামড়া রেখে হাত ধৌত করলাম এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ভেতরে তশরীফ আনতে আবেদন করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে একটি তোষকের বিছানার উপর বসতে দিলাম। তিনি তখন আমাকে বিবাহ সূত্রে গ্রহণ করার প্রস্তাব দান করলেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল'! এটি আমার জন্যে অত্যন্ত সৌভাগ্যজনক হবে। কিন্তু প্রথমতঃ আমি অত্যন্ত অভিমানী স্ত্রীলোক। শেষে এমন না হয় যে,

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৫-৬৬

রসূলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ আমার দ্বারা হয়ে যায় এবং যার ফলে আল্লাহ্‌র আযাবে পতিত হই। দ্বিতীয়তঃ আমার বয়স অনেক হয়ে গেছে। তৃতীয়তঃ আমি এমন একজন স্ত্রীলোক যার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'এ ধরনের অন্যায় অভিমান আল্লাহ্ পাক তোমার থেকে দূর করে দেবেন। আর বয়স আমারও কম নয় এবং তোমার সন্তানগুলো আমারও সন্তান'। একথা শুনে আমি বললাম, 'এরপর হে আল্লাহর রসূল! আমার কোন আপত্তি নেই'। সুতরাং আল্লাহ পাকের নবীর সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেল। এ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক আমার পূর্বের স্বামীর চেয়ে অনেক উত্তম স্বামী দান করলেন।[১]

أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ

"এরাই হলো সে সব লোক যাদের উপর তাদের রবের পক্ষ থেকে রহমত রয়েছে"।

এই "এরা" শব্দ দ্বারা ঐ সকল লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা ইতোপূর্বে বর্ণিত গুণাবলী দ্বারা ভূষিত হয়েছে। صلوٰت শব্দ দ্বারা বরকত, মাগফেরাত, রহমত ইত্যাদি বোঝা যায়। আর যেহেতু রহমত এবং বরকত অনেক প্রকার হয়ে থাকে এজন্যে এখানে শব্দটির বহুবচন صلوٰت প্রয়োগ করা হয়েছে এবং এরপর একটি অতিরিক্ত رحمة শব্দ এরশাদ হয়েছে যেন অধিক এবং অফুরন্ত বোঝা যায়।

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

"এই সকল লোক হেদায়েত প্রাপ্ত হয়েছে"।

অর্থাৎ যেহেতু এরা মুছিবতের সময় ইন্না লিল্লাহ্ পাঠ করে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে সেজন্যে এরা সঠিক পথে রয়েছে। বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয (রাঃ)-এর এক সন্তান মারা গিয়েছিলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে শোকবাণী লিখে পাঠালেন। তাতে লিখিত ছিল- হে মুআয! তোমার সন্তানকে আল্লাহ পাক অনেক সওয়াবের বিনিময়ে নিয়ে নিয়েছেন এবং সেই সওয়াব হলো বরকত, মাগফেরাত, রহমত এবং হেদায়েত। তবে এ সওয়াব তুমি তখন পেতে পার যখন এ মুছিবতের সময় সওয়াবের উদ্দেশ উক্তি, বিলাপ ইত্যাদি থেকে বিরত থাক। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, দুটি জিনিস মানুষের জন্যে সুন্দর সঙ্গী। এ দুটির সঙ্গে আরেকটি বর্ধিত উত্তম বস্তু রয়েছে। বস্তু দুটি হলো 'সালাত' এবং 'রহমাত' আর বর্ধিত বস্তুটি হলো 'হেদায়েত'। সবর অবলম্বনকারী এবং মুছিবত-গ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। উদাহারণ স্বরূপ এখানে কয়েকটি হাদীস পেশ করা যেতে পারে। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইমাম তিরমিজী (রঃ) কর্তৃক সংকলিত হাদীসে রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৩

ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ কেয়ামতের দিন যখন মুছিবত-গ্রস্তদেরকে সওয়াব দেয়া হবে তখন দুনিয়াতে যারা আরামে ছিল তারা এই বলে আক্ষেপ করবে যে, হায়! দুনিয়াতে যদি আমাদের দেহের চামড়া কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলা হতো তবে আমরাও আজ এসব নেয়ামত লাভ করতাম। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, একজন মুসলমানের যত দুঃখ, কষ্ট, ভয়, ভাবনা এমনকি একটি কাঁটাও যদি বিদ্ধ হয়ে থাকে তবে তার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক গুনাহ্ মাফ করে দেন।[১]

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

অর্থাৎ যারা মুসিবতে সবর অবলম্বন করে এবং বিনিময়ে আল্লাহর রহমত লাভে ধন্য হয় তারাই হেদায়েত প্রাপ্ত।

ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে বলেছেন, তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত তথা তারা সকল কল্যাণের পথ লাভ করে।

তারা জান্নাতের পথ লাভ করে সওয়াব বা শুভ-পরিণতি লাভে ধন্য হয়।[২]

এ পর্যায়ে আরও কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আলোচ্য আয়াতে মুসলমানদের যে পরীক্ষার কথা বলো হয়েছে তার মূল লক্ষ্য হলো, আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি যেন আল্লাহ পাকের যে কোন আদেশের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে যাকে 'রেজা বিল কাজা' বলা হয়। যদি কোন মানুষের প্রতি কোন বিপদ আসে আর সেই অবস্থায়ও সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট চিত্তে একথা বলে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে আমি সন্তুষ্ট। তখনই সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রকৃত বন্দা হওয়ার সঠিক প্রমাণ উপস্থাপন করে। এ কারণেই আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় বন্দাদের পরীক্ষা করে নিয়েছেন বারে বারে, ইতিহাসের পাতায় একথার বহু দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। যখনই আল্লাহ্র কোন বন্দার মন কোন দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় তখনই সে আকর্ষণ একটি পরীক্ষামূলক বিপদের কারণ হয়ে যায়। কেননা মানব অন্তর আল্লাহ্র প্রতি প্রেম-প্রীতি, ভক্তি-অনুরক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন ঐ অন্তরে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর অনুপ্রবেশ ঘটে তখন আল্লাহ্ পাক সে বস্তুকে দূরে সরিয়ে দেন। ফলে তখন আল্লাহ্র জিকরই মানুষের একমাত্র কাজ থাকে। আর তাতেই লাভ করে মানুষ শান্তি ও সান্ত্বনা। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে ঃ হযরত আদম (আঃ)-এর অন্তর যখন জান্নাতের প্রতি আকৃষ্ট হলো তখন জান্নাত থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে দেয়া হলো এবং জান্নাত লাভের জন্যে কঠোর পরিশ্রমের নির্দেশ দেয়া হলো। ফলে তাঁর অন্তরে আল্লাহ্ র জিকর ব্যতীত আর কিছুই রইল না।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৬-৬৭

(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৪

এমনিভাবে যখন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর অন্তর আকৃষ্ট হলো তাঁর প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর প্রতি তখন পিতার প্রতি নির্দেশ হলো স্বহস্তে পুত্রকে জবেহ করার জন্যে। আর হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অন্তর যখন তাঁর পুত্র ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ আকর্ষণ সৃষ্টি হলো তখন পিতার নিকট থেকে পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করা হলো। পিতা-পুত্রের এ বিরহ-কাল অব্যাহত ছিল সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত। আর এটি ছিল তাঁর জন্যে বিরাট পরীক্ষা। আর তখন হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর অন্তরে আল্লাহ্ পাকের জিকর ব্যতীত আর কিছুই না।

আর এভাবেই সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আশা করলেন যে, মক্কাবাসী স্ব-গোত্রীয় লোকেরা ইসলামের প্রতিষ্ঠায় তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল আত্মীয়-স্বজনই তাঁর প্রাণের শত্রু হয়ে গেল। সুদীর্ঘ তেরোটি বছর তাঁকে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত অবস্থায় মক্কা মোয়াজ্জমায় অতিবাহিত করতে হলো। শুধু তাই নয়, বরং অবশেষে তিনি তাঁর সঙ্গীগণ সহ প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য হলেন এবং এ মন্তব্য করলেন ঃ

مَا اُوْذِىَ نَبِىٌّ مِثْلَ مَا اُوْذِيْتُ

অর্থাৎ কোন নবীকে এতো কষ্ট দেয়া হয়নি যত কষ্ট আমাকে দেয়া হয়েছে।[১] এজন্যেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

"আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো"– এ পরীক্ষা মোমেন মাত্রেরই জীবনে আসে। আর এতে উত্তীর্ণ হবার পন্থা হলো সবর ও নামায। আর এ উত্তীর্ণ হওয়ার পুরস্কার হলো আল্লাহ্ পাকের অগণিত রহমত, হেদায়েত এবং মাগফেরাত-সবার উপরে তাঁর সন্তুষ্টি ও রেযামন্দি।

আ'মালুল কোরআন

১. কোন জিনিস হারিয়ে গেলে– اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ আয়াতখানি পাঠ করে অনুসন্ধান করলে নিশ্চয় সে জিনিসই পাওয়া যাবে অথবা তার চেয়ে উত্তম বস্তু প্রদত্ত হবে।

২. কোন জিনিস হারিয়ে গেলে অথবা অপহরণ করা হলে ২৯ বার উপরোক্ত আয়াত এবং ৭ বার সূরায়ে "ওয়াদ দোহা" পাঠ করতে হয় এবং পূর্বে ও পরে ১১ বার করে দরূদ শরীফ অবশ্যই পাঠ করতে হয়। এ আমল করলেও হারানো বস্তু পাওয়া যায়।

১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৪

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ۙ فَإِنَّ
اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ ﴿١٥٨﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَآ أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ
وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتٰبِ ۙ أُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ
اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ﴿١٥٩﴾ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰٓئِكَ
أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٠﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا
وَهُمْ كُفَّارٌ أُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ
أَجْمَعِيْنَ ﴿١٦١﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ
يُنْظَرُوْنَ ﴿١٦٢﴾

তরজমা

(১৫৮) নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়াহ আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহের অন্যতম। অতএব যে কা'বা শরীফের হজ্জ অথবা ওমরাহ করে তার জন্যে উভয় স্থানের "তওয়াফ" করায় কোন দোষ নেই, এবং যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন পূণ্য কাজ সুসম্পন্ন করে, আল্লাহ পাক নিশ্চয় তার মর্যাদা প্রদান করবেন। তিনি সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

(১৫৯) নিশ্চয় আমি মানব জাতির জন্যে আমার কিতাবের মধ্যে যে সব সুস্পষ্ট নিদর্শন ও উপদেশ নাযিল করেছি যারা তা গোপন করে আল্লাহ পাক তাদের প্রতি লা'নত করে থাকেন এবং লা'নতকারীগণও তাদেরকে লা'নত দিয়ে থাকে।

(১৬০) কিন্তু যারা তওবা করে নিজেকে সংশোধন করে এবং সত্য কথা প্রকাশ করে আমি তাদেরকে ক্ষমা করি, আমি যে অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয়, অতীব দয়াময়।

(১৬১) নিশ্চয় যারা অবিশ্বাস করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাদের উপর আল্লাহ পাকের ও তাঁর ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানব মণ্ডলীর অভিসম্পাত।

(১৬২) তারা তাতে চিরদিন থাকবে, তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবে না।

তফসীরুল কোরআন

সাফা এবং মারওয়া কা'বা শরীফের অদূরে অবস্থিত পাহাড়ের দুটি টিলার নাম। প্রাক-ইসলামী যুগে পোত্তলিকরা দু' টিলার উপর দুটি মূর্তি স্থাপন করে এবং সেগুলোর পূজা করতে থাকে। এজন্যে ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানগণ পৌত্তলিকদের মূর্তি পূজার কারণে সাফা মারওয়ার তওয়াফ নিষিদ্ধ কাজ মনে করতে থাকেন, তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন ঃ সাফা মারওয়ার তওয়াফে কোন দোষ নেই, কেননা এগুলো আল্লাহ্ পাকেরই নিদর্শন।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

আল্লাহ্ পাক ইতোপূর্বে ঘোষণা করেছেন, কেবলা পরিবর্তন করা হয়েছে এজন্যে যে প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর উম্মতের প্রতি তাঁর নেয়ামতকে যেন পরিপূর্ণ করেন। আর এ পরিপূর্ণতা আসবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)- এর শরীয়তকে পুনর্জীবিত করার মাধ্যমে যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِاُتِمَّ نِعْمَتِىْ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ "তোমাদের প্রতি যেন আমার নেয়ামতকে সম্পূর্ণ করি"। আর সাফা মারওয়ার মধ্যকার দৌড় হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিদর্শন সমূহের অন্যতম। কেননা তাঁর স্ত্রী হাজেরা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভের আশায় সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে 'সাঈ' করেছিলেন। তাই আল্লাহ পাক এ আয়াতে সাফা মারওয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَىْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ

(অর্থাৎ আমি তোমাদের পরীক্ষা করবো ক্ষুধা এবং ভয় দ্বারা।) এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ

(অর্থাৎ সবর অবলম্বনকারীদের জন্যে রয়েছে খোশখবরী।)

অতঃপর اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ বলে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের এ ঐতিহাসিক স্থানে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী পুত্র যে কষ্ট পেয়েছিলেন তার স্মৃতিচারণ করে পূর্ববর্তী আয়াতের ঘোষণার বাস্তব প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে যে, এ পৃথিবীতে যে বা

যারা বালা-মুছিবতে সবর অবলম্বন করবে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে উচ্চতর মরতবা দান করবেন।[১] কেননা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন। অর্থাৎ যারা সবর অবলম্বন করে তারা আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয়। আর আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে ধন্য হওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

"নিশ্চয় সাফা এবং মারওয়া আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের অন্তর্ভুক্ত"।

সাফা এবং মারওয়া পাহাড়কে নিদর্শন বা চিহ্ন বলা হয়েছে এজন্যে যে, এগুলো আল্লাহ্ পাকের প্রতি অনুগত হওয়ার এক একটি জ্বলন্ত নির্দশন। সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে দৌড়ানো প্রত্যেক হাজীর জন্যে ওয়াজিব। তবে ইমাম আহমদ (রঃ) এ কাজ কে সুন্নত বলেছেন। প্রমাণ স্বরূপ তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন ঃ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِاعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

"যে ব্যক্তি কা'বা ঘরের হজ্জ অথবা ওমরাহ করবে তার জন্যে এ দুটি স্থানের তওয়াফ করাতে কোন গুনাহ্ নাই"।

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, তওয়াফকারীদের জন্যে কোন গুনাহ বা ক্ষতি নাই। সুতরাং এর দ্বারা জানা গেল যে এ কাজটি মোবাহ্। এতদ্ব্যতীত পরবর্তী আয়াতে ومن تطوع (যে ব্যক্তি নফল কাজ করবে) একথাটি রয়েছে। সুতরাং মোবাহ্ এবং নফল উভয়ই ওয়াজিব হওয়ার জন্যে প্রশস্ত অর্থাৎ একটি বিষয় মোবাহ্ হলে বিষয়টি ওয়াজিব হওয়াতে কোন বাধা থাকে না। 'হজ্জ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো 'ইচ্ছা করা' এবং 'ওমরাহ্' শব্দের অর্থ হলো 'যিয়ারত করা'। কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে এখানে দুটি বিশেষ এবাদতকে বোঝানো হয়েছে। আর স্বাভাবিক নিয়ম থেকে বিচ্যুত হওয়াকে 'গুনাহ্' বলা হয়ে থাকে।

শানে নযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল এই ঃ সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে 'আসাফ' এবং 'নায়েলা' নামক দুটি মূর্তি ছিল। 'আসাফ' ছিল সাফা পাহাড়ের উপর এবং 'নায়েলা'

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫৬-৫৭

ছিল মারওয়া পাহাড়ে। জাহেলিয়াতের যুগে লোকেরা এ মূর্তি দুটির সম্মানে সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে তওয়াফ করতো এবং মূর্তি দুটিকে স্পর্শ করতো।

যখন ইসলামের আগমন ঘটলো তখন মুসলমানগণ এ মূর্তি দুটির কারণে সাফা এবং মারওয়ায় দৌড়ানো থেকে বিরত থাকত এবং অন্তরে ঘৃণা পোষণ করতো। অন্যদিকে মদীনবাসী ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 'মানাত' নামক মূর্তির পূজা করতো এবং তাকে ডেকে ডেকে দোয়া করতো। এ কারণে আনসারগণও ইসলাম গ্রহণের পর সাফা এবং মারওয়া পাহাড়ে মূর্তির কারণে দৌড়াতে ঘৃণা-বোধ করতেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাক উভয় স্তরের লোকদের সম্পর্কে এ আয়াত নাজিল করেন।[১] নিম্নোক্ত হাদীস থেকে এ ঘটনা সহজে অনুধাবন করা যায়।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস হাকেম (রঃ) সংকলন করেন, সাফা এবং মারওয়ার মাঝখানে মূর্তি ছিল এবং শয়তান সারারাত সেখানে তওয়াফ করতো। যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো তখন মুসলমানগণ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করবো না কারণ এ কাজ আমরা জাহেলিয়াতের যুগে করতাম। তখন এ আয়াত নাজিল হলোঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

হযরত আসেম (রঃ) থেকে ইমাম বোখারী বর্ণনা করেছেন একখানি হাদীস। হযরত আসেম (রঃ) বলেন, আমি হযরত আনাস (রাঃ)-এর কাছে সাফা-মারওয়ার সাঈ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আমরা ইতোপূর্বে এ সাঈকে জাহেলী বিষয় মনে করতাম। এজন্যে ইসলামের কারণে তা পরিত্যাগ করলাম। তখন এ আয়াত নাজিল হলো ঃ

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

মূলত ঃ এ আয়াত মদীনাবাসীর মুসলমান হওয়ার পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে নাজিল হয়েছিল। ঘটনা ছিল এই, আনসারগণ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সাফা ও মারওয়ার মাঝ খানে সংরক্ষিত 'মানাত' মূর্তির পূজা করতো। যখন তাঁরা মুসলমান হলেন তখন এ দু' পাহাড়ের মাঝখানে (মূর্তি থাকার কারণে) ঘৃণা বোধ করলেন। এজন্যে তাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন, 'ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে (মূর্তির সম্মানার্থে) সাঈ করতাম এজন্যে এখন সেখানে সাঈ করতে দ্বিধাবোধ হয়'।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৬৮
তফসীরে রুহুল মাআনী– খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫
খোলাসাতুত্যাফাসীর খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০১
তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮

তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাজিল করলেন ঃ اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ

হাবীবা বিনতে আবি তাজ্‌রাত থেকে ছাফিয়া বিন্‌তে শায়বা (রাঃ) যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকেও একথাই বোঝা যায় যে, সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে দৌড়ানো ওয়াজিব। সেই হাদীসটি এরূপ ঃ হাবীবা (রাঃ) বলেন, "আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি সাফা ও মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করেছেন। লোকেরা তাঁর সম্মুখে এবং তিনি সকলের পেছনে রয়েছেন। তিনি এত জোরে সাঈ করছিলেন যে তাঁর পবিত্র তহ্‌বন্দ দোল খাচ্ছিল এবং তিনি বলছিলেন, "হে লোক সকল! তোমরা শ্রবণ কর, আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর 'সাঈ' (দৌড়) নির্ধারণ করেছেন"। এই হাদীস ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এবং ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।

হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে এরশাদ করেছেন, এরপর থেকে তোমরা কা'বা গৃহ এবং সাফা ও মারওয়ার তওয়াফ করো। এই হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয় যে, সাফা মারওয়ার মধ্যে 'সাঈ' করা ওয়াজিব। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নির্দেশ সূচক শব্দ দ্বারা কথাটি এরশাদ করেছেন। আর নির্দেশ সূচক শব্দ দ্বারা ওয়াজিব বোঝায়। তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ এ ব্যাপারে একমত যে, সাফা ও মারওয়ার সাতটি দৌড়। আর এ বিষয়েও সবাই একমত যে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত যাওয়ায় এক দৌড় সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং পুনরায় সাফায় ফিরে আসা দ্বিতীয় দৌড় হয়ে থাকে।[১]

مِنْ شَعَآئِرِاللّٰهِ

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সাফা মারওয়ার মধ্যেকার সাঈ আল্লাহ্ পাকের হজ্জ সম্পর্কীয় আদেশ সমূহের অন্যতম।

আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান

এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন ঃ شَعَآئِرِاللّٰه অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন। অতএব যে জিনিসের মধ্যেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন বিদ্যমান থাকবে তাকেই شَعَآئِرِاللّٰه বলা হবে। আর এ অর্থেই কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَآئِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৮-৬৯

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নিদর্শন সমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে নিশ্চয় তা তার অন্তরের পরহেযগারীর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করবে"।[১]

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

তৌহীদের পথ অবলম্বকারী এক বিশেষ পরিবারের সাথে সাফা ও মারওয়ার সম্পর্ক রয়ে গেছে। অর্থাৎ হযরত হাজেরা (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে এ দুটি পাহাড়ের সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু জাহেলী যুগে মুশরেকরা এ দুটি পাহাড়কেও দখল করে নিয়েছিল এবং প্রত্যেক পাহাড়ে একটি করে মূর্তি স্থাপন করেছিল। মুশরেকরা যখন সেখানে গমন করতো তখন এ মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করতো এবং চুম্বন করতো। ইসলামের প্রথম যুগে মুসলমানদের তৌহীদে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং শেরকের প্রতি ঘৃণা অতুলনীয় ছিল। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁদের অন্তরে এ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলো যে, এ পাহাড়ের উপর দৌড়ানো শেরকের অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত না হয়ে পড়ে। আলোচ্য আয়াতে তাঁদের এ দ্বন্দ্ব নিরসন করা হয়েছে এবং সুস্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এ পাহাড় দুটি তৌহীদের স্মৃতি বহন করছে। জাহেলী যুগের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এজন্যে পাহাড় দু'টির মাঝখানে 'সাঈ' সম্পন্ন করাকে যদি তৌহীদের পরিচয়বাহী হজ্জের অঙ্গ হিসাবে নির্ধারণ করা হয় তবে আপত্তির কিছুই থাকতে পারেনা।[২]

আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি সর্বপ্রথম একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভ্রাতৃষ্পুত্র হযরত ওরওয়াহ (রাঃ) বলেন, এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, তওয়াফ না করাতে কোন দোষ নেই।

হযরত আয়েশা তার জবাবে (রাঃ) বললেন, মনে হয় তুমি এ আয়াতের অর্থ সঠিক ভাবে বুঝতে পারনি। তুমি যা বুঝেছ তা যদি সঠিক হতো তবে আয়াত এভাবে হতো ان لا يطوفوا بهما। সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যখানে আসা যাওয়া (সাঈ) না করার মধ্যে কোন গুনাহ নেই।

আয়াতের শানে নুযুল হলো, ইসলাম পূর্বকালে মদীনাবাসী মোসাল্লাম নামক স্থানের 'মানাত' নামক মূর্তির পূজা করতো। তারা ঐ মূর্তির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে লাব্বাইক বলতো, তারা সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের মধ্য-স্থলে সাঈ করা পাপ মনে করতো, তাই ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর তাঁরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে সাঈ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন

(১) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ২২
(২) তাফসীরে কবীর খণ্ড ৪,পৃষ্ঠা ১৫৭-১৫৮

তাঁদের প্রশ্নের জবাবে এ আয়াত নাজিল হলো এবং ঘোষণা করা হলো, সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে সাঈ করায় কোন দোষ নেই। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাফা মারওয়া পর্বতের সাঈ করেন। কাজেই তা সুন্নতে পরিণত হলো, এজন্যে পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করা কারো পক্ষে বৈধ হবে না।[১] হযরত আবু বকর বিন আবদুর রহমান (রাঃ) এই হাদীস শ্রবণের পর বললেন, এটি অত্যন্ত মূল্যবান তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য যা ইতোপূর্বে আমি কখনও শ্রবণ করিনি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে বলেছেন যে, আনসারগণ বলতেন যে আমরা বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফের নির্দেশ পেয়েছি সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের তওয়াফের নির্দেশ পাইনি। তাঁদের একথার জবাবে এ আয়াত নাযিল হলো। তত্ত্বজ্ঞানীগণ উভয় বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে বলেছেন ঃ দুটি ঘটনাই এ আয়াতের শানে নুযুল হতে পারে।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ সাফা মারওয়া পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করা ইসলাম পূর্বকালের গর্হিত কাজ মনে করা হতো এবং ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করা হয়। তখন এ আয়াত নাজিল হলো।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) আরো বলেন ঃ এ পর্বত দুটির মধ্যভাগে বহু মূর্তি ছিল। শয়তান সারারাত এর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করতো। তাই ইসলামের আবির্ভাবের পর এ স্থানের তওয়াফ সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হলে তার জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

বর্ণিত আছে, সাফা পর্বতের উপর আসাফ আর মারওয়া পর্বতের উপর নায়েলা নামক দুটি মূর্তি স্থাপিত ছিল। মুশরেকরা তাদেরকে স্পর্শ করতো ও চুম্বন করতো। ইসলাম গ্রহণের পর লোকেরা ঐসব কাজ পরিত্যাগ করলো। কিন্তু এ আয়াত নাজিল হওয়ার পর সাফা মারওয়ার মধ্যে সাঈ হজ্জের বিধানে পরিণত হলো।

আসাফ ও নায়েলা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মোহাম্মদ এবনে এসহাক তাঁর ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আসাফ একজন পুরুষ ও নায়েলা একজন মহিলার নাম। তারা দু'জনে একবার বায়তুল্লাহ শরীফে ব্যভিচার করায় আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়। পরিণামে তারা পাথরে পরিণত হয়। কোরায়েশরা তাদেরকে কা'বা শরীফের বাইরে মানুষের উপদেশ গ্রহণের জন্যে রেখে দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে মূর্খ ও বিভ্রান্ত লোকেরা তাদেরকে পূণ্যাত্মা মনে করে তাদের পূজা আরম্ভ করে ও আসাফকে সাফা ও নায়েলাকে মারওয়া পর্বতে স্থাপন করে রাখে এবং তাদের তওয়াফ করার প্রচলন শুরু হয়। মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ সমাপ্ত করে সাফা পর্বতের পথ দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সময় এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন এবং এরশাদ করলেনঃ "আল্লাহ পাক যে কথা দ্বারা আরম্ভ করেছেন আমিও সে কথা দ্বারাই আরম্ভ করছি"।

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬০

অন্য একখানি হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমরা সেভাবে আরম্ভ কর যেভাবে আল্লাহ পাক আরম্ভ করেছেন অর্থাৎ সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত গমনা-গমন কর।

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

আর যারা স্বেচ্ছায় কোন নেক কাজ করবে আল্লাহ পাক তাদের সেই নেক কাজের মর্যাদা অবশ্যই দান করবেন। আর তিনি সকলের সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। মানুষের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সংরক্ষিত কথাও তিনি জানেন। অতএব যারাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের নিয়তে সৎ কাজ করবে আল্লাহ্ পাক তাদের বিনিময় দান করবেন।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত মাআয এবনে জাবাল (রাঃ) ও খারেছা এবনে যায়েদ (রাঃ) ইহুদী ধর্মযাজকদের নিকট তওরাতে বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। কেননা তওরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের বিবরণ রয়েছে। কিন্তু ইহুদী ধর্মযাজকরা সে সত্য বিবরণ সমূহকে গোপন করে। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে একথাও বর্ণিত আছে, অনেক আনসারী সাহাবী ইহুদীদের নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলীর বিবরণ তওরাতে রয়েছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা তা গোপন করে, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। আর একথাও বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত ইহুদী নাসারা তথা সকল আহ্‌লে কেতাব সম্পর্কেই নাজিল হয়েছে।[২]

জ্ঞানের কথা গোপন করা

আল্লামা আলুসী (রঃ) উপরোল্লিখিত বর্ণনা সমূহের উদ্ধৃতির পর ইমাম কাতাদার একটি উক্তির উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদী ও নাসারাদের সে সব লোক সম্পর্কে যারা সত্যকে গোপন করেছে। আল্লামা আলুসী (রঃ) আরও বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে সব লোক সম্পর্কে যারা দ্বীন ইসলামের কোন জরুরী কথা গোপন করে। কেননা হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস বোখারী শরীফে সংকলিত হয়েছে। তিনি আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করে বলেছেন ঃ

(১) বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৪
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭২

لَوْلَآ اٰيَةٌ فِىْ كِتَابِ اللهِ تَعَالٰى مَا حَدَّثْتُ بِشَىْءٍ اَبَدًا

অর্থাৎ "যদি পবিত্র কোরআনে এ আয়াত না থাকতো তবে আমি কোনদিন একখানি হাদীসও বর্ণনা করতাম না"।[১]

তফসীরকারগণ এ আয়াতের দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন, দ্বীন ইসলামের অত্যাবশ্যকীয় বিধান সমূহের প্রচার করা ওয়াজিব বা একান্ত কর্তব্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণাও রয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوْٓا اِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ

"তাদের প্রত্যেক দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয়না, যারা দ্বীন ইসলামের জ্ঞান অর্জন করবে এবং তাদের সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করে তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করবে– হয়তো তারা ভীত হবে"।

অতএব, দ্বীনি এলমের কথা গোপন করা অবৈধ বা হারাম। অবশ্য এখানে উল্লেখ্য, দ্বীনি এলমের সে কথাই প্রচার করা কর্তব্য যার প্রয়োজন রয়েছে। কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

لَا تَمْنَعُوا الْحِكْمَةَ اَهْلَهَا فَتَظْلِمُوْهُمْ وَلَا تَضَعُوْهَا فِىْ غَيْرِ اَهْلِهَا فَتَظْلِمُوْهُمْ

অর্থাৎ কোন সূক্ষ্ম তত্ত্বের বিষয় সমাজের এমন লোকদের নিকট গোপন করো না যারা তার যোগ্য। যদি তোমরা তা কর তবে তা হবে মানুষের প্রতি জুলুম। আর যারা অযোগ্য তাদের নিকট হেকমত বা সূক্ষ্ম বিষয় প্রকাশ করোনা কেননা তা-ও হবে তাদের প্রতি জুলুম।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, শ্রোতাদের অবস্থার মূল্যায়ন করে কথা বলা আলেম সমাজের একান্ত কর্তব্য। অর্থাৎ যে কথা জরুরী এবং যা মানুষের বোধগম্য হবে তা অবশ্যই বলতে হবে। পক্ষান্তরে যে তত্ত্ব বা তথ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না তা তাদের নিকট প্রকাশ করা কোন অবস্থাতেই সমীচীন হবে না। এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর একটি মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, যদি তোমরা সাধারণ মানুষের নিকট এমন হাদীস সমূহ বর্ণনা কর যার মর্মবাণী তারা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে না তবে সে সব লোকদেরকে ফেতনা-ফাসাদে নিপতিত করবে। অতএব এ আয়াত দ্বারা কয়েকটি কথা প্রমাণিত হলো (১) দ্বীন ইসলামের জরুরী কথা যা মানুষকে জানানো কর্তব্য

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬

তা গোপন করা অত্যন্ত বড় অপরাধ। (২) যারা সত্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও সত্যকে গোপন করে তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র লা'নত হয় এবং তাদের প্রতি লা'নত করে সমগ্র সৃষ্টি জগত। কেননা তাদের এ অন্যায় আচরণ ও কু-কীর্তির কারণে নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ভূমিকম্প, মহামারী প্রভৃতি। এর পরিণামে সমগ্র সৃষ্টিজগত চরম কষ্টের সম্মুখীন হয়, এজন্যে সমগ্র সৃষ্টিজগত তাদের প্রতি লা'নত দেয়, যাদের কু-কীর্তির পরিণামে শাস্তি নিপতিত হয়। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ

অর্থাৎ "লা'নতকারীরা তাদেরকে লা'নত দেয়"।

اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا

তওবাকারীর জন্যে খোশখবরী

পবিত্র কোরআনের একটি নিয়ম হলো যখনই শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয় তখন তারই পাশাপাশি পুরস্কার লাভের পথও প্রদর্শন করা হয়। যেমন পূর্ববর্তী আয়াতে দ্বীন ইসলামের কথা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা যারা গোপন করে তাদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে খোশখবরী রয়েছে তাদের জন্যে যারা অন্যায় থেকে তওবা করে, আত্ম-সংশোধন করে এবং যা কিছু গোপন করেছে তা প্রকাশ করে দেয়, আল্লাহ্ পাক তাদের তওবা কবুল করেন। হাদীস শরীফে আছে–"বন্দা কোন গুনাহ থেকে তওবা করার পরও যদি পুনরায় সেই গুনাহ করে এবং পরে আবার তওবা করে আল্লাহ পাক প্রত্যেকবার তওবা কবুল করেন। বন্দা তওবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যায় কিন্তু আল্লাহ পাক ক্ষমা করে ক্লান্ত হন না"। অবশ্য এখানে কথা আছে– মানুষের প্রতি দুটি হক্ব রয়েছে। (১) হক্কুল্লাহ (২) হক্কুল এবাদ। আল্লাহ পাকের সাথে শেরক না করলে অন্যান্য গুনাহ্ হয়তো তিনি মাফ করতেও পারেন কিন্তু হক্কুল এবাদ বা বন্দার হক্ব তিনি মাফ করবেন না বলে ঘোষণা করেছেন। বন্দার হক্ব, হক্বদারকে অবশ্যই আদায় করতে হবে। অথবা তার নিকট থেকে ক্ষমা লাভ করতে হবে। আর আল্লাহ্‌র হক্বের ব্যাপারে তাঁর মহান দরবারে সর্বদা ক্ষমা প্রার্থী থাকতে হবে। কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত হতে হবে এবং অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। এমন লোকদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَاُولٰٓئِكَ اَتُوْبُ عَلَيْهِمْ

"তারাই সে সব লোক যাদের তওবা আমি কবুল করি"। তথা তাদেরকে ক্ষমা করি।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন বন্দা যখন পাপকার্যে লিপ্ত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়, ব্যথিত মন নিয়ে দরবারে এলাহীতে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তখন আল্লাহ পাক এমন খুশী হন যেমন কোন মা তার হারানো সন্তানকে পেয়ে খুশী হয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ

"আর আমি তওবা অত্যধিক কবুল করে থাকি, আমি অতিশয় দয়ালু"।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– বন্দা যখন নিজের গুনাহ্র কথা স্বীকার করতঃ তওবা করে থাকে তখন আল্লাহ্ পাক তার তওবা কবুল করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ বন্দা তওবা করার দরুণ আল্লাহ্ পাক সে ব্যক্তির চেয়েও অধিক খুশী হয়ে থাকেন যে ব্যক্তির এমন যানবাহন কোন নির্জন অরণ্যে হারিয়ে যায়, যার উপর তার খাদ্য এবং পানি ছিল। অতঃপর সেই হারানো বাহন ফিরে পাওয়া সম্পর্কে নিরাশ হয়ে একটি বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্যথিত, মর্মাহত, চিন্তিত এবং ব্যাকুল হয়ে পড়ে ঠিক এমন সময় হঠাৎ বাহনটি প্রত্যাবর্তন করে তার নিকট দণ্ডায়মান হয়। সে তখন তার লাগাম ধরে ফেলে এবং খুশীর আধিক্যে বলতে থাকে হে আল্লাহ! তুমি আমার বন্দা আর আমি তোমার প্রভু (নাউজুবিল্লাহ্) (অর্থাৎ খুশীর আধিক্যে জ্ঞান শূণ্য হয়ে আবোল-তাবোল বলতে থাকে)। এ আনন্দিত ব্যক্তির চেয়েও অধিকতর আনন্দিত হন আল্লাহ্ পাক যখন বন্দা তাঁর নিকট তওবা করে।[১]

শরীয়তের বিধান গোপনকারীর জন্যে সতর্কবাণী

আর এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেন ঃ যারা আল্লাহ্ পাকের বাণী এবং শরীয়তের বিধান সমূহ গোপন করে তাদের জন্যে রয়েছে বিরাট সতর্কবাণী। আহলে কিতাবরা তাদের কিতাবে বর্ণিত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য সমূহ গোপন করে রেখেছিল। আর এ প্রসঙ্গে এরশাদ হয়েছে, যারা সত্য গোপন করে তারা অভিশপ্ত। পক্ষান্তরে, যারা এভাবে মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র বাণী প্রচার করে তাদের জন্যে বিশ্বের যা-কিছু আছে সবাই এস্তেগফার করতে থাকে– এমনকি পানির মাছ এবং শূণ্যের পাখীও। এভাবে সত্য জানা সত্বেও যারা মূক এবং বধির থেকে যায় তাদেরকে বিশ্বের সবকিছু অভিশাপ দিতে থাকে। বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন– যে ব্যক্তিকে শরীয়তের কোন নির্দেশ জানার উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করা হয়

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১- পৃষ্ঠা ২৭৩

তখন সে তার সঠিক জবাব না দিয়ে গোপন করে তাকে কেয়ামতের দিন আগুনের লাগাম পরানো হবে।

হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে এক জানাযায় শরীক ছিলাম। তিনি তখন এরশাদ করলেন– কবরের মধ্যে কাফেরদের কপালে এত জোরে হাতুড়ি মারা হয় যে প্রত্যেক প্রাণীই তার আওয়াজ শুনতে পায়। শুধুমাত্র জ্বীন এবং মানুষ শুনতে পায় না। অতঃপর তারা সবাই তার উপর লা'নত প্রেরণ করে। একেই বলা হয়েছে যে তাদের উপর আল্লাহ্ পাক এবং সব লা'নতকারীদের অভিশাপ। হযরত আতা (রঃ) বলেন, لَاعِنُوْنَ (লা'নতকারী সকল) বলতে প্রাণী এবং প্রত্যেক জ্বীন এবং মানুষকে বোঝানো হয়েছে। হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন– যখন জগতে অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন চতুঃষ্পদ জন্তুরা বলতে থাকে এটা আদম সন্তানের গুনাহ্গারদের গুনাহ্র কারণে হয়েছে। অতএব, আল্লাহ্ পাক এ গুনাহ্গারদের উপর লা'নত করুন। কোন কোন তফসীরকার বলেন, এর দ্বারা ফেরেশতা এবং মোমেন ব্যক্তিগণকে বোঝানো হয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, আলেম ব্যক্তির জন্যে সকল বস্তু এস্তেগফার করতে থাকে, এমনকি নদীর মাছও। এ আয়াতে আছে যে এলম যারা গোপন করে তাদেরকে আল্লাহ পাক লা'নত করে থাকেন। ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানব জাতিও লা'নত করে থাকে। আর যারা লা'নত করবার তারাও। অর্থাৎ যাদের ভাষা নাই– যে ভাষা দ্বারা বলুক অথবা সংকেতের মাধ্যমে হোক লা'নত করে থাকে। কেয়ামতের দিনও সব কিছুই তাদের উপর লা'নত করবে।

প্রিয়নবী (সঃ)-এর বৈশিষ্ট্য

এরপর যারা এ কু-কীর্তি থেকে বিরত হয়েছে, নিজেদের স্বভাবকে সংশোধন করে নিয়েছে এবং যা কিছু গোপন করেছিল তা প্রকাশ করে দিয়েছে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক এখানে স্বতন্ত্র করে দেখিয়েছেন এবং তাদের তওবা কবুল করার কথা ঘোষণা করেছেন। কেননা তিনি তওবা গ্রহণকারী, তিনি ক্ষমা-প্রিয়, অতীব দয়াময়।

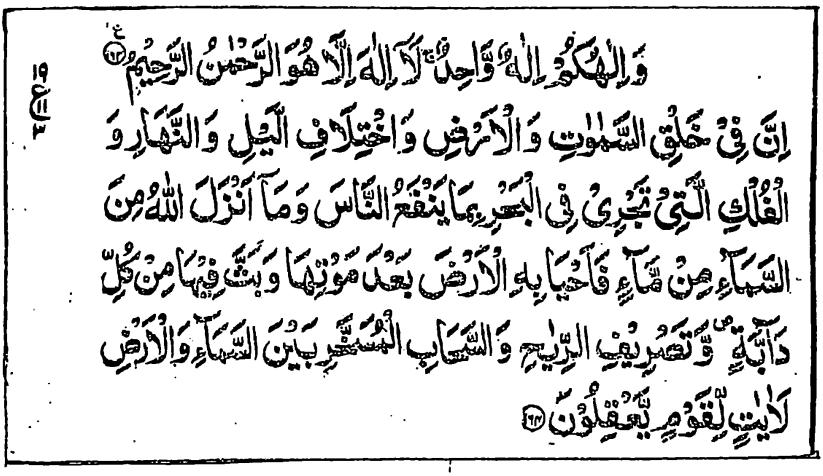
এতে একথা প্রমাণিত হয়, যারা কুফর ও বেদআতের দিকে মানুষকে আহবান করে তারাও যদি আন্তরিকভাবে তওবা করে এবং অন্যায় থেকে বিরত হয়, পূর্বে কৃত অন্যায়ের জন্যে অনুতপ্ত হয়, প্রকৃত ও খাঁটি মুসলমান হয়, আল্লাহ পাক তাদের তওবা কবুল করেন। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে যে, পূর্ববতী উম্মত সমূহের মধ্যে এমন জ ঘন্য অপরাধের ব্যাপারে তওবা কবুল হতো না। কিন্তু রহমতুল্লিল আলামীন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এটি বৈশিষ্ট্য যে আল্লাহ পাক তাঁর উম্মতের সকল গুনাহ মাফ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এটি শুধু দয়ার নবী নূরের ছবি আল্লাহ্র পেয়ারা হাবীব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতেই সম্ভব হয়েছে। পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا- اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন ঃ (আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন) হে আমার বন্দাগণ! তোমরা যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সকল গুনাহ্ মাফ করবেন·(যদি তোমরা আন্তরিকভাবে তওবা কর, আত্মসংশোধন করে আত্মোন্নতি লাভে সচেষ্ট হও)। নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমা-প্রিয়, অতীব দয়াবান।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হলো, যারা সত্যকে গোপন করলো অথবা অন্যদের দ্বারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট হলো আর তওবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারল না এবং কাফের অবস্থায়ই এ ক্ষণস্থায়ী পৃথিবী থেকে চির বিদায় গ্রহণ করলো তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়। কেননা তারা চিরকাল অভিশপ্ত এবং কোপগ্রস্থ থাকবে, দোযখই তাদের ঠিকানা। চিরদিন তাতেই থাকতে হবে তাদেরকে এবং তাদের শাস্তি এতটুকু লাঘব করা হবে না।


وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿١٦٣﴾ ع ١٩
اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَ
الْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ
السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ
دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿١٦٤﴾

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬

তরজমা

(১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকই, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নাই, তিনি পরম দয়াময়, অনন্ত অসীম করুণাময়।

(১৬৪) নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃজণে এবং দিবা-রাত্রির পরিবর্তনে এবং মানব জাতির উপকারার্থে সমুদ্র-বক্ষে জাহাজ সমূহের চলনে এবং আসমান থেকে আল্লাহ পাক যে বারি বর্ষণ করেছেন তাতে, যদ্বারা ধরণীকে মৃত্যুর পর জীবিত করেন এবং জীব-জন্তুকে যে পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাতে এবং বায়ুর যাতায়াত করাতে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের অনুগত হয়ে মেঘমালার গমনাগমনে সত্যিই বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে বহু জ্বলন্ত নিদর্শন রয়েছে।

وَاِلٰهُكُمْ

তফসীরুল কোরআন

শানে নুজুল

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন ঃ পৌত্তলিকরা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে বললো ঃ "হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আপনার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন"। তখন তাদের এ প্রশ্নের জবাবে সূরা এখলাছ এবং আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে আল্লামা আলূসী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, মক্কার কোরায়েশ বংশের লোকেরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন বললো صِفْ لَنَا رَبَّكَ অর্থাৎ আপনার প্রতিপালকের গুণাবলী বর্ণনা করুন। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[২]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর একত্ববাদের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় এভাবে ঘোষণা করেছেন যে, হে মানব জাতি! তোমাদের মা'বুদ বা উপাস্য এক, তাঁর কোন শরীক নেই, তিনিই তোমাদের স্রষ্টা, পালনকর্তা, তিনিই তোমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তিনিই তোমাদের রিয্কদাতা, তিনিই তোমাদের জীবন এবং জীবনের সর্বস্বের সত্ত্বাধিকারী, তিনি এক, অদ্বিতীয়, শুধু তাঁর সমীপে তোমরা মাথা নত করবে, শুধু তাঁরই এবাদত করবে, শুধু তাঁর নিকটই তোমাদের আশা আর তাঁর প্রতিই রাখবে ভরসা। তিনি অত্যন্ত দয়াময়, পরম করুণাময়, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত তুমি অহরহ ভোগ কর অতএব তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর, তাঁর অগণিত নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৪

(২) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯

এসমে আজম

হযরত আসমা বিনতে ইয়াজীদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে,

وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَلرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

এ দু' আয়াতের মধ্যেই রয়েছে 'এস্‌মে আজম'। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে আবু দাউদ শরীফ, তিরমিজী শরীফ এবং এবনে মাজা শরীফে।[১]

আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এ ঘোষণা দ্বারা পথভ্রষ্ট ইহুদী ও নাসারাদের ভুল ধারণা নিরসন হলো এবং তাদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হলো। কেননা তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে সত্য যেমন গোপন করতো ঠিক তেমনি আল্লাহর একত্ববাদের ব্যাপারেও সত্যকে অস্বীকার করতো। যেমন নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে মনে করে (নাউজুবিল্লাহ)। আর পৌত্তলিকরা অগণিত দেবতার পূজা করে। এমনিভাবে কোন কোন নির্বোধ ইহুদী হযরত ওজায়ের (আঃ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে দাবী করে (নাউজুবিল্লাহ)। এ সমস্ত দাবী যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অসত্য তারই ঘোষণা রয়েছে এ আয়াতে।

এ দাবীর সমর্থনে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন পরবর্তী আয়াতে আটটি দলিল উপস্থাপন করেছেন। এ দলিল সমূহ এত অকাট্য এবং যুক্তিপূর্ণ যে এর বিরোধিতা করা কোন বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক আসমান যমীনের সৃষ্টির কথা, রাত ও দিনের পরিবর্তনের কথা, মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী নিয়ে সমুদ্র বক্ষে জাহাজ সমূহের চলাচলের কথা সহ অন্যান্য সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

এরশাদ হয়েছে ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ– الاية

শানে নুজুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোরায়েশরা একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলতে লাগলো, "আপনি আল্লাহ্‌ পাকের নিকট দোয়া করুন যেন তিনি সাফা ও মারওয়া পাহাড়কে স্বর্ণে পরিণত করে দেন। তাহলে আমরা তা দ্বারা অশ্ব ও সমরাস্ত্র ইত্যাদি ক্রয় করবো এবং আপনার সহযোগিতা করবো আর ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করব"। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি সঠিক ওয়াদা করছো"? তারা জবাব দিল, "হ্যাঁ, এটি আমাদের সুদৃঢ় ওয়াদা"। তিনি তখন আল্লাহ্‌ পাকের মহান দরবারে দোয়া করলেন। জিব্রাঈল (আঃ) উপস্থিত হয়ে বললেন, তাদের দোয়া কবুল

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৫

করা যাবে কিন্তু যদি তারা এরপরও ঈমান না আনে তবে তাদের উপর এমন আযাব আসবে যেমন কঠিন আযাব ইতোপূর্বে কখনও কারো প্রতি নিপতিত হয়নি। একথা শ্রবণ করে হযরত রসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেঁপে উঠলেন এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে আরজ করলেন, "না"। হে আল্লাহ! তাদেরকে এভাবেই থাকতে দাও। আমি তাদেরকে তোমার দিকে আহ্বান করতে থাকবো। আজ না হয় কাল, কেউ তোমার পথে এসে যাবে"। এ ঘটনার পর এ আয়াত নাজিল হয়।[১] অর্থাৎ যদি তারা আল্লাহ্ পাকের কুদরতের নিদর্শন দেখতে চায় তবে এসব নিদর্শন কোন অংশেই কম নয়। এতদ্ব্যতীত এ আয়াতের আরও একটি শানে নুজুল বর্ণিত হয়েছে। যখন পূর্ববর্তী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ নাজিল হলো তখন পৌত্তলিকরা বলতে লাগলো এক আল্লাহ্ এ বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর ব্যবস্থা কিভাবে করবেন? তখন এ আয়াত নাজিল হয় এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম বিস্ময়কর কুদরত হেকমতের কথা ঘোষণা করা হয়।

আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের কথা শ্রবণ করে পৌত্তলিকরা তার বাস্তব প্রমাণ দেখতে চাইলে এ আয়াত নাজিল হয় এবং আল্লাহ্ পাকের কুদরতের মহিমা বর্ণিত হয়।[২]

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান ও যমীন সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে অর্থাৎ কখনও রাত্রি বড় হয় আবার কখনও দিন বড় হয়; নৌযানের গমানাগমনে যা মানুষের জন্যে উপকারী বস্তু, ব্যবসায়ের দ্রব্য-সম্ভার, গৃহের আসবাবপত্র এবং স্বয়ং মানুষকে নিয়ে পানির উপরে এমনিভাবে ভেসে চলে নিমজ্জিত হয় না, আবার দাড়িয়েও থাকে না যাতে পার না হতে পারে, আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণে- যে বৃষ্টি দ্বারা মৃত বা শুস্ক জমীন জীবিত এবং শষ্য-শ্যামল হয়ে পড়ে, নানা প্রকার ফল-ফুল, বীজ এবং বৃক্ষ উদ্ভিদ জন্ম নেয়। এমনিভাবে বিভিন্ন জীব-জন্তুর ব্যাপারে- সারা পৃথিবীতে যেগুলো ছড়িয়ে রয়েছে এবং যদ্বারা সর্বপ্রকার উপকারী পাওয়া যায় এর মধ্যে এমন ভয়ংকর হিংস্র জন্তুও রয়েছে যদি আল্লাহ্ পাক এদেরকে বিরত না রাখতেন তবে দুনিয়ার একজন মানুষকেও জীবিত ছাড়তো না, বায়ু প্রবাহের পরিবর্তনে অর্থাৎ কখনও পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে আবার কখনও পশ্চিম দিক থেকে। এ বায়ুর আবার বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং বিভিন্ন উপকারীতাও রয়েছে মেঘমালার ব্যাপারে- এ মেঘ আসমান এবং যমীনের মাঝ-খানে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে, উপরেও গমন করে না আবার আল্লাহ পাকের হুকুম ব্যতীত নীচেও পতিত হয় না– এসব বিষয় বিবেকবানদের জন্যে একটি নিদর্শন। যদি বিবেকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণ দ্বারা কেউ দেখে তবে বুঝতে পারে যে এ সকল অলৌকিক

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৭৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৮
(২) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭

কার্যপদ্ধতি সৃষ্টি করা একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কেননা যমীন ও আসমানের এ বিস্ময়কর কারখানা আপনা-আপনিই যে হতে পারে না একথা সহজেই অনুমেয়। এমন অবস্থায় একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, এমন কোন সত্তা যিনি এক, অদ্বিতীয়, যাঁর কোন শরীক নেই, যিনি সর্ব শক্তিমান, যিনি সবকিছু সম্পর্কে অবগত, যিনি যাবতীয় দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র– তিনিই এক আল্লাহ্, আর তিনিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আর যা কিছু তাতে রয়েছে সবকিছুরই একমাত্র স্রষ্টা ও পালনকর্তা। বিশ্ব সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, তাঁর কুদরত হেকমতের অপূর্ব নমুনা দেখলে এক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না।[১]

পবিত্র কোরআনের অন্যান্য বহু আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানব জাতিকে তাঁর একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন, আসমান যমীনের সৃষ্টির মধ্যে এবং মানুষের নিজের দেহের মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতের যে অসংখ্য বিস্ময়কর জ্বলন্ত নিদর্শন রয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছেন। যেমন সূরা লোকমানে এরশাদ হয়েছে-

اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهٗ ظَاهِرَةً وَّبَاطِنَةً

"তোমরা কি লক্ষ্য কর না যে আসমান যমীনে যা কিছু রয়েছে সবই আল্লাহ্ পাক তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন"।

এমনিভাবে আল্লাহ পাক মানব জাতিকে তাদের নিজেদের মধ্যে তাঁর অস্তিত্বের যে-সব নিদর্শন রয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করার তাগিদ করে এরশাদ করেছেন। যেমন সূরা 'জারিয়াতে' এরশাদ হয়েছে ঃ

وَفِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

"এবং তোমাদের নিজেদের মধ্যেও আল্লাহ্র অস্তিত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে, তা কেন তোমরা দেখছো না"?

পবিত্র কোরআনের সূরা 'মূলকে' আল্লাহ পাক আরও সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

قُلْ هُوَ الَّذِىْٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ط قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ

(১) খোলাসাতুতত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৪-০৫

"(হে রসূল) আপনি ঘোষণা করুন, নিখিল সৃষ্টির যিনি স্রষ্টা তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তোমাদেরকে শ্রবণের জন্যে কর্ণ এবং দর্শনের জন্যে চক্ষু এবং উপলব্ধি করার জন্যে অন্তর দান করেছেন। তোমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ"।

এমনিভাবে কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক মানব-অন্তরকে তার নিজের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ কিন্তু এমন যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে যে, তার জবাব দেয়ার বদলে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করা ব্যতীত কোন বিকল্প পন্থা থাকে না। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা 'বালাদে' এমনি একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ

অর্থাৎ ঃ "আমি কি মানুষের চক্ষুদ্বয়, ওষ্ঠদ্বয় এবং জিহ্বা সৃষ্টি করিনি? আমি কি তাকে ভাল ও মন্দ এবং ডান ও বাম উভয় পথের পরিচয় দান করিনি"?

এ প্রশ্নের সঠিক জবাব মানুষকে অবশ্যই দিতে হবে। আর সে জবাব দেয়ার পূর্বে এ সমস্ত দানের জন্যে মহান দাতার নিকট তাকে অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হবে। এমনিভাবে পবিত্র কোরআনে মানব অন্তরকে এক আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে নাবা-তে এরশাদ হয়েছে ঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا

অর্থাৎ "আমি কি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছিয়ে রাখিনি? আমি কি পাহাড়-পর্বতগুলোকে গড়ে তুলে আমার অসীম ক্ষমতার পরিচয় দেইনি? আমি কি তোমাদেরকে পুরুষ ও নারী দু'ভাগে বিভক্ত করিনি"?

এ সমস্ত প্রশ্নের জবাব মানুষকে এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমেই দিতে হবে। অতএব, আসমান যমীনের সৃজণে, সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃংখলা সংরক্ষণে, দিন ও রাতের পরিবর্তনে, সকাল-সন্ধ্যার আগমনে, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদীর সৃজণে তথা এসব কিছুতেই রয়েছে এক আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি নৈপূণ্যের অগণিত নিদর্শন।

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ- الاية

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকের কার্য-পরিচালনার কৌশল, প্রতিপালনের ব্যবস্থা, সীমাহীন ক্ষমতা এবং তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্য ইত্যাদি নিঃসন্দেহে তাঁর এক, অদ্বিতীয় হওয়ার পরিচয় বহন করে। আসমান ও যমীনের সকল কীর্তি এক অলৌকিক সৃষ্টি। দুনিয়ার যে কোন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে এসব কিছু এক অপার বিস্ময় ব্যতীত আর কিছুই নয়। আর এসব

বিস্ময়কর নিদর্শন এ প্রমাণ বহন করছে যে, এগুলো নিজে নিজে সৃষ্টি হতে পারেনি এবং এগুলো নিজের ক্ষমতায় টিকেও থাকতে পারে না। নিশ্চয় বিশাল জ্ঞানের অধিকারী অদৃশ্য কোন কুদরতী হাতই এ সকল সৃষ্টির পশ্চাতে রয়ে গেছে। এসব কিছুর গতি প্রকৃতি এবং স্থায়িত্ব, এদের শৃংখলা এবং নিয়মানুবর্তিতা ইত্যাদি প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তিকে এসবের একজন সৃষ্টিকর্তা মেনে নিতে বাধ্য করে।

خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে" – অর্থাৎ আসমান হোক অথবা যমীন সব কিছুই মখলুক বা সৃষ্ট। নিজে নিজে কেউ সৃষ্টি হয়নি। মুশরেক সম্প্রদায় এগুলোকে মা'বুদ মেনে নিয়েছে। কোরআনে পাক এগুলোকে সৃষ্ট বস্তু বলে একথাই বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এ সকল বিশাল বস্তুও এক একটি ক্ষুদ্র কণার ন্যায়ই মখলুক। অতএব এগুলোর জন্যে আকাশ-দেবতা, ধরিত্রী মাতা- ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার নিতান্তই অযৌক্তিক, অনর্থক, অবৈধ।

الَّيْلِ وَالنَّهَارِ

"রাত এবং দিন"– দুনিয়াতে এমন সব মুশরেক সম্প্রদায়ও ছিল যারা দিন ও রাতকে প্রাণ বিশিষ্ট, ইচ্ছা-শক্তি সম্পন্ন এবং নিজের ক্ষমতায় পরিবর্তিত হতে পারে ভেবে এদেরকে মা'বুদের মর্যাদা দিয়ে এদের পূজা করেছে। এখানে আল্লাহ পাক এদেরকে পরিবর্তনশীল উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এরা সম্পূর্ণ অক্ষম। আল্লাহ পাকই এদেরকে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করে থাকেন যা মানুষের জন্যে উপকারী হয়।

بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন ঃ জনৈক প্রশ্নকারী এ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে, পবিত্র কোরআনে সবকিছুর উল্লেখ আছে বলে ঘোষণা করা হয়। তাহলে তাতে লবণ-মরিচের কথা কোথায় আছে? তার জবাবে বলা হয়েছে, আলোচ্য বাক্যটিতে যা কিছু মানুষের জন্যে প্রয়োজনীয় এবং উপকারী সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সুতরাং এ প্রশ্ন অবান্তর।[১]

وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ

এ বাক্য দ্বারা একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, বারি বর্ষণের মধ্যে রয়েছে জীবনী শক্তি, জীবনের স্পন্দন যা বৃষ্টিপাতের পর ভূ-মণ্ডলের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে স্পন্দিত হয়। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১

অর্থাৎ বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে মৃত শুষ্ক যমীনকে নব জীবন দান করা হয়। যেমন সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ

"আর তাদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন-এ মৃত অনুর্বর ভূমি, আমি তাকে জীবন্ত ও উর্বর করেছি এবং আমি তা থেকে শস্য উৎপন্ন করেছি ফলে তা থকেই মানব জাতি আহার গ্রহণ করে থাকে"।

বস্তুতঃ যমীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা লক্ষ্য করি, এর বালুকারাশির মধ্যে আল্লাহ্ পাক অতি বিস্ময়কর জীবনী শক্তি রেখে দিয়েছেন আর যমীনের বুকে আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরত ও হেকমতের অপূর্ব নিদর্শন স্বরূপ যে বৃক্ষ-তরুলতা রেখে দিয়েছেন তার সৌন্দর্যের বদৌলতেই এ বিশ্ব সবুজ এবং সুন্দর হয়ে গড়ে উঠেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের দৈহিক শক্তির মূল উৎস হলো তার খাদ্য। আর যমীনে আল্লাহ্ পাক যে জীবনী শক্তি আমানত রেখেছেন তার প্রথম কাজই হলো মানুষের খাদ্য উৎপাদন। ফল-মূল সহ যাবতীয় ফসলাদি নিয়মিতভাবে মানুষ যমীন থেকে আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত স্বরূপ লাভ করে থাকে। যদ্বারা মানুষ তার প্রয়োজনের আয়োজন করে। এ সমস্ত কিছুর মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের বিশেষ নিদর্শন। এতে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে রয়েছে এক মহান শিক্ষা।

আমরা প্রতিনিয়ত যে দৃশ্য লক্ষ্য করি তা হচ্ছে ঃ যখনই যমীনে কোন বীজ বপন করা হয় তখনই যমীন তা গ্রহণ করে ফেলে। কেননা যমীনের মালিক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন তাকে এ আদেশ দিয়েছেন। যদি কেউ এ দাবী করে যে, আমি ওয়ারিশ সূত্রে অথবা ক্রয় সূত্রে এ যমীনের মালিক হয়েছি এবং ফসল উৎপন্ন করার লক্ষ্যে বিরামহীন সংগ্রাম করেছি, অতএব আমার ইচ্ছানুযায়ী ফসল উৎপাদিত হতে পারে। এ দাবী কোনদিন পূর্ণ হবে না, এ চিন্তা কোন অবস্থাতেই সার্থক হবে না কেননা, যমীন শুধু তার মালিক এক আল্লাহ্ পাকেরই অনুগত। তাই দেখা যায় যদি কেউ যমীনে বীজ বপনের পর নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তা ফেরত চায় তবে তা আদৌ সম্ভব হয় না কেননা, এজন্যে আল্লাহ্ পাক যে নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তার বরখেলাফ করা যমীনের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কেননা যমীনে বীজ বপন করলেই ফসল উৎপাদিত হয় না; বরং বীজ বপনের পর আল্লাহ্ পাকের হুকুমে সূর্যের আলোকরশ্মি তাতে তাপ পৌছায় এবং আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি বাতাস এবং মৌসুমের উষ্ণতা তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্যতা বিধান করে। এমনিভাবে এক আল্লাহ্ পাকের ইঙ্গিতে পানি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে তাতে জীবনী শক্তি এনে দেয়। শুধু তাই নয়, বরং প্রত্যেক মৌসুমের জন্যে একটি বিশেষ অবস্থা এবং একটা বিশেষ সময় নির্ধারন করে দেয়া হয়েছে। আর এজন্যেই সময় ভেদ, স্থান ভেদ ও স্তর ভেদের কারণে উৎপাদিত ফসলের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

এতদ্ব্যতীত বীজ গলে মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া এবং অত্যন্ত মসৃণ ও অতি নাজুক চারা রূপে মাটির বুক চিরে আত্মপ্রকাশ করা, পরে নিয়ম মোতাবেক বড় হওয়া এবং ডাল-পালা মেলা, শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হওয়া এবং ফুলের উৎপাদনে বুদ্ধিমান মানুষের জন্যে বিরাট চিন্তার খোরাক রয়েছে।

প্রশ্ন হলো কে এতসব কাজ করেন? এর একই জবাব- এক আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বগুণাকর, যিনি এক, অদ্বিতীয়, যিনি সর্বত্র বিরাজমান। অতএব, আসমান জমীনের সৃষ্টিতে, দিবা-নিশির পরিবর্তনে, সৌরজগতে, গ্রহ-উপগ্রহের অপূর্ব সৃষ্টিতে, মেঘমালার পরিভ্রমণে, খাদ্য-দ্রব্য উৎপাদনে এক আল্লাহ্ পাকের কুদরত ও হেকমতের অগণিত বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ রয়েছে।

যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের দলিল প্রমাণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল আল্লাহ্ পাক তাদের জন্যে এবং অনাগত ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের জন্যে এসব বিষয়ে চিন্তা করার ও আল্লাহ্ পাকের প্রতি বিশ্বাসী ও অনুগত হয়ে তাঁর নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাগিদ করেছেন আলোচ্য আয়াতে। অবশ্য এসব বিষয়ে চিন্তা করা এবং শিক্ষা গ্রহণ করা তাদের পক্ষেই সম্ভব হয় যারা প্রকৃত অর্থেই বুদ্ধিমান, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

لِقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ
يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّ
اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾ اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ
يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ
النَّارِ ﴿١٦٧﴾

তরজমা

(১৬৫) এবং মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যকে তাঁর অংশীদার মনে করে। যেভাবে আল্লাহ পাককে ভালবাসা দরকার ঠিক সেভাবেই তাদেরকে ভালবাসে। আর যারা ঈমানদার আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ভালবাসা দৃঢ়তর (এবং) তদপেক্ষা অধিকতর। আর অত্যাচারীরা যদি আল্লাহ্ পাকের শাস্তির সময়টিকে দেখতো তখনই বুঝতো যে সমস্ত শক্তি একমাত্র আল্লাহ্ পাকের এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কঠোর শাস্তি দাতা।

(১৬৬) (স্মরণ কর সে সময়কে) যখন কাফেরদের দলপতিরা তাদের অনুগামীদের প্রতি বিমুখ হবে, আযাব দেখতে পাবে এবং তাদের সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

(১৬৭) তখন অনুসারীরা বলবে যদি আমরা আবার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করতে পারতাম তাহলে আমরা তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হতাম যেভাবে তারা আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছে। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের কার্যকলাপ সমূহ দুঃখজনক অবস্থায় তাদেরকে দেখাবেন যাতে তারা অনুতাপ করে। কিন্তু তারা কখনও দোযখ থেকে রেহাই পাবে না।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তৌহীদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে ৮টি দলিল উপস্থাপন করা হয়েছে। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ এতদসত্বেও পৌত্তলিকরা এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে না। অথচ তিনিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তিনিই রিয্ক দাতা। যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে মানবতার অবমাননা করে তারা তাদের স্বহস্তে বানানো উপাস্যদেরকে আল্লাহ পাকের সমান ভালবাসে। শুধু যে আচার-আচরণেই তারা এমন করে তাই নয়, বরং আন্তরিক প্রেম-ভালবাসায়ও শেরক করে থাকে। এদের এ সর্বনাশা নীতির পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ, অতীব দুর্বিষহ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতে মুশরেকদের দুনিয়া এবং আখেরাতের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এরা আল্লাহ পাকের সাথে অংশীদার গ্রহণের মাধ্যমে জঘন্য অপরাধ করে থাকে এবং অন্যকে আল্লাহ পাকের ন্যায় সম্মান করে থাকে। আর এসব উপাস্যদের প্রতি এত ভালবাসা পোষণ করে থাকে যেরূপ ভালবাসা আল্লাহর প্রতি স্থাপন করা উচিত। অথচ এক আল্লাহ্ পাকই সত্যিকার মা'বুদ বা উপাস্য, তাঁর কোন শরীক নাই এবং তিনি অতুলনীয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বর্ণনা করেনঃ "আমি আরজ করলাম, 'ইয়া

রসূলাল্লাহ! সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহ্ কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ 'আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করা অথচ তিনিই একমাত্র স্রষ্টা'। অতঃপর এরশাদ করেন ঃ ঈমানদারগণ আল্লাহ্ পাকের প্রেমে অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং মুগ্ধ থাকে। তাদের অন্তর আল্লাহ্ পাকের মাহাত্ম্য এবং তৌহীদ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরের প্রতি মহব্বত স্থাপন করেনা, কারো নিকট কোন কিছুর জন্যে প্রার্থী হয় না, কারো কাছে নত হয় না এবং সেইপবিত্র সত্তার সাথে কোন কিছুকে শরীক স্থাপন করে না।

এ আয়াতে পৌত্তলিকদের ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে যদি এরা আল্লাহ্ পাকের কঠিন ও কঠোর শাস্তি প্রত্যক্ষ করতো তবে তাদের অন্তরে অবশ্যই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হতো যে শুধু এবং শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকই সর্বময় ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। দ্যুলোক ভূ-লোকে যতকিছু আছে সবই তাঁর সৃষ্টি, সবই তাঁর অনুগত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন, আর একথাও তারা উপলব্ধি করতো যে আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠিন, অতীব ভয়াবহ।[১]

ফাওয়ায়েদে ওসমানীতে আল্লামা হযরত শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যদিও মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে বিবেক-বুদ্ধির দিক থেকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী এতদসত্বেও মানব সমাজে এমন নির্বোধ লোকের অভাব নেই যারা আল্লাহ পাকের তৌহীদ বা একত্ববাদের এ সমস্ত সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ এবং উজ্জল নিদর্শন সমূহ দেখা সত্ত্বেও হীন বস্তুকে আল্লাহর শরীক মনে করে। আল্লাহ পাক সর্ব-শক্তিমান, সর্ব-গুণাকর, সর্ব-জ্ঞানী এবং করুণাময়, মহিমময়, তাঁর অবাধ্য হয়ে তারা জড় পদার্থকে তাঁর সমতুল্য মনে করার ন্যায় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। আর তাদের এ নির্বুদ্ধিতা এত চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে শুধু আচা- আচরণেই নয়; বরং প্রেম-প্রীতিতেও তারা আল্লাহর সাথে শেরক করে। অর্থাৎ যেভাবে মোমেনগণ আল্লাহকে ভালবাসে তেমনি পৌত্তলিকরা তাদের স্ব-হস্তে নির্মিত মূর্তিগুলোকে ভালবাসে।[২]

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করে। আয়াতে أَنْدَادًا শব্দ দ্বারা মূর্তিকে বোঝানো হয়েছে। ইমাম তাবারী (রঃ) একই মত পোষণ করে বলেছেন لِأَوْثَانِهِمْ অর্থাৎ তাদের মূর্তিদের জন্যে।[৩]

পৌত্তলিকদের সেসব দলপতি যাদের প্রভাবে সাধারণ কাফেররা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হতো অথবা এর অর্থ সে সব বস্তু, যা আল্লাহ পাকের পথে মানুষের জন্যে বাধা স্বরূপ উপস্থিত হয়।

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৯
(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৩১
(৩) তফসীরে তাবারী ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪০

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের সাথে যেমন মহব্বত রাখা হয় এ কাফেররা তাদের নকল উপাস্যদের সাথে তেমনি মহব্বত রাখে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, পৌত্তলিকরা তাদের স্ব-নির্মিত মূর্তিগুলোর এমন তা'যীম করে যেমন আল্লাহ্ পাকের তা'যীম করা হয়। অথবা এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, পৌত্তলিকরা তাদের তথাকথিত উপাস্যদের এমনিভাবে ভালবাসে যেমন মোমেনগণ আল্লাহ্ পাককে ভালবাসে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ যারা প্রকৃত মোমেন, আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের মহব্বত দৃঢ়তর এবং অধিকতর। কেননা প্রেমময় আল্লাহ্ পাকের জন্যে মোমেনদের অন্তরে যে মহব্বত রয়েছে তা চিরন্তন, সুখে-দুঃখে, আনন্দে বা শোকে সেই প্রেম-প্রীতি কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। পক্ষান্তরে কাফেরদের অন্তরে মূর্তিগুলোর যে ভালবাসা থাকে, তা নিতান্ত অস্থায়ী এবং উদ্দেশ্যমূলক, যখন উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় তখন প্রেম-প্রীতিও বিদায় হয়।

সাঈদ বিন জোবায়ের (রঃ) বলেন, যারা মূর্তির মহব্বতে আত্মহারা হয়েছে এবং মূর্তির ভালবাসায় জীবন বরবাদ করেছে তাদেরকে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের দিন হুকুম করবেন, এ মূর্তির সাথে যখন তোমাদের আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে তখন এদের সাথী হয়ে জাহান্নামে গমন কর। মূর্তি প্রেমিকরা তখন জাহান্নামে যেতে অস্বীকার করে বসবে এবং কিছুতেই জাহান্নামে যেতে রাজি হবে না। আল্লাহ্ পাক তখন কাফেরদের সম্মুখে আল্লাহর প্রেমিকদেরকে হুকুম করবেন যে তোমরা যদি আমাকে ভালবাস তবে জাহান্নামে গমন কর। এ হুকুম শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সকলেই জাহান্নামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এরপর কোন ঘোষক সেখানে ঘোষণা করবে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"আর যারা ঈমানদার আল্লাহ্র প্রতি তাদের মহব্বত সর্বাধিক"।

অর্থাৎ দুনিয়াতে যার সাথে যত মহব্বতই থাকুক ঈমানদারদের মহব্বত সর্বাধিক থাকে তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের সাথে। কারণ গায়রুল্লাহর সাথে যত মহব্বত দেখা যায় তার পশ্চাতে কোন না কোন স্বার্থ কাজ করে থাকে। হয় সেখানে কোন কিছু পাওয়ার উদ্দেশ্য থাকে, না হয় কোন কষ্ট দূর করে দেয়ার আশা থাকে অথবা সৌন্দর্য ভোগ করতে পারার কারণ বিরাজমান থাকে অথবা বংশগত কোন সম্পর্ক থেকে থাকে যেমন পিতা অথবা পুত্র ইত্যাদি। আর এভাবে দেখা যাচ্ছে গায়রুল্লাহর সাথে মহব্বত নিজের স্বার্থের জন্যে তথা নিজের জন্যে হয়ে থাকে- সে মহব্বতের পাত্রটির জন্যে নয়। অতঃপর বস্তুর মধ্যে যদি কোন স্বার্থ সিদ্ধির আশা না করা যায় তবে সে বস্তুর প্রতি মহব্বতও বিলীন হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি

মহব্বত এসব স্বার্থ থেকে পবিত্র। এজন্যে এ মহব্বত বিলীন হয় না; বরং এটি হয় চিরন্তন।

আরও জানা দরকার যে, কাফেরদের দৃষ্টি শুধু পার্থিব স্বার্থ এবং ভোগের বস্তুর প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বের খবর শুধু নামে মাত্র জেনে রাখে। সমস্ত উপকার এবং অপকার প্রদানের মালিক কোন মানুষ অথবা নক্ষত্র বা কোন কাল্পনিক বস্তুকে মনে করে থাকে। এজন্যে আল্লাহর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ না হয়ে এসব বস্তুর প্রতি এদের মন-মহব্বত লুটিয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যারা ঈমানদার তাদের মতে দুনিয়ায় অথবা পরকালে কোন কিছু পাওয়ার লোভের উপর ভিত্তি করে যে-মহব্বতের উদ্রেক হয়ে থাকে সেটা মহব্বত হিসেবে গণ্যই নয়। তারা আরও বলেন যে, প্রেমের অগ্নি যখন অন্তরে প্রজ্জলিত হয় তখন তা আল্লাহ্ ব্যতীত আর সবকিছুকে জ্বালিয়ে মাটি করে দেয়। এমনকি নিজের নফস্‌কেও সে শেষ করে ছাড়ে। কারণ তারা জানে যে নিজের নফসের চেয়েও আল্লাহ্ পাক অধিক নিকটে। এজন্যে নিকটের বস্তুকে রেখে দিয়ে তারা নিজের নফস্‌কে নিশ্চিহ্ন করে। নিজেকে করে আল্লাহর রাহে বিলীন। এভাবে অন্যান্য বস্তুকেও তারা আল্লাহর জন্যে চেয়ে থাকে। অতএব, এ ধরনের মহব্বতই প্রকৃত মহব্বত হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। অতঃপর যখন এ পবিত্র সম্প্রদায়ের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত এমন পর্যায়ের হয়ে দাঁড়ায় যে সবকিছুর মহব্বত শুধু এক আল্লাহ্‌র জন্যেই হয়ে থাকে তখন আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত কষ্টকেও তারা নেয়ামত মনে করে থাকে। এজন্যেই কেয়ামতের দিন যখন বলা হবে, "আমার প্রতি যদি তোমাদের মহব্বত থেকে থাকে তবে জাহান্নামে প্রবেশ কর"। তখন এ সকল ঈমানদার এ নির্দেশ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আর তখনই আরশের নীচ থেকে এ ঘোষণা উচ্চারিত হবে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

"যারা ঈমানদার আল্লাহর প্রতি তাদের মহব্বত সর্বাধিক"।[১]

মূলতঃ এ মর্তবা শুধু তারাই লাভ করবেন যারা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছেন। দুনিয়াতে যারা শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের আশায় সাধনায় রত হয়েছেন এবং জীবনকে আল্লাহ্ পাকের প্রেমে উৎসর্গ করেছেন, যারা বলেছেনঃ

زندہ کنی عطاء تو وربکشی فدائے تو

جان منشدہ مبتلائے توھرچہ کنی رضائے تو

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭৯–৮১

"হে আল্লাহ্! যদি তুমি জীবন দান কর তবে তা তোমারি দান, আর যদি জীবনের অবসান ঘটাও তবে তার জন্যে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আমার প্রাণ তোমার দান, তোমার জন্যে তা উৎসর্গকৃত, তোমার যা ইচ্ছা আদেশ কর"।

يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ

(মূর্তিগুলোকে তারা ভালবাসে আল্লাহর ভালবাসার ন্যায়।)

পবিত্র কোরআনের ঘোষণার সত্যতার প্রমাণ এভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, খৃষ্টানরা আল্লাহ্র চেয়ে অনেক বেশী মহব্বত এবং সম্পর্ক রাখে তাদের ভাষায় 'আল্লাহর পুত্র' অথবা 'পবিত্র আত্মা' এবং 'পবিত্রা কুমারী'র সাথে (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)। অনুরূপভাবে হিন্দুদেরও ঈশ্বর বা পরমাত্মার চেয়ে দূর্গা-মাতা, মা-লক্ষ্মী, অগ্নি-দেবতা ইত্যাদি দেব-দেবী, ঋষি, মুনী এবং সাধুদের সাথে অধিক সম্পর্ক ও ভালবাসা রয়েছে। كَحُبِّ اللهِ (আল্লাহ্র প্রতি মহব্বতের সমান)–এ বাক্যাংশটি দ্বারা একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের প্রতি স্বভাবজাত মহব্বত থাকা নিষেধ নয়। যেমন পিতা-মাতা, ভাই-বোন, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব ইত্যাদির জন্যে মানুষের অন্তরে মহব্বত সৃষ্টিগতভাবে স্থাপন করে দেয়া হয়েছে। শরীয়ত এবং তরীকতের ইমামদের প্রতি মহব্বত রাখা মোস্তাহাব। এমনকি কখনও ওয়াজিবের পর্যায়ে পৌছে থাকে। মহব্বত হারাম হয় তখন যখন বস্তুর মহব্বতকে আল্লাহর মহব্বতের সমান পর্যায়ে পৌছানো হয়। অতঃপর যারা "ইয়া আলী" "ইয়া হুসাইন","ইয়া খাজা", "ইয়া গাউছ", "ইয়া ওয়ারেছ" ইত্যাদি ধ্বনি দিয়ে থাকে, তারা যেন একবার নিজের অন্তরের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখে সেখানে আল্লাহ্র মহব্বত কতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে এবং কতটুকু অন্যের জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছে।[১]

এখানে আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চারটি কারণে মানুষের অন্তরে কারো জন্যে মহব্বত হয় (১) সৌন্দর্য, (২) এহসান বা উপকার, অর্থাৎ কারো দ্বারা উপকৃত হলে সাধারণতঃ মানুষ তাকে ভালবাসে। (৩) নৈকট্য, অর্থাৎ কারো নৈকট্য লাভ হলে তথা কাছাকাছি থাকার কারণেও মহব্বত হয়। (৪) গুণ অর্থাৎ কারো মধ্যে কোন বিশেষ গুণ থাকলে সে কারণেও মানুষ তাকে ভালবাসে।

একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মহান আল্লাহ্ পাকের মধ্যে এই সমস্ত কারণ সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণভাবে এক সঙ্গে পাওয়া যায়। কেননা তিনিই সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা, তিনিই সকল সুন্দরের আধার। দ্বিতীয়তঃ তাঁর মহান দান অগণিত। পবিত্র কোরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে–

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا

(১) তফসীরে মাজেদী (উর্দু) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬১

অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত গণনা করতে চাও তবে তা কোনদিন সম্ভব হবে না। মানব জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবইতো আল্লাহ্ পাকের এহ্সান, তাঁর মহান দান। তৃতীয়তঃ আল্লাহ্ পাকই বন্দার সর্বাধিক নিকটে। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে–

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

"আর আমি মানুষের গর্দানের শাহরগ থেকেও অধিক নিকটবর্তী"।

এতদ্ব্যতীত, তিনিই তো সৃষ্টি করেছেন মানুষের সকল গুণ, তিনিই তো হলেন সকল গুণের মূল উৎস অতএব, তাঁর জন্যে সর্বাধিক মহব্বত হওয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যারা মোমেন, যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসী শুধু তারাই আল্লাহ পাকের প্রেমে মুগ্ধ মত্ত মাতোয়ারা হয়ে থাকেন এবং তাদের অন্তরেই আল্লাহর মহব্বত থাকে সর্বাধিক। এজন্যেই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ যারা ঈমানের নেয়ামত লাভ করেছে তারাই আল্লাহর মহব্বত লাভে ধন্য হয়েছে। এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, কারো জন্যে আল্লাহর চেয়ে অধিকতর মহব্বত ঈমান বিরোধী কাজ। যেমন নাসারা সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আঃ) -এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের চেয়ে অধিক মহব্বত পোষণ করে। এমনিভাবে শিয়া সম্প্রদায় হযরত আলীর (রঃ) মহব্বতের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে।[১] এজন্যেই ইমাম রাজী (রঃ) اَنْدَادًا শব্দের একটি ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এ পর্যায়ে সুফী সাধকদের ব্যাখ্যা হলো ঃ

كل شيئ متقلب قلبك به سوى الله فقد جعله نداالله تعالى

"যে বস্তুই তোমার অন্তরকে আল্লাহ্ পাক থেকে ফিরিয়ে অন্য দিকে আকৃষ্ট করে তাকেই আল্লাহর শরীক বিবেচনা করা হবে"।[২]

এ পর্যায়ে হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-এর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল ما الشرك আল্লাহর সাথে শেরকের তাৎপর্য কি? তিনি বললেনঃ طلب الجنة واعراض عن ربها জান্নাত চাওয়া এবং জান্নাতের মালিক থেকে বিমুখ হওয়া। এটিই শেরক। এতদ্বারা একথা প্রমাণিত হয়, যে বিষয় বা বস্তু মানব অন্তরকে আল্লাহর জিকর থেকে গাফেল রাখে তাকেই সুফী সাধকগণ انداد এর অন্তর্ভুক্ত মনে করেন।

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২০৪

এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, যেহেতু আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন আমাদের মালিক, খালেক, স্রষ্টা ও পালনকর্তা, রিয্ক দাতা, আমাদের ভাগ্য নিয়ন্তা, আমাদের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্বের সত্তাধিকারী এবং যেহেতু আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত আমরা অহরহ ভোগ করি তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর অনুগত হওয়া আমাদের একান্ত কর্তব্য। এমনিভাবে আমাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠ থেকে উৎসারিত প্রেম-ভালবাসার একমাত্র অধিকারীও তিনিই।

কিন্ত এতদসত্ত্বেও ইসলাম মানুষের স্বভাবগত প্রেম-প্রীতি, মায়া-মমতার ব্যাপারে অত্যন্ত উদার নীতি ঘোষণা করেছে। আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন-এক কথায় সকল আপনজনের জন্যে মানুষের অন্তরে যে ভালবাসা থাকে তাকে ইসলাম বাধা দেয় না, বরং অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে। যেমন পবিত্র কোরআনে এক আল্লাহ্র বন্দেগী করার নির্দেশের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালনের তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর তোমার পরওয়ারদেগার এ নির্দেশ প্রদান করেছেনঃ তোমরা এক আল্লাহ্ ব্যতীত কারো বন্দেগী করোনা এবং পিতা-মাতার প্রতি এহ্সান কর"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ

অর্থাৎ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে।

এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, স্বভাবগত ভাবে মানুষের অন্তরে আপনজ নদের জন্যে যে মহব্বত সৃষ্টি হয় তা ইসলামের দৃষ্টিতে আদৌ অবৈধ নয়। তবে এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা এই, যে কোন মানুষের জন্যে মোমেনের অন্তরে মহব্বত থাকতে পারে কিন্তু সব চেয়ে বেশী মহব্বত থাকতে হবে এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে। অতএব মহব্বত বা প্রেম-প্রীতিও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ দ্বারা। যেমন কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَاَبْنَآؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন যদি তোমাদের পিতা-পিতামহ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি এবং তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ এবং তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ যা তোমরা সঞ্চয় করে রেখেছো এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যা বিনষ্ট হওয়ার তোমরা আশংকা কর এবং তোমাদের সেই বাড়ী-ঘর সমূহ যা তোমরা অত্যন্ত পছন্দ কর- এসব কিছু তোমাদের নিকট আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল এবং আল্লাহর রাহে জেহাদ থেকে প্রিয় হয় তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহ পাকের আদেশ (আযাব) আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ পাক ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।

এ আয়াতে নীতিগত ভাবে একথার স্বীকৃতি রয়েছে যে, উল্লেখিত বিষয় সমূহের জন্যে মানব অন্তরে প্রেম-প্রীতি থাকবে আর তাই স্বাভাবিক। কিন্ত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন এবং ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর–এক কথায় পার্থিব সকল সম্পর্ক এবং সম্পদের জন্যে যে মহব্বত হবে তা কোন অবস্থাতেই আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের মহব্বত থেকে অধিকতর হতে পারেনা। অধিকতর মহব্বত শুধুমাত্র আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যেই থাকবে। আমাদের ছল্‌ফে ছালেহীনদের জীবনে আল্লাহ পাকের এ নির্দেশের বাস্তবায়ন কিভাবে হয়েছে তার আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। একবার হযরত আলী (রাঃ) তাঁর প্রাণাধিক পুত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)-কে আদর করছিলেন। শিশু ইমাম হোসাইন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন,"আব্বাজান! আপনি কি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন"? হযরত আলী (রাঃ) জবাব দিলেন, "হ্যাঁ"। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "আব্বাজান"! বড় ভাই ইমাম হাসানকেও কি আপনি ভালবাসেন"? তিনি বললেন, "হ্যাঁ"। অতঃপর ইমাম হোসাইন (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, "যদি এ মুহূর্তে আল্লাহর রাহে জেহাদের ডাক দেয়া হয় তবে কি আপনি আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ইমাম হোসাইন (রাঃ) বললেন, "তাহলে আমাদের জন্যে আপনার মহব্বত থাকলেও সবচেয়ে বেশী মহব্বত আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের জন্যে"।

এমনিভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে হাদীস শরীফে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘরোয়া পরিবেশে আমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। কিন্ত যখন আযান হতো তখন এভাবে চলে যেতেন যেন আমাদেরকে চিনতেন না। হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ভাষায়ঃ

مَرَّكَانَ لَمْ يَعْرِفْنَا

আল্লাহর মহব্বত সর্বাধিক

এতেও একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর মহব্বত সর্বাধিক হওয়ার কারণেই আযানের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে ডাক শ্রবণ করা মাত্রই তিনি মসজিদে চলে যেতেন এবং সে ডাক এত প্রভাব বিস্তার করতো যে তিনি সে মুহূর্তে অতি

আপনজনকেও চিনতেন না। এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, মহব্বত সকলের জন্যেই থাকতে পারে কিন্তু সর্বাধিক মহব্বত থাকবে এক আল্লাহ্র জন্যে। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا

(বোখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ যে পর্যন্ত না তোমরা আল্লাহ্ ও রসূলকে সব কিছু থেকে বেশী ভালবাসতে পেরেছ, সে পর্যন্ত তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না।

হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত

আমাদের পূর্ব-পুরুষ পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রসূলের প্রতি যে একনিষ্ঠ প্রেম ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তাঁদের জীবনাদর্শে দেখা যায় যে, আল্লাহ্ পাকের জন্যেই ছিল তাঁদের সর্বাধিক মহব্বত। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে প্রিয় সাহাবী ছিলেন হযরত আবু বকর (রাঃ)। তাঁর পুত্র বদরের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষে লড়াই করতে এসেছিল (অবশ্য পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন)। একদিন পিতার সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "আব্বাজান"! বদরের যুদ্ধের দিন আপনি আমার সম্মুখে এসে পড়েছিলেন, আমি ইচ্ছা করলে আপনার প্রতি মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারতাম কিন্তু পিতার সম্মানের খাতিরেই আমি তখন এ কাজ করিনি।

একথা শ্রবণ করে হযরত আবু বকর (রাঃ) বললেনঃ তুমি তখন কাফের ছিলে, কাফেরদের সাথী ছিলে, যদি তোমাকে আমি পেতাম তবে আমি ছেড়ে দিতাম না কোন অবস্থাতেই।

সন্তান-সন্ততির মায়া কার না থাকে কিন্তু আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রেম ভালবাসা যে সবার উপরে, এজন্যে সবকিছু বিসর্জন দেয়া সম্ভব হয়।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর দৃষ্টান্ত

বদরের যুদ্ধে যে সব লোক বন্দী হয় তাদের সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পরামর্শ করলেন সাহাবায়ে কেরামের সাথে, তখন হযরত ওমর (রাঃ) এ প্রস্তাব দিলেন যে, এ বন্দীদের প্রায় সকলেই আমাদের আত্মীয়-স্বজন। এরা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, অতএব প্রত্যেকের কর্তব্য হওয়া উচিত তার নিকটাত্মীয়কে স্বহস্তে মৃত্যুদণ্ড দান করা।

আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মায়া মমতা মানুষ মাত্রেরই থাকে কিন্তু আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রেম ভালবাসার তুলনায় তা নিতান্ত তুচ্ছ, ক্ষুদ্র এবং গৌণ।

এ পর্যায়ে আরও দু' একটি দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত গাওসুল আযম (রঃ) একবার তাঁর সাপ্তাহিক মাহ্ফিলে বক্তৃতারত ছিলেন। এমন সময় খবর পেলেন তাঁর এক পুত্রের এন্তেকাল হয়েছে। তিনি সংবাদদাতাকে নির্দেশ দিলেন মৃত সন্তানকে গোসল দিয়ে কাফন পরিয়ে মজলিসে নিয়ে আসতে। অতঃপর তিনি উপস্থিত অপেক্ষমান মুসলমানদের সম্মুখে আল্লাহ্র মহব্বতের তত্ত্ব বর্ণনা করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর মৃত পুত্রের দেহ মজলিসে হাযির করা হলো। তিনি জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন। অতঃপর দাফনের জন্যে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি পুনরায় আল্লাহ্র দ্বীনের খেদমতে মশগুল হলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করা এবং শ্রবণ করা বা পাঠ করা অত্যন্ত সহজ কিন্তু আল্লাহ্র প্রেমের এমনি দৃষ্টান্ত পেশ করা আদৌ সহজ নয়।

সাহারানপুরের বিখ্যাত মোহাদ্দেস হযরত মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) ছিলেন আল্লাহ্র খাঁটি প্রেমিক। ঈদুল ফিতরের দিনে সকাল নয়টায় ঈদের নামাযের জামাআত হওয়ার কথা। ঠিক সেই সময় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু-মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে। একদিকে ঈদের নামাযের জামাআত যা হয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না, অন্যদিকে প্রাণাধিক পুত্র মুমূর্ষু অবস্থায়। প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে গেলে পুত্রকেও আর পাওয়া যাবে না। নামায পেতে হলে এক মুহূর্ত আর বিলম্ব করা যায় না। পুত্রকেও পেতে হলে এক মুহূর্তের জন্যে স্থান ত্যাগ করা যায় না। ঠিক সে মুহূর্তে হযরত মওলানা ইয়াকুব ছাহেব (রঃ) মৃত্যু-পথের যাত্রী পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন, "বাবা! নামাযের সময়, আমাকে বিদায় দাও। নামাযের পর প্রত্যাবর্তন করে হয়তো তোমাকে আর পাবো না। তোমার সঙ্গে এরপর দেখা হবে হাশরের ময়দানে"। এই বলে তিনি ঈদুল ফিতরের নামাযের জন্যে বের হয়ে গেলেন। পিতা মাত্রেরই অন্তরে সন্তানের জন্যে মায়া মমতা এবং ভালবাসা থাকে কিন্তু যারা প্রকৃত মোমেন, যারা আল্লাহ ওয়ালা তাদের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তারা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভে ধন্য, আল্লাহ্র প্রেমে মুগ্ধ। তাই তাঁদের অন্তরে আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রেম ভালবাসা সর্বাধিক। এজন্যে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ

অর্থাৎ যারা প্রকৃত মোমেন, যারা আল্লাহ্ পাকের সত্যিকার প্রেমিক তাদের অন্তরে আল্লাহ্র মহব্বত সুদৃঢ় এবং অধিকতর। যুগে যুগে আল্লাহ্ পাকের প্রেমিকগণ এ ঘোষণার সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ

অর্থাৎ এ ভাগ্যাহত পৌত্তলিকরা মূর্খতার অন্ধকারে নিপতিত হওয়ার কারণে আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করছে, আল্লাহ্র অবাধ্য ও না-ফরমান হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অনেক কিছুরই উপাসনা করছে। অথচ তারা কেয়ামতের দিনের ভয়ংকর অবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যে-কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে তা তাদের নিকট বর্তমানে কল্পনাতীত। যদি তারা দেখতো সেই ভয়াবহ দৃশ্য তবে আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর কারো নিকট তারা মাথানত করতো না। আর আল্লাহ্ পাক যে সর্বশক্তিমান, তিনি যে সকল ক্ষমতার মূল উৎস আর তাঁর শাস্তি যে অত্যন্ত কঠিন এ সত্য উপলব্ধি করতে তাদের এতটুকু বিলম্ব হতো না।

اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ

অর্থাৎ কেয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্তে আল্লাহ্ ব্যতীত আর যাদের উপাসনা করা হয়েছে তারা ভক্ত পূজারীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, সকল যোগাযোগ, যাবতীয় সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যাবে। মহা-সংকটের সময় কেউ কারো উপকারে আসবে না, সকলেই হবে সকলের পর। যাদের উপাসনা করা হয়েছে অথবা যাদের প্রভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা করা হয়েছে, আজ সবই বিমুখ, অসন্তুষ্ট, কারো কাছেই সাহায্যের কোন আশা নেই। এমনি অবস্থায় আক্ষেপ বা অনুতাপ ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই। পূজারীদের ঐ অসহায় অবস্থায় তারা কপালে করাঘাত করে বলবে- "আফসোস! এদের পূজা করে কত বড় জঘন্য ভুল করেছি! যদি সুযোগ পেতাম, যদি পৃথিবীতে পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা হতো তবে এদের থেকে উপযুক্ত প্রতিশোধ নিতাম, তাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন আজ তারা আমাদের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে"। এভাবে আল্লাহ পাক তাদের কৃতকর্মের ব্যর্থতা এবং তার ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে দেখাবেন, তাদের সকল আক্ষেপ-অনুতাপ সম্পূর্ণ বৃথা প্রমাণিত হবে কেননা, তারা আর কখনো দোযখ থেকে নাজাত পাবে না। তারা ভাগ্যাহত, চির শাস্তি তাদের অবধারিত।

আ'মালুল কোরআন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ..... شَدِيْدُ الْعَذَابِ

যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তখন স্ত্রী মিষ্ট বস্তুর উপর এ আয়াত পাঠ করে দম করবে এবং স্বামীকে তা আহার করাবে। ফলে ইনশাআল্লাহ অসন্তুষ্ট স্বামী স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্ট হবে। তবে অবৈধ সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন উপকার হবে না। লিখেছেন হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا۟ مِمَّا فِى ٱلْأَرْضِ حَلَٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا۟
خُطُوَٰتِ ٱلشَّيْطَٰنِ ۚ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم
بِٱلسُّوٓءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾ وَإِذَا قِيلَ
لَهُمُ ٱتَّبِعُوا۟ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ
أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ
كَفَرُوا۟ كَمَثَلِ ٱلَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً ۖ صُمٌّۢ
بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

তরজমা

(১৬৮) হে মানব জাতি! পৃথিবীর দ্রব্য-সামগ্রী থেকে হালাল বস্তু আহার কর এবং (কখনও) শয়তানের তাবেদারী করোনা। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(১৬৯) (শয়তান) তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেবে যে, তোমরা অশ্লীল ও কু-কর্মে লিপ্ত হও, আর আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে যা তোমরা জান না তা বলতে আদেশ করে।

(১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে, 'আল্লাহ্ পাক যে হুকুম নাজিল করেছেন তার অনুসরণ কর'। তারা বলে, '(কখনও না) আমরা অনুসরণ করি তার যার উপর আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি'। যদিও তাদের পূর্ব পুরুষরা কিছুই বুঝতে না পারে আর তারা সুপথগামীও ছিল না (তবুও)।

(১৭১) আর এ কাফেরদের দৃষ্টান্ত এরূপ যেন কেউ এমন কোন কিছুকে ডাকে যে শুধু চিৎকার ও আওয়াজ ভিন্ন আর কিছুই শ্রবণ করেনা। বধির, মূক, অন্ধ কাজেই তারা কিছুই অনুধাবন করতে পারে না।

শানে নুজুল

যখন ছকীফ, খুযাআ, আমর এবনে ছা'ছাআ এবং বনি মুদ্‌লাজ নামক গোত্র সমূহ নিজেদের উপর অনেক প্রকার খাদ্য-দ্রব্য হারাম করে নিল তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠ ২৮৪।

এ আয়াতের শানে নুজুল সম্পর্কে আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন ঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে সে সব পৌত্তলিকদের সম্পর্কে যারা দেব-দেবীর নামে গৃহ-পালিত পশু ছেড়ে দিতো এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতো এবং তাকে জবেহ করে খাওয়া হারাম মনে করতো। এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বর্ণনা পেশ করেছেন।[১] এবনে জরীরও এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে সালাম (রাঃ) এবং তাঁর সঙ্গীদের ব্যাপারে যখন তাঁরা উষ্ট্রের গোশ্তকে নিজেদের জন্যে হারাম বলে মনে করেছেন কেননা, ইহুদীদের ধর্মে উষ্ট্রের গোশ্ত হারাম।[২]

তদানীন্তন আরবের পৌত্তলিকরা তাদের দেব-দেবীর নামে গৃহপালিত পশু ছেড়ে দিয়ে বিশ্বাস করতো যে, একটা বিরাট পূণ্যের কাজ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বরং দেব-দেবীর নামে উৎসর্গকৃত সেই জন্তুকে তারা অত্যন্ত সম্মান এবং মর্যাদা দিত। ফলে তারা নিজেদের প্রতি নিজেরাই ঐ পশুকে হারাম করে নিত। এজন্যে আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনেরই। অন্য কোন ব্যক্তি, দল বা গোষ্ঠীর এই অধিকার নেই। যারা এ পর্যায়ে হালালকে হারাম মনে করে অথবা হারামকে হালাল মনে করে তারা আল্লাহ্ পাকের সাথে শেরক করে। পূর্ববর্তী আয়াতে মুশরেক বা পৌত্তলিকদের শোচনীয় পরিণামের উল্লেখের পর আরবের কাফের মুশরেকরা এ পর্যায়ে যে শেরক করতো তার আলোচনা করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ হে মানব জাতি! পৃথিবীতে যা কিছু উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে যা কিছু হালাল এবং উত্তম হয় তা তোমরা ভোগ কর। কিন্তু যা কিছু হারাম যেমন শুকর বা কোন মৃত প্রাণী অথবা যা কিছু আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে উৎসর্গকৃত হয়ে থাকে তা তোমরা গ্রহণ করোনা। আর তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা এবং একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে শয়তান তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু।

প্রাণী জগতের রিয্ক দাতা কে?

ইতোপূর্বে তৌহীদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, আর এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে সমগ্র সৃষ্টি জগতের রিয্কদাতা এক আল্লাহ রব্বুল আলামীন। এরশাদ হয়েছে– "তোমরা আমার অনুগ্রহের কথা কিন্তু ভুলে যেওনা যে, আমি তোমাদের আহারের জন্যে এমন উত্তম খাদ্য হালাল করেছি যা অত্যন্ত সুস্বাদু, তোমরা আগ্রহের সঙ্গে তা আহার কর, সে সব খাদ্য তোমাদের দৈহিক বা মানসিক কোন প্রকার ক্ষতি করেনা। আমি তোমাদেরকে শয়তানের পথ অনুসরণ না করার নির্দেশ দিচ্ছি। যেভাবে কোন কোন বিভ্রান্ত লোক শয়তানের পথ অনুসরণ করে বিভিন্ন হালাল খাদ্যকে নিজেদের জন্যে হারাম স্থির করেছে।

১। তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৮।
২। তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠ ২

মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, "আমি আমার বন্দাদের যেসব সম্পদ দান করেছি তা তাদের জন্যে হালালও ঘোষণা করেছি, আমি আমার বন্দাদেরকে একত্ববাদের অনুসারী রূপেই সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে এবং আমার হালাল স্থির করা বস্তুকে হারাম করেছে"।

প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে যখন এ আয়াত তেলাওয়াত করা হলো তখন হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) দাঁড়িয়ে আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার জন্যে এ দোয়া করুন আল্লাহ্ পাক যেন আমার সমস্ত দোয়া কবুল করেন। এর জবাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ সা'দ! হালাল ও উত্তম খাদ্য আহার কর তাহলে আল্লাহ পাক তোমার দোয়া সমূহ কবুল করবেন। শপথ সেই মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ পাকের, যার মুষ্টিতে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রাণ, হারাম খাদ্য মানুষের উদরে প্রবেশ করলে তার কারণে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে ব্যক্তির দোয়া কবুল করা হয়না। যে রক্ত-মাংস হারাম দ্রব্য দ্বারা গঠিত হবে তা দোযখে যাবে"।

আয়াতের বর্ণনায়– আল্লাহ্ পাক অতঃপর এরশাদ করেনঃ "শয়তান তোমাদের স্বঘোষিত ও প্রকাশ্য শত্রু", অন্য আয়াতে বলা হয়েছে– "শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তোমরা তাকে শত্রু মনে কর"। তার ও তার সঙ্গীদের প্রত্যাশা হলো তোমাদেরকে দোযখবাসী করবে"। অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ

"তোমরা তাকে তার সন্তানদেরকে কি বন্ধু মনে কর? অথচ তারা তোমাদের চরম শত্রু। জালেমরা নিকৃষ্টতম প্রতিফল পাবে"।

শয়তান ও তার অনুসরণ

خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

অর্থাৎ যে সমস্ত পাপকার্য শয়তানের প্ররোচনায় করা হয়।

আল্লামা শাবী বলেন, এক ব্যক্তি তার পুত্র সন্তান জবেহ করার মানত করলো। যখন একথা হযরত মসরুক (রঃ)-এর নিকট জানানো হলো তখন তিনি বললেন ঃ ঐ ব্যক্তিকে একটি ভেড়া জবেহ করতে হবে–তার এ মানত خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ। অর্থাৎ শয়তানের দ্বারা প্ররোচিত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) একদিন বকরীর পা লবন দিয়ে আহার করছিলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট বসা ছিল সে দূরে গিয়ে বসলো। হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ আমার সঙ্গে আহার কর। সে বললোঃ না আমি আহার করবো না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ কেন, রোজা রেখেছ কি? সে বললোঃ না রোজা

রাখিনি। আমি এ খাদ্য আমার জন্যে হারাম স্থির করেছি। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) বললেনঃ এটাই শয়তানের অনুসরণ। শপথের কাফ্ফারা দাও এবং খাদ্য গ্রহণ কর।

হযরত আবু রাফে (রঃ) বলেন ঃ আমি একদিন আমার স্ত্রীর প্রতি রাগান্বিত হলে সে ক্ষিপ্ত হয়ে বললোঃ আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে তালাক না দেন তবে আমি একদিন ইহুদী, একদিন খৃষ্টান এবং আমার সমস্ত গোলাম আজাদ হয়ে যাবে।

আবু রাফে (রঃ) বলেনঃ আমি উল্লেখিত ব্যাপারে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনা জানিয়ে তার প্রতিবিধান প্রার্থনা করলাম। তিনি উত্তর দিলেনঃ "এতে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়েছে"।

অতঃপর আমি একই বিষয় নিয়ে হযরত জয়নাব বিন্‌তে সালামা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম। তখন মদীনা মোনাওয়্যারায় তাঁর চেয়ে বড় মহিলা ফহীক কেউ ছিল না। তিনিও আমাকে একথাই বললেন। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমত হলো, শপথ রাগের বশবর্তী হয়ে করা হবে এবং শয়তানী পন্থায় যে মানত করা হবে তার কাফ্ফারাও স্বাভাবিক শপথের কাফ্ফারার সম পরিমাণ আদায় করতে হবে। তিনি আরো বলেনঃ শয়তান তোমাদেরকে মন্দ কাজের এমনকি তার চেয়ে নিকৃষ্ট কাজ ব্যাভিচারের এবং তার চেয়ে জঘন্যতম কাজ আল্লাহ্ পাক সম্পর্কে অপবাদ দেয়ার প্ররোচনা দেয়, তাই যে কুফর বা বেদআতী পাপকার্যে উৎসাহ দেবে সে শয়তানেরই সঙ্গী হবে।১

إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ

"সে তোমাদেরকে শুধুমাত্র মন্দ এবং অশ্লীল কাজের হুকুম করে থাকে"।

ইবলিস কখন আনন্দিত হয়

হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ ইবলিস শয়তান তার আসন পানিতে স্থাপন করে এবং সেখান থেকে তার কর্মীদেরকে প্রেরণ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার উদ্দেশে। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শয়তানরাও পৃথিবীতে বড় বড় গোমরাহী সৃষ্টি করে থাকে। অতঃপর তারা যখন মানুষকে গোমরাহ্ করে ফিরে আসে তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ কার্য বিবরণী পেশ করতে থাকে। একজন বলে, "আমি আজ অমুক খারাপ কাজ করিয়ে এসেছি"। ইবলিস তখন বলে, "এটা তোর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কাজ হয়নি"। এরপর অন্যান্য শয়তান তাদের কার্য বিবরণী গর্বের সাথে পেশ করে। অবশেষ এক শয়তান এসে বলে যে, আমি আজ এক মহৎ কাজ করে এসেছি– এক ব্যক্তি এবং তার স্ত্রীর

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠ ১৯-২০

মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে এসেছি। ইবলিস এ বিবরণ শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয় তাকে কাছে টেনে নেয় এবং বলতে থাকে, "তুই আজ সত্যি একটি বড় কাজ করে এসেছিস"।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ মানুষের মধ্যে শয়তানেরও প্রভাব রয়েছে আবার ফেরেশতার প্রভাবও রয়েছে। শয়তানের প্রভাব হলো, মন্দ কাজের অঙ্গীকার করে থাকে এবং সত্যের প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। আর ফেরেশতার প্রভাব হলো, সে ভাল কাজের অঙ্গীকার করে থাকে এবং সত্যকে সত্য হিসাবে স্বীকার করে থাকে। সুতরাং যারা ফেরেশ্‌তার ধারণা নিজের অন্তরে পেয়ে থাকে তারা যেন মনে করে, এই ধারণা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসেছে। সে যেন তখন আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করে থাকে। আর যখন শয়তানী প্ররোচনা অন্তরে জাগরিত হয় তখন যেন সে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকে। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আল্লাহ্ পাকের শোকর, শয়তানের হুকুম করা ওয়াস্‌ওয়াসা (প্ররোচনা) পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ

"যখন তাদেরকে (ইহুদীদের) বলা হয় আল্লাহ্ পাক যা নাজিল করেছেন তার অনুসরণ কর"।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ইহুদীদেরকে যখন ইসলামের দাওয়াত দিলেন এবং জান্নাতের জ ন্যে উৎসাহিত ও দোযখের ভয় দেখালেন তখন রাফে এবনে হারীমলা এবং মালেক এবনে আউফ নামক দু' ইহুদী বললোঃ হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! আমরা আপনার অনুসরণ করবো না; বরং যে-বিষয়ের উপর আমাদের পূর্ব-পুরুষকে পেয়েছি আমরা তার উপরই চলবো। কারণ তারা আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী এবং অধিক উত্তম ছিলেন।

এ কথার প্রতি-উত্তরে উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়েছে। مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ (আল্লাহ্ পাক যা নাজিল করেছেন) একথা দ্বারা কোরআনে পাককে বোঝানো হয়েছে অথবা এর অর্থ তওরাতও হতে পারে। কারণ তওরাতও হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অনুসরণ করার হুকুম করে থাকে।

قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ

"তারা বলে–(কখনো না) আমরা অনুসরণ করি তার"

مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا

"যার উপর আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি"।

মুশরেকদের এ অযৌক্তিক কথার জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَوَلَوْ كَانَ اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْئًا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ

অর্থাৎ "যদিও তাদের পূর্ব–পুরুষরা কিছুই বুঝতো না এবং তারা হেদায়েত প্রাপ্তও ছিল না"।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে, একথা কিভাবে মেনে নেয়া যায় যে, তারা কিছুই বুঝতো না অথচ তারা ছিল তওরাতের অনুসারী। এ প্রশ্নের জবাব এই, তারা আদৌ তওরাতের অনুসারী ছিল না। যদি তারা তওরাতের উপর আমল করতো তবে তারা অবশ্যই হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করতো। বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, ইহুদীরা হয়তো তাদের পূর্ব পুরুষদেরকে তওরাতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে দেখেছে। তাই তারাও তওরাতে পরিবর্তন করে থাকে। যদি এ ইহুদীরা তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে তওরাতের অনুসরণ করতে দেখতো তাহলে এরা ইসলামের জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতো। কোন অবস্থাতেই ইসলামের বিরোধী হতো না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই, কোন লোককে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে দেখলে এ মন্তব্য করা হয় হয়তো তার বাপ-মা বা পিতা ও পিতামহ এমনই ছিল।[১]

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে পৌত্তলিকদের গোমরাহীর কথা বর্ণিত হয়েছে, যে কারণে তারা চিরন্তন সত্য ইসলামকে গ্রহণ করতে পারেনি। আলোচ্য আয়াতে পৌত্তলিকদের গোমরাহীর একটা দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে, যা দ্বারা তাদের গোমরাহী বা পথভ্রষ্টতা সুস্পষ্ট হয়।

এরশাদ হয়েছেঃ যারা কাফের, যারা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করেছে তাদের দৃষ্টান্ত হলো এমন, মাঠের মধ্যে কোন ব্যক্তি যদি চতুঃষ্পদ জন্তুকে ডাকে আর সে জন্তু ঐ ডাকের কোন মর্মই উপলব্ধি করতে পারে না। তেমনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুশরেক-বেদ্বীন লোকদেরকে পৃথিবীর সর্ব কালের সর্ব শ্রেষ্ঠ সত্য ইসলামের দিকে আহ্বান করেন অথচ এ কাফের মুশরেক-বেদ্বীনরা সে আহ্বানে সাড়া দেয় না। শুধু তাই নয়, বরং তাঁর বিরোধিতা করে। অতএব তাদের দৃষ্টান্তে হল আল্লামা আলুসীর ভাষায়ঃ

كَالْبَهَائِمِ يُنْعَقُ عَلَيْهَا وَهِىَ لَاتَسْمَعُ اِلَّا جَرْسَ النَّغْمَةِ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৮৬-২৮৭

অর্থাৎ এরা হলো সেই চতুঃষ্পদ জন্তুর মত যাকে চিৎকার করে ডাকা হয় অথচ সে ঐ চিৎকার ব্যতীত আর কিছুই বোঝেনা।[১]

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ তফসীরকার হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেনঃ আল্লাহ পাক এ আয়াতে কাফেরদের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে এরা হলো উষ্ট্র, গর্ধভ এবং ছাগলের ন্যায়, যাদেরকে তুমি যদি বল 'খাও' তবে তারা তোমার কথার শব্দ শ্রবণ করবে কিন্ত তার অর্থ বুঝবে না। তেমনি কাফের-মুশরেক-বেদ্বীন লোকের অবস্থা এই, তাকে যদি কোন ভাল কাজের নির্দেশ দাও অথবা মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আদেশ দাও, সে আদৌ তোমার কথা বুঝবে না শুধু তোমার কথার ধ্বনি শ্রবণ করবে। ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَثَلُ الدَّابَّةِ تُنَادَى فَتَسْمَعُ وَلَا تَعْقِلُ مَا يُقَالُ لَهَا كَذَالِكَ الْكَافِرُ يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَلَا يَعْقِلُ

অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, চতুঃষ্পদ জন্তুকে যেমন ডাকা হলে সে ডাক শ্রবণ করে কিন্তু তার অর্থ বোঝেনা তেমনি কাফেররা সত্যের ডাক শ্রবণ করে কিন্ত তা বোঝেনা।[২]

মূলতঃ এ কারণেই কাফেররা জ্ঞান-বুদ্ধির কথা, সত্য ও ন্যায়ের কথা শ্রবণ করেও তার সত্যতা উপলব্ধি করেনা, তারা বধির, তারা অন্ধ তাই দেখেও দেখে না এবং তারা মূক তাই সত্য কথা তারা বলেনা, এমনি অবস্থায় তাদের সম্পর্কে সৎ-পথ লাভের আশা সুদূর পরাহত।

পবিত্র কোরআনের অন্য একখানি আয়াতে কাফেরদের এ দুরবস্থার বিবরণ এভাবে পেশ করা হয়েছেঃ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ (সূরা আ'রাফ)

"আর নিশ্চয় আমি বহু জ্বীন ও মানুষকে দোযখের জন্যে তৈরী করেছি, তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা সত্য উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে কিন্তু তা

(১) তফসীরে রূহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪১

(২) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৮

দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে কিন্তু তা দ্বারা তারা শ্রবণ করে না, তারা পশুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধিকতর পথভ্রষ্ট। তারাই গাফলতের আবর্তে নিপতিত"।

আল্লাহ্ পাক মানুষকে সত্য-অসত্য বোঝার জন্যে যে শক্তি দান করেছেন কাফেররা আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত সেই শক্তিকে অকার্যকর করে রেখেছে, তাই তাদেরকে বধির, মূক এবং অন্ধ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। আর এজন্যেই ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ

অর্থাৎ তারা কিছুই বুঝতে পারেনা। বস্তুতঃ তারা যে বোঝেনা, এ সত্যটিও তারা বুঝতে পারেনা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ
لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٧٣﴾

তরজমা

(১৭২) হে মোমেনগণ! আমি তোমাদেরকে উপজীবিকা হিসাবে যেসব পবিত্র বস্তু প্রদান করেছি তা থেকে তোমরা আহার কর আর আল্লাহ্ পাকের সমীপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই বন্দেগী করে থাক।

(১৭৩) আল্লাহ্ পাক তো তোমাদের জন্যে হারাম করেছেন শুধুমাত্র মৃত জীব-জন্তু, রক্ত, শুকরের গোশ্ত এবং যে বস্তু আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করা হয়েছে। তবে যে-ব্যক্তি অনন্যোপায় কিন্ত বিদ্রোহী বা সীমা-লংঘনকারী নয় তার জন্যে দোষণীয় নয়; নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অনন্ত দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হালালকে হারাম মনে করোনা। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হারামকে হালাল মনে করোনা যেমন পৌত্তলিকরা তা করতো।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মওলানা আবদুল হক হক্কানী (রঃ) তাঁর তফসীরে হক্কানীতে বলেছেনঃ পূর্বের আয়াতে আল্লাহ পাকের হুকুম ছিল দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে, পবিত্র এবং বৈধ বস্তু সমূহ তোমরা আহার কর। আর এ আয়াতে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে এরশাদ হয়েছে– হে মোমেনগণ! তোমরা নির্বোধ লোকদের কথায় প্রতারিত হয়োনা, আমার সৃষ্ট বস্তু সমূহের মধ্যে যা পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং আমার নেয়ামত সমূহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁর সঙ্গে দাসত্বের সম্পর্ক রেখে থাক।

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক যেসব বস্তু আহার করা হারাম বলে ঘোষণা করেছেন সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে (১) মৃত জীব-জন্তু, (২) রক্ত, (৩) শুকরের গোশ্ত এবং (৪) যে-জন্তু আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের নামে জবেহ করা হয়ে থাকে।

অবশ্য যখন কোন ক্ষুধার্ত মানুষ ক্ষুধার-জ্বালায় কাতর হয়ে যায় এবং প্রাণ-বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয় তখন উপরোল্লিখিত হারাম বস্তু সমূহ থেকে কোন কিছু আহার করলে তাতে কোন পাপ নেই। অবশ্য এজন্যে শর্ত হলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত সে গ্রহণ করবে না।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্র বিদ্রোহী হওয়াও তার উদ্দেশ্য হবে না। আল্লাহ পাক অত্যন্ত দয়াবান, অতীব ক্ষমাশীল, তিনি মাফ করবেন।[১]

দোয়া কবুল হওয়ার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেনঃ

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক বন্দাদেরকে হুকুম করেছেন যেন তারা পাক-পবিত্র, হালাল এবং উত্তম বস্তু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে আর আল্লাহ্ পাকের শোকর গুজারী করে। হালাল খাদ্য গ্রহণের দরুণ দোয়া এবং এবাদত কবুল হয়ে থাকে আর হারাম খাদ্যের কারণে দোয়া এবং এবাদত কবুল হয় না। মসনদে আহমদে হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ হলেন পবিত্র সত্তা। তাই তিনি পবিত্র বস্তু কবুল করে থাকেন। তিনি নবীগণকে এবং মোমেনদেরকে হুকুম দিয়েছেন যেন তারা পবিত্র জিনিস খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং নেক আমল করে। এরশাদ রয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ

(হে রসূলগণ! তোমরা ভাল বস্তুকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ কর।) আরও এরশাদ হয়েছেঃ

(১) তফসীরে হক্কানী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৭-২৮

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ

(হে ঈমানদারগণ! আমি যা কিছু রিয্ক তোমাদেরকে দান করেছি তার মধ্যে থেকে ভাল বস্তু খাদ্য রূপে গ্রহণ কর।) এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ এক ব্যক্তি দূরের সফরে রয়েছে। দূর পাল্লার মুসাফির হওয়ার কারণে তার চুল অবিন্যস্ত এবং ধূলা-বালি মিশ্রিত হয়ে পড়েছে, সে তখন দু' হাত তুলে দোয়া করতে থাকে এবং কাকুতি-মিনতি করে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। কিন্তু তার খাদ্য, পোশাক এবং পথ্য হারাম হওয়ার কারণে এ সংকটাপন্ন মুসাফির অবস্থার বিনীত দোয়া কবুল হয় না।

হারাম বস্তু এবং খাদ্যের কিছু বিবরণ

হালাল বস্তুর বর্ণনার পর এবার হারাম সামগ্রীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। মৃত জন্তু যা জবাই হয়নি, আপনা-আপনি মারা গেছে সেগুলো হারাম। যেমন হয়তো কেউ জন্তুটিকে গলা টিপে মেরেছে অথবা লাঠির আঘাতে মারা গেছে অথবা আছাড় খেয়ে মারা গেছে বা অপর কোন জন্তুর শিংয়ের আঘাতে নিহত হয়েছে বা হিংস্র জন্তু তাকে হত্যা করে ফেলেছে–এরূপ জন্তু মৃত জন্তু হিসেবে গণ্য এবং এগুলো আহার করা হারাম। তবে পানির জন্তু এ ব্যাপারে পৃথক। সেগুলো জবাই ছাড়া মারা গেলেও হালাল হবে। কারণ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهٗ

(এ আয়াতের তফসীরে বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।)

একবার আম্বর নামের একটি জন্তু মৃত অবস্থায় সাহাবাগণ প্রাপ্ত হন এবং তা আহার করেন। অতঃপর হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বিষয়টি অবগত হন এবং ঐ আহার করাকে জায়েয বলে ঘোষণা করেন। অপর একখানি হাদীসে আছে, সমুদ্র বা নদীর পানি পবিত্র, সুতরাং সেখানকার মৃত প্রাণী হালাল হবে। অন্য হাদীসে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলেনঃ দু' প্রকার মৃত এবং দুই প্রকার রক্ত (পিন্ড) আমাদের জন্যে হালাল– মাছ ও টিড্ডি এবং কলিজা ও প্লীহা। সূরা মায়েদায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা থাকবে ইন্শাআল্লাহ।[১]

মাসআলা

যদি জবাই না করে জীবিত জন্তু থেকে কোন অঙ্গ অথবা কোন মাংসপিন্ড কাটা হয় তবে তা মৃত জন্তুর মাংসের ন্যায় হারাম হবে। মৃত জন্তুর হাড়, পশম, নখ, দাঁত

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২১

এবং চামড়া শোধন করার পর তা পবিত্র হয়ে থাকে। গোশ্‌তের মধ্যে রক্ত-বর্ণের যা কিছু থাকে তা গোশ্‌তের আদ্রতা, রক্ত নয়–সুতরাং গোশ্‌তের আদ্রতা রক্তের মত হলেও তা নাপাক হবে না। শুকরের গোশ্‌তের সব কিছুই এবং শুকরের দেহের যে কোন অংশ হারাম এবং নাপাক। এ জন্তুটির দেহের কোন অংশ দ্বারা কোন প্রকার সুবিধা গ্রহণ করা জায়েয হবে না–সে জীবিত হোক অথবা মৃত। জবাইয়ের সময় বা জবাইয়ের আগে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারণ করার দরুণ গোশ্‌ত হারাম হয়ে যায়। কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে উৎসর্গ করে দিয়ে লালন-পালন করা অথবা জবেহ্ করা শেরেকী এবং এর দ্বারা গোশ্‌ত হারাম হয়ে যায়।[১]

طيبات শব্দটি طيبة শব্দের বহুবচন। طيب শব্দের অর্থ হলো পবিত্র এবং সুস্বাদু–যার মধ্যে ক্ষতিকর কোন কিছু থাকে না। আর হালাল বলে তাকে শরীয়ত যা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেনি। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, শরীয়ত যা কিছু হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তার মধ্যে মানুষের জন্যে ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এ ক্ষতিকর দিকটি বিস্বাদ হওয়ার কারণেও হতে পারে আবার ঘৃণার উদ্রেক হওয়ার কারণেও হতে পারে। কেননা এর দরুণ মানুষের স্বাভাবিক রুচি এগুলো গ্রহণ করতে পারে না। যেমন মৃত-জন্তু ইত্যাদি। আবার এজন্যেও ক্ষতিকর হতে পারে যে চরিত্রের উপর এ হারাম বস্তুর প্রভাব পড়ে থাকে। যেমন শুকর, হিংস্র প্রাণী এবং শিকারী জন্তুর গোশ্‌ত, অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে এগুলো আহারের দরুণ নির্লজ্জতা সৃষ্টি হয় এবং অন্তর কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ খাদ্য-বস্তু দেহের অংশে পরিণত হয়ে আহারকারীকে নিজের স্বভাব বিশিষ্ট করে তোলে।

আবার সুদ খাওয়া, চুরি করা, ছিনিয়ে নেয়া ইত্যাদি নাজায়েয পেশার উপার্জন এজন্যে হারাম হয়েছে যে, এর দরুণ মানব চরিত্র কলুষিত হয়। তাই দেখা যায় যে, সুদখোর ব্যক্তি এত নিষ্ঠুর হয়ে থাকে যে তার দরিদ্র ভাইয়ের কাছ থেকে একের বিনিময়ে একশ' নিয়েও তাকে রেহাই দিতে পারে না। আবার হারাম খাদ্য এভাবেও ক্ষতিকর হতে পারে যে এর কারণে সঠিক অনুভূতি এবং জ্ঞানের বিলোপ হয়ে থাকে যেমন মদ ইত্যাদি নেশাকর দ্রব্য। সুতরাং طيب শব্দের অর্থ যেহেতু এত কিছু তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর প্রতিটি দিক দিয়ে বিভিন্ন বাক্যে তফসীর করেছেন। কখনো طيب (তাইয়েব) 'হালাল উপার্জন'-কে বলেছেন আবার কখনও এর দ্বারা ক্ষতিকর নয় এরূপ বস্তুকে বুঝিয়েছেন। অবশ্য একথা সত্য যে 'তাইয়্যেব' শব্দের অর্থ সম্পর্কে প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক দেশ এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রুচি অনুযায়ী পৃথক ধারণা রয়েছে। সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিগণ যে সব বস্তুকে অপবিত্র, ক্ষতিকর এবং ঘৃণিত মনে করে থাকেন ঐগুলোকে এমনও শত শত লোক আছে যারা ভালো ('তাইয়েব') মনে করে থাকে। অনেকে এতটা মুক্ত স্বভাবের যে কোন জিনিসই আহার করতে ছাড়ে না। সুদ ও যেনার উপার্জনকে জাতীয় কল্যাণ এবং

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১,পৃষ্ঠা ১০৯–১১০

দেশের অধিকতর উন্নতির পথ বলে মনে করে থাকে। আবার অনেকে পবিত্র খাদ্যকেও হারাম মনে করে বসেছে যেমন গরুর গোশ্‌ত ইত্যাদি। এদেরই ধর্ম-গুরুগণ আরো অনেক ধাপ এগিয়ে উত্তম পোষাক এবং পত্নীদের কাছে গমন করাকেও হারাম মনে করে থাকে। এজন্যে আল্লাহ পাক 'তাইয়্যেব' ('ভাল')-কে হালালের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সাবধান করে দিয়েছেন যে, সাধারণ মানুষ যেমন পশুর মত সব কিছুকেই 'ভাল' মনে করে সেসব নয়, বরং সেগুলোর মধ্য থেকে যেগুলো ভাল, হালাল বস্তু সমূহকে তোমাদের আহারের জন্যে সৃষ্টি করেছি। যারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহকে নিজেরাই হারাম করে রেখেছিল এসব লোকদের বিরোধিতা করা হয়েছে এ আয়াতে এবং এর পূর্বের আয়াতে। বস্তুতঃ এ আয়াতে রয়েছে সঠিক পথ–নির্দেশ। আর যারা পবিত্র বস্তু সমূহ আহার না করাকে এবাদত মনে করতো তাদেরকে এ আয়াতে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে, এ সকল নেয়ামত আহার করে আমার শোকর গুজারী কর। আহার করার এ সুখকর সময়ে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং অন্তরের গভীর থেকে তাঁর শোকর আদায় করা এক মহান এবাদত।[১]

ميتة (মৃত-জন্তু) আভিধাণিক অর্থে সে প্রাণীকে বলা হয় যার দেহ না কেটে অন্য কারণে মারা গেছে।[২] শরয়ী অর্থে মৃত জন্তু বলতে যা বোঝানো হয় তা পূর্বে আলোচিত হয়েছে।

فَمَنِ اضْطُرَّ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি (আহার করতে) বাধ্য হয়েছে"।

اضطرار শব্দের অর্থ হলো নিরুপায় হওয়া। এ নিরুপায় অবস্থা কয়েক ধরনের হতে পারে।

প্রথমতঃ কোন হালাল বস্তু নিকটে না থাকা এবং ক্ষুধার কাতরতায় চলতে-ফিরতে না পারা। অথবা উপার্জনে অক্ষম হওয়ার দরুণ বা দূর্লভ হওয়ার কারণে খাদ্য-বস্তু না পাওয়া। এমন সাধারণতঃ দূর্ভিক্ষের দিনে এবং মরুভূমিতে, অরণ্য ও সমুদ্র পথে সফরের সময় হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়া যে একজন দ্বীনদার চিকিৎসক এ হারাম বস্তুগুলো বিশেষভাবে এ রোগীর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়।

তৃতীয়তঃ কোন জালেম যদি এ জিনিসগুলো কোন ব্যক্তিকে আহার করতে বাধ্য করে বলে যদি তুমি এগুলো গ্রহণ না কর তবে তোমাকে হত্যা করবো অথবা তোমার কোন অঙ্গ যেমন হাত বা পা কেটে ফেলবো অথবা তোমার কোন প্রিয়জন যেমন সন্তান বা ভাইকে হত্যা করবো অথবা তার হাত বা পা কেটে ফেলবো। এসব কথা শুনে সে ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিশ্বাস হয়ে যাওয়া যে, যদি সে এগুলো আহার না করে তবে এ জালেম জুলুম করে বসবে।[১]

(১) তফসীরে হক্কানী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৮–৩২

بَاغٍ শব্দের তফসীর ও কয়েকটি কথা

باغ (বিদ্রোহী) এবং عاد (সীমা অতিক্রমকারী) শব্দ দু'টির ব্যাখ্যায় মুজাহেদ (রঃ) বলেনঃ রাহাজানী বা ছিনতাইকারী, ডাকাত, মুসলিম রাষ্ট্র আক্রমণকারী, ইসলামী রাষ্ট্রের বিরোধী এবং আল্লাহর নাফরমানী করার (চুরি, যেনা ইত্যাদি সম্পাদনের) উদ্দেশে সফরকারীকে একথার দ্বারা বোঝানো হয়েছে। আহার করতে বাধ্য হলেও এদের জন্যে যা হারাম বস্তু তা হারামই থেকে যাবে। غير باغ (অর্থাৎ বিদ্রোহী না হয়ে খাওয়া) কথাটির তফসীরে মোকাতেল বিন হাব্বান (রঃ) একথাও লিখেছেন যে, আহারের সময় সেই হারাম বস্তুটিকে হালাল মনে করা চলবে না এবং স্বাদ বা মজা পাওয়ার উদ্দেশে খাবে না। সুতরাং ভুনে-ভেজে মজাদার বানিয়ে খাবে না; বরং যেমন-তেমন শুধু জান বাঁচানোর জন্যে খেয়ে নেবে। আর যদি সঞ্চয়ের প্রয়োজনে সাথে নিতে হয় তবে হালাল বস্তু পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হারাম বস্তু ফেলে দেবে। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেছেন, সে খাদ্য পেট ভরে খাবে না।

মাসআলা

যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় অচল হয়ে পড়ে আর তখন সে একটি মৃত জন্তু দেখতে পায় এবং অপর ব্যক্তির কোন হালাল খাদ্য-বস্তু দেখতে পায় যা গ্রহণ করলে শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশংকা নাই অথবা কোন কষ্ট পাবে না তখন সেই ক্ষুধার্ত ব্যক্তির উচিত মৃত জন্তুটি না খেয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তির হালাল বস্তু খেয়ে নেয়া। এই পর্যায়ে একখানি হাদীস উল্লেখযোগ্য। হযরত উব্বাদ বিন শারাহ্বীল গাযী (রাঃ) বলেনঃ একবার আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আমি তখন মদীনায় গেলাম এবং ফসলের ক্ষেত থেকে একটি ছড়া ছিঁড়ে নিয়ে তা থেকে খোসা ছাড়িয়ে চিবাতে লাগলাম, আর কিছু ছড়া চাঁদরে বেধে নিয়ে রওয়ানা হলাম। এমন সময় ক্ষেতের মালিক দেখে ফেললো এবং আমাকে ধরে মারপিট করে আমার চাঁদর কেড়ে নিল। আমি তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম এবং তাঁর খেদমতে ঘটনাটি ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি সে ব্যক্তিকে বললেন, 'এ ক্ষুধার্ত ব্যক্তিটিকে তুমি কোন খাবার খেতে দিলে না আর এর জন্যে কোন চেষ্টাও করলে না এবং বুঝিয়ে সুঝিয়ে কিছু শেখালেও না অথচ বেচারা ক্ষুধার্ত এবং অবুঝ ছিল। যাও তার চাদর ফেরত দাও এবং এক 'ওয়াসেক' অথবা আধা 'ওয়াসেক' (এক ওয়াসেক প্রায় চার মন) শস্য তাকে দান কর'। অন্য একখানি হাদীসে আছে, গাছে ধরে থাকা ফল সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হলে তিনি জবাবে এরশাদ করেনঃ যার প্রয়োজন আছে তারা এখান

থেকেই কিছু খেয়ে নিক, তাতে সাথে না নিয়ে গেলে কোন দোষ নেই। হযরত মুজাহেদ (রঃ) বলেন, "এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আহার করতে বাধ্য হওয়া এবং ক্ষুধায় অচল হয়ে পড়ার সময় ততটুকু খেতে কোন দোষ নেই যতটুকু খেলে সেই 'বাধ্যতা' এবং 'ক্ষুধার অচলতা' কেটে যায়"। আবার একথাও বর্ণিত আছে যে, তিন লোকমার অধিক যেন না খায়।

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ
وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾

তরজমা

(১৭৪) নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাকের অবতীর্ণ গ্রন্থ গোপন রাখে এবং তার বিনিময়ে অত্যন্ত তুচ্ছ মূল্য গ্রহণ করে তারা স্বীয় উদরে অগ্নি ব্যতীত আর কিছুই পুরে না, আর কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, তাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক শাস্তি।

(১৭৫) তারাই সৎ পথের পরিবর্তে কু-পথ এবং ক্ষমার পরিবর্তে শাস্তি ক্রয় করেছে, কি আশ্চর্য, তারা দোযখের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত!

(১৭৬) এর কারণ এই যে, আল্লাহ্ পাক সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং যারা এই কিতাবে মতভেদ করেছে তারা জেদের কারণে সত্য থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছে।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ইমাম রাযী (রঃ) তাঁর তফসীরে হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাজিল হয়েছে ইহুদীদের তদানীন্তন তথাকথিত

নেতাদের সম্পর্কে- যথা কা'ব এবনে আশরাফ, কা'ব এবনে আসাদ এবনে সাঈফ, হাই এবনে আখতাব, আবি ইয়াসের এবনে আখতার। এরা তাদের অনুসারীদের কাছ থেকে হাদীয়া স্বরূপ অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করতো। যখন প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো তখন তারা প্রমাদ গুণলো এই ভেবে যে, হয়তো এখন থেকে তাদের এ আর্থিক সুবিধা গ্রহণের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। তাই তারা তৌরাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে গুণাবলী রয়েছে তা গোপন করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের অনুরূপ শানে নুযুলই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি তথাকথিত ইহুদী নেতাদের নাম উল্লেখ করেননি আর এতটুকু বক্তব্য সংযোজন করেছেন যে, ইহুদী ধর্মযাজকরা আশা করতো যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আবির্ভাব তাদের মধ্য থেকেই হবে। কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হলো তখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে চিন্তা করতে লাগল, যদি আমরা তাঁর অনুসরণ করি তবে বর্তমানে ভক্তদের থেকে যে আর্থিক সুবিধা পেয়ে থাকি তা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তারা তৌরাতে বর্ণিত প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী গোপন করলো, অর্থ সম্পদের লোভ তাদেরকে অত্যন্ত মন্দ ও নিকৃষ্ট কাজে আগ্রহী করে তুললো।[২]

তফসীরকারদের মধ্যে এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে যে, ইহুদীরা কোন্ বিষয়টি গোপন করতো? হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), কাতাদা, সাদী প্রমুখ তফসীরকারের মতে তারা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী গোপন করতো। আর হাসানের মতে তারা গোপন করতো আল্লাহ পাকের নির্দেশ সমূহকে। তিনি তাঁর মতের সমর্থনে এ আয়াত পেশ করেছেন ঃ

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ

"নিশ্চয় অনেক সাধু এবং দরবেশ অন্যায়ভাবে জনসাধারণের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং আল্লাহ্র পথে বাধা দান করে"।[৩]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন ঃ

পদমর্যাদার মোহই তাদের ইসলাম গ্রহণে অন্তরায় হলো

ইহুদীরা তাদের কিতাবে উল্লেখিত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান গুণাবলী গোপন করতো। বিনিময়ে তারা জনসাধারণের সম্মুখে নিজেদের মিথ্যা

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৫-২৬
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৬
(৩) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৬

মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে চেষ্টা করতো। মানুষের দান-মানত লুটে নিত এবং অস্থায়ী জীবনের স্বার্থ সিদ্ধি করতে গিয়ে চিরস্থায়ী জীবনের নাজাত ও সুখ শান্তি বিনষ্ট করতো।

তাদের একটি ভয় ছিল, যদি বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে তৌরাতে বর্ণিত তথ্য সমূহ সাধারণের সম্মুখে প্রকাশ পেয়ে যায় তবে সর্ব সাধারণ তাঁর অনুসারী হয়ে যাবে এবং তাদেরকে পরিত্যাগ করবে। এ ভয়েই তারা হেদায়েত ও মাগফেরাতের পথ বর্জন করে ভ্রান্তি ও আযাবের পথই আঁকড়ে রয়েছে। আর এজন্যে তাদের প্রতি ইহ ও পরকালীন অসম্মান ও শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পরকালীন শাস্তি তো অবধারিত এবং ইহকালেও তাদের অপমান লাঞ্ছনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের মিথ্যা কূটকৌশল ও ধোকাবাজি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। স্বয়ং আল্লাহ পাকই তাদের বহু কূটকৌশল ও মিথ্যাবাদিতার কথা কোরআনে পাকে প্রকাশ করে দেন।

এতদ্ব্যতীত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ ও উত্তম গুণাবলী মানুষকে ব্যাপক ভাবে আকৃষ্ট করলো। আর যে জনগোষ্ঠী তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা আল্লাহ পাকের সত্য বাণী গোপন করতো অবশেষে তারা তাদের হাত ছাড়া হয়েই গেল এবং সে সব মানুষই হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হাতে ইসলামের দীক্ষা গ্রহণ করে ঐ ইহুদী কুচক্রী ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করলো। কোরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে তাদের অপচেষ্টার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, 'এ সম্পদ- যা তোমরা আল্লাহ পাকের কথা গোপন করে বিভ্রান্ত মানুষ থেকে রোজগার করছো প্রকৃতপক্ষে তোমরা তোমাদের উদরে অগ্নি পুরে নিচ্ছ'। যে সব লোক এতীমের সম্পদ অন্যায় ভাবে দখল করে তাদের সম্পর্কেও কোরআনে পাকের এই একই সতর্কবাণী যে তারা তাদের উদরে অগ্নি পুরে নিচ্ছে এবং যে সব লোক আহারে স্বর্ণ-রৌপ্যের আসবাব পত্র ব্যবহার করবে সহীহ হাদীস শরীফে তাদের সম্পর্কেও একই সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। উল্লেখিত আয়াতের পরবর্তী অংশে আল্লাহ পাক এ পথভ্রষ্ট ইহুদীদের পরিণতির কথা ঘোষণা করেছেন যে, আল্লাহ পাক শেষ বিচারের দিন তাদের সঙ্গে কোন প্রকার কথা বলবেন না, তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না; বরং কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। তাদের এসব অপরাধের কারণেই তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে। তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের এতটুকু করুণা অবশিষ্ট নেই।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে যে, তিন প্রকারের ব্যক্তির সঙ্গে আল্লাহ পাক কোন প্রকার কথা বলবেন না, তাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করবেন না, তাদেরকে সংশোধন করবেন না; বরং কঠিন শাস্তি তাদের জন্যে অবধারিত। প্রথমতঃ বয়োঃবৃদ্ধ ব্যাভিচারী, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যাচারী রাষ্ট্রপ্রধান, তৃতীয়তঃ অহংকারী মিসকিন।

এ সমস্ত ইহুদীরা হেদায়েতের পরিবর্তে স্বেচ্ছায় গোমরাহীকে বরণ করেছে। তাদের কর্তব্য ছিল তৌরাতে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে যে প্রশংসা ও পরিচিতি উল্লেখিত হয়েছে তা যথাযথভাবে প্রকাশ করা। কিন্তু তার পরিবর্তে তারা সে কথা সম্পূর্ণই গোপন করলো এবং আখেরী নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অস্বীকার করলো, এজন্যে তারা আল্লাহর করুণা ও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁর কোপগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হলো।

তাদের সম্পর্কে আরো এরশাদ হয়েছে যে, তারা আল্লাহ পাকের পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহের মর্মবাণীর প্রতি কৌতুক ও বিদ্রুপ করেছে, আল্লাহ্‌র সর্বশেষ নবীর পরিচয় গোপন করেছে। বস্তুতঃ কোরআনে পাক সম্পর্কে যারা দ্বিমত পোষণ করবে তারা ভ্রান্তির অন্ধকারে নিপতিত।[১]

ইহুদীদের অপচেষ্টা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আল্লামা শিব্বীর আহ্‌মদ ওসমানী (রঃ) ফাওয়ায়েদে ওসমানীতে লিখেছেন ঃ আল্লাহ পাক যেভাবে আসমানী কিতাবে হালাল-হারামের বিবরণ দিয়েছেন, তেমনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিচয়, গুণাবলী এবং তাঁর উচ্চ মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইহুদীরা ক্ষেত্র বিশেষে যেমন সেই বিবরণ পরিবর্তনের অপচেষ্টা করেছে তেমনি কোন কোন ক্ষেত্রে তা গোপন করতেও প্রয়াসী হয়েছে। জনসাধারণকে আল্লাহ পাকের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ রাখার ষড়যন্ত্র করেছে। তারা শুধু যে আল্লাহর অবাধ্য ও নাফরমান হয়েছে তাই নয়, বরং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করার এবং চিরদিন গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে।

শুধু তাই নয়; বরং তারা নিজেরাতো পথভ্রষ্ট ছিলই আর অন্যদের গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট করেও তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং যারা তাদের দ্বারা গোমরাহ হয়ে সর্বহারা হতো, তাদের থেকে সত্য গোপনকারী এই ধর্ম ব্যবসায়ীর দল সত্য ধর্মকে গোপন করার বিনিময়ে অর্থ সম্পদও গ্রহণ করতো।

জঘন্য অপরাধ

আল্লামা শিব্বীর আহমদ ওসমানী (রঃ) আরো লিখেছেন- তাদের এই হারামখোরী মৃত প্রাণী ও শুকরের মাংস ভক্ষণ থেকেও জঘন্য অপরাধ। এজন্যে এর শাস্তিও কঠোরতর। কোরআনে করীমের এ আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক এমনি হতভাগ্য ও স্বার্থান্ধ ধর্ম ব্যবসায়ীদের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করে এরশাদ করেছেনঃ যারা আল্লাহ্‌র বিধানকে পরিবর্তন করে তথা সত্যকে গোপন করে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করেছে তারা যেন অগ্নি দ্বারা তাদের উদর পরিপূর্ণ করে নিচ্ছে কেননা, অবশেষে এ অপকর্মের শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তাদেরকে দোযখের অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে।[২]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩

(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা ৩৩

সত্য-গোপনকারীদের উদ্দেশে সতর্কবাণী

এ আয়াতে শুধু যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানার ইহুদীদের সম্পর্কে সতর্কবাণী রয়েছে তাই নয়, বরং সর্বকালের সে সব মানুষের জন্যেও এতে হুশিয়ারী বাণী রয়েছে যারা সত্যকে গোপনের চেষ্টা করে, যারা ইসলামী বিধি-নিষেধ অবগত থাকা সত্বেও অর্থ সম্পদের লোভে এ বিধানকে পরিবর্তন করার অথবা গোপন করার অপচেষ্টা করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমাদের দেশের সেসব আলেম নামধারী লোকদের উল্লেখ করা যেতে পারে যারা নিজেদেরকে আহ্‌লে সুন্নত ওয়াল জামাআতের দাবীদার বলেও বাতিল ফেরকা শিয়া সম্প্রদায়ের নিকট থেকে অর্থ-সম্পদ গ্রহণ করে এবং তাদের স্বার্থে কাজ করে এবং তাদের মতবাদ প্রচারে সহযোগিতা করে, এমন ধর্ম ব্যবসায়ীদের জন্যে রয়েছে আলোচ্য আয়াতে শাস্তির ঘোষণা।

وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম শাস্তি হলো আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না, এতদ্বারা তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের চরম অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ প্রকাশ করা হয়েছে। মানুষ কারো গৃহে গমন করলে বাড়ীর কর্তা যদি আগন্তুকের সাথে কোন কথাই না বলেন তবে তা হয় সে-ব্যক্তির প্রতি চরম শাস্তি। আর এ শাস্তি ঘোষিত হয়েছে অর্থ-সম্পদের বিনিময়ে যারা সত্যকে গোপন করে তাদের জন্যে।

وَلَا يُزَكِّيهِمْ "এবং আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন না"।

এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, মোমেনদের মধ্যে যারা গুনাহ্‌গার হবে তাদের সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর তাদেরকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। কিন্তু আলোচ্য আয়াতে যে ধর্ম ব্যবসায়ীদের কথা বলা হয়েছে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় এ বাক্যে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ পাক পরিশুদ্ধ করবেন না, কেননা তারা মূর্তিমান অপবিত্র। তাদের সংশোধনের ব্যবস্থা নেই, তাই তাদের নাজাতও নেই। এরপর আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন- وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি"।

শুধু যে তাদের দেহ শাস্তি ভোগ করবে তাই নয়, বরং তাদের অন্তরও সেই শাস্তির দহন ভোগ করতে বাধ্য হবে, তাদের অন্তর-জ্বালা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। পবিত্র কোরআনে তাদের সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে এরশাদ হয়েছে ঃ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ কি আশ্চর্য, তারা দোযখের ভয়াবহ শাস্তি ভোগ করতে প্রস্তুত"! দোযখের কঠিন শাস্তি ভোগের জন্য তাদের সাহস কত বেশী, দোযখের আগুনই যেন তাদের কাম্য। তাই অতি আগ্রহে ছুটে চলেছে তারা দোযখের দিকে, গোপন করে চলেছে তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের গুণাবলী এবং তাঁর মহান আদর্শকে। যারা তাঁর চির শত্রু তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে এবং তাঁর শত্রুদের হাদীয়া–নজরানা কবুল করে অর্থ-সম্পদের মালিক হচ্ছে। তাই পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে

সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ

অর্থাৎ "তারা হেদায়েতের বদলে গোমরাহীকে ক্রয় করে নিয়েছে এবং মাগফেরাতের বদলে শাস্তিকে বেছে নিয়েছে"। এর চেয়ে ভয়াবহ পরিণাম আর কি হতে পারে? (আল্লাহ পাক রক্ষা করুন!)

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَ
الْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَ
الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

তরজমা

(১৭৭) এতে কোন পূণ্য নেই যে, তোমরা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফেরাও, বরং পূণ্য তার যে বিশ্বাস স্থাপন করে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি এবং ফেরেশতাগণ ও আসমানী কিতাব এবং নবীগণের প্রতি, আর যারা ধন-সম্পদের মায়া সত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিখারী এবং দাসত্ব মোচনের জন্যে (মানুষকে) দান করে, আর যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত আদায় করে, আর যারা নিজেদের অঙ্গীকার রক্ষা করে এবং যারা দুঃখ-কষ্টে ও যুদ্ধকালে ধৈর্য ধারণ করে তারাই সত্য-পরায়ণ এবং তারাই পরহেযগার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যেহেতু ইহুদী নাসারাদের নিন্দাবাদ এবং তাদের অপকর্মের শোচনীয় পরিণতি স্বরূপ দোযখের কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, তাই ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলতে লাগলো আমরা তো সঠিক পথে রয়েছি, আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ কেবলার অনুসারী, আমরা কেন দোযখে যাবো?

ইহুদী ও নাসারাদের এ অহেতুক আস্ফালনের জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ পূর্ব বা পশ্চিম দিককে কেবলা গ্রহণ করে নামায আদায় করাই মাগফেরাত লাভের জন্য যথেষ্ট নয়, আর এটিই শুধু হেদায়েত ও কল্যাণ নয়।

প্রকৃত কল্যাণ

বরং প্রকৃত কল্যাণ হলো এক আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, শেরক থেকে আত্মরক্ষা করা এবং এ জীবনের পর যখন আরেকটি জীবন আসবে, যখন এ জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে, সৎ কাজের পুরস্কার এবং মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে, এসব কথার প্রতি তথা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্ পাকের ফেরেশতাগণের প্রতি ও আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ও আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। শুধু তাই নয়, বরং আল্লাহ্ পাকের প্রতি প্রেম ভালবাসার কারণেই তাঁর রাহে অর্থ সম্পদ দান করতে হবে, এমনিভাবে সম্পদের মায়া থাকা সত্বেও আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, পথিক-মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী এবং মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে মুক্তিকামী মানুষকে সাহায্য করতে হবে। কথা এখানেই শেষ নয়; বরং সঠিক ভাবে নামায কায়েম করতে হবে, যাকাত আদায় করতে হবে, আর অঙ্গীকার করে থাকলে তা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। এমনিভাবে সুঃখে-দুঃখে, বিপদাপদে এবং রণাঙ্গনে শত্রুর মোকাবেলায় চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে। এসবই হলো মৌলিক কল্যাণকর কাজ। এসব কাজে যারা আত্মনিয়োগ করবে তারাই ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ পাকের নাফরমানীর কাজ থেকে পরহেযগারী অবলম্বনকারী। পক্ষান্তরে যারা মানব কল্যাণের এ সমস্ত মৌলিক নীতি গ্রহণ না করে আর শুধু কেবলা নিয়ে আস্ফালন করে তারা হেদায়েত লাভ থেকে হবে বঞ্চিত, তাদের মাগফেরাতের আশা সুদূর পরাহত।

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাযী (রঃ) এ আয়াত প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন যে, এ আয়াতের বক্তব্য ইহুদী ও নাসারাদের উদ্দেশে বলে যেমন তফসীরকারগণ বর্ণনা করেছেন, তেমনি কোন কোন তফসীরকারের মতে এ আয়াতে মোমেনদেরকে খেতাব করা হয়েছে। যখন বায়তুল্লাহ্ শরীফকে কেবলা বলে ঘোষণা করা হয়েছে তখন মোমেনগণ তাদের অন্তর্নিহিত আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার মুহূর্তে মনে করেছেন যে তাদের সাধনা সার্থক হয়েছে। এ পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ শুধু কেবলা নির্দিষ্ট করণের মাধ্যমেই কল্যাণ নিহিত নেই, বরং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন এবং অন্যান্য দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে প্রকৃত কল্যাণ লাভ করা যায়।[১]

এ আয়াতের তফসীরে মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করে বলেছেনঃ ইসলামের অভ্যুত্থাণের পূর্বে এ পৃথিবী গোমরাহীর অন্ধকারে

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩৫

আচ্ছন্ন ছিল। পথভ্রষ্ট মানুষ শুধু যে দেব-দেবীর পূজা করতো, স্বহস্তে নির্মিত মূর্তি পূজা করতো, পাহাড়-পর্বত, প্রস্তর খণ্ড, এমনকি বৃক্ষ-তরুলতার সম্মুখেও মাথা নত করতো তাই নয়, বরং বিভিন্ন দিকের পূজাও করা হতো। পূর্ব দিক থেকে সূর্য উদিত হয় তাই তারা সূর্যের পূজা করতো। শুধু তাই নয়; বরং পূর্ব দিকের পূজাও করতো। পবিত্র কোরআন এ আয়াত দ্বারা শেরক ও অংশীবাদের এমনি সকল পন্থার প্রতিবাদ করেছে যা মানুষকে কোপগ্রস্ত করে তোলে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ কোন্ দিকে কি কল্যাণ রয়েছে? বরং সত্য হলো কোন দিকেই তা পূর্ব হোক কি পশ্চিম- দিক হিসেবে কোন প্রকার মর্যাদার দাবীদার হতে পারেনা। এজন্যেই ইসলাম কোন দিকের প্রতিই বিশেষ কোন গুরুত্বারোপ করেনি। ইসলাম কা'বা শরীফকে সমগ্র পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু রূপে নির্দিষ্ট করেছে, তাকে কেবলা বলে ঘোষণা করেছে। আর সেই কেবলা যার জন্যে যে দিকেই হোক তা অত্যন্ত গৌণ বিষয়। যেমন কা'বা শরীফ মিশর, ত্রিপলী এবং আবিসিনিয়া থেকে পূর্ব দিকে অথচ পাকিস্তান, হিন্দুস্থান, বাংলাদেশ এবং চীন ও প্রাচ্যের অন্যান্য দেশ থেকে পশ্চিম দিকে, এমনিভাবে মদীনা শরীফ থেকে কেবলা দক্ষিণ দিকে। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, ইসলাম কোন বিশেষ দিকের প্রতি কোন গুরুত্বারোপ করেনি; বরং গুরুত্বারোপ করেছে আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান ও আনুগত্য প্রকাশের প্রতি, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের প্রতি।[১]

মূলতঃ এ আয়াতে পৌত্তলিকতার, নাস্তিকতার যত পন্থা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও পরিবেশে প্রচলিত হয়েছে সবগুলোর প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনের তথা বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে সর্ব প্রথম আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমানের উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর وَالْيَوْمِ الْآخِرِ। তথা কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের কথা বলে সেই পথভ্রষ্ট জাতির গোমরাহীর প্রতিবাদ করা হয়েছে যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, যারা একথা মনে রাখে না যে অবশেষে প্রতিটি আদম সন্তানকে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহর প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের প্রতি ঈমান ও আকীদা সম্পর্কে আলোচনার পর আমলের ব্যাপারে বিশেষ কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ যারা আল্লাহর রাহে আল্লাহরই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা সম্পূর্ণ ভাবে পালন করে তারাই সত্য-পরায়ণ। এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে ذَوِى الْقُرْبٰى বা আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ব্যয় করার তাগিদ করা হয়েছে।

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৫

ইসলাম এ অবস্থাকে আদৌ পছন্দ করেনা যে ভাই কোটিপতি হবে এবং তারই বোন দারিদ্র-প্রপীড়িত থাকবে। এজন্যে সর্বপ্রকার আত্মীয়-স্বজনকে দান করার তাগিদ করা হয়েছে। অতঃপর সমাজের এতীম, মিসকীন, অনাথ ও বিপদগ্রস্ত এবং পথিক মুসাফির ও সাধারণ সাহায্য প্রার্থীর উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির রূপ-রেখা এ আয়াতে প্রকাশিত হয়েছে। যাদের উল্লেখ এ আয়াতে করা হয়েছে, যদি তাদেরকে পবিত্র কোরআনের এ নির্দেশ মোতাবেক দান করা হয় তবে সমাজে দারিদ্র-প্রপীড়িত মানুষ দেখা যাবে না। একটি কল্যাণবাদী সমাজ গঠনের অতি সুন্দর নীল নকশা পেশ করা হয়েছে এ আয়াতে। এতদ্বারা শুধু যে দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে সাহায্যের তাগিদ করা হয়েছে তাই নয়; বরং অর্থ-সম্পদ যেন সীমিত সংখ্যক লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে সমাজ ও জাতীয় জীবনের অশান্তি ও অকল্যাণের কারণ না হয় সে ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে ঈমান ও আকীদা বিষয়ক আলোচনার পর মানুষের পরস্পরের দায়িত্ব সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে। এরপর এবাদত সম্পর্কে নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে একথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, এবাদত হলো হক্কুল্লাহ বা আল্লাহর হক্ব। এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বেই হক্কুল এবাদ সম্পর্কে তাগিদ করা হয়েছে। এতে একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে ইসলামে হক্কুল্লাহর চেয়ে হক্কুল এবাদের তাগিদ অধিকতর রয়েছে। কেননা আল্লাহ্ পাক হক্কুল্লাহ্ দয়া করে মাফ করতেও পারেন কিন্ত হক্কুল এবাদ মাফ করবেন না বলে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে এবং যার হক্ব তার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিতে হবে অথবা হক্ব আদায় করতে হবে। অথচ বর্তমান যুগে হক্কুল এবাদের প্রতি কোন গুরুত্বই দেয়া হয় না। এ সম্পর্কে গাফলত করা হয় চরম ভাবে। আলোচ্য আয়াত এ গাফলত দূর করার জন্যে যথেষ্ট।

এবাদত সম্পর্কে নামাজ এবং যাকাতের উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। কেননা এবাদত দু' প্রকার। শারীরিক ও আর্থিক। নামায দ্বারা সকল শারীরিক এবাদতের তাগিদ করা হয়েছে এবং যাকাত দ্বারা সকল আর্থিক এবাদতের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতে অতঃপর নৈতিকতার মান উন্নয়নের তাগিদ করে সর্ব প্রথম অঙ্গীকার রক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে সর্ব প্রকার অঙ্গীকারের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ অঙ্গীকার স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে হোক অথবা মানুষের সাথে মানুষের হোক তা রক্ষা করা অন্যতম প্রধান নৈতিক দায়িত্ব। কেননা মোমেনের পক্ষে মিথ্যা অঙ্গীকার করা তথা অঙ্গীকার করে তা ভঙ্গ করা আদৌ সম্ভব নয়। এমনিভাবে সুঃখ-দুঃখে, বিপদ-আপদে সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে এবং বীরত্ব ও সৎ সাহসের গুণ অর্জনের তা'লীম দেয়া হয়েছে।

মূলতঃ যাদের ঈমান-আকীদা সঠিক হয়, যারা দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে, যারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত আদায়ে তৎপর থাকে, যারা অঙ্গীকার রক্ষায় এতটুকু গাফলত করেনা, যারা বিপদ-আপদে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয় তারাই

তো ইসলামী আদর্শের কষ্টিপাথরে নিজেদেরকে খাঁটি মোমেন বলে প্রমাণ করে, তাদের সাফল্য সুনিশ্চিত। কেননা আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে তাদেরকেই খাঁটি মোমেন এবং পরহেযগার বলে ঘোষণা করেছেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তির (রঃ) এ মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন ঃ

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا

কাতাদা (রঃ) থেকে হযরত আবদুর রাজ্জাক বর্ণনা করেন, ইহুদীরা পশ্চিম দিকে তথা বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে এবং খৃষ্টানরা পূর্ব দিকে ফিরে নামায পড়তো। সে সূত্রে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাজিল করেছেন। আয়াতের মর্মার্থ হলো, ইহুদী এবং খৃষ্টান ধর্মে থাকা কোন কৃতিত্ব নয়, কারণ তাদের কেবলা-গ্রহণের নির্দেশ বাতিল হয়ে গেছে এবং তাদের ধর্ম কুফরীতে পরিণত হয়েছে।

সুতরাং সেই বাতিল করা কেবলার দিকে মুখ করে দাঁড়ানো কোন নেকীর কাজ নয়। আবার কোন কোন তফসীরকার বলেন, এ আয়াত মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে এরশাদ হয়েছে। কারণ ইসলামের প্রথম দিকে যখন সর্ব প্রকার বিধান নাযিল হওয়া শেষ হয়নি তখন যদি কেউ তৌহীদ অবলম্বন করে রসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মেনে নিতো এবং যেদিকে ইচ্ছা মুখ ফিরিয়ে নামায পড়ে নিতো তবে জান্নাত লাভের জন্যে আর কোন আমলের দরকার হতো না। অতঃপর যখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হিজরত করলেন, শরীয়তের বিধি-বিধান পালনের ক্ষেত্র প্রশস্ত হলো তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাজিল করলেন। এ আয়াতের মর্মবাণী হলো, শুধু পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে নামায পড়া নেকী নয়; বরং নেকী হলো সে সব কাজ যা আমি এখন বর্ণনা করছি।

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ

"বরং নেকী হলো তাদের জন্যে"

مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ

"যারা আল্লাহ্র উপর ঈমান এনেছে"।

আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনঃ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্তা এবং তাঁর যাবতীয় গুণাবলীর প্রতি আন্তরিক বিশ্বাস রাখা। আল্লাহ্কে সৃজনশীল বা পরিবর্তনশীলতার উর্দ্ধে তুলনাহীন মনে করা এবং তাঁর বিকল্প বা বিপরীত কোন সত্তা নেই বলে বিশ্বাস করা। আর তিনি স্বীয় গ্রন্থে নিজের যে পরিচয় ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক মনে করা।

وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ

"এবং শেষ দিনের প্রতি"

শেষ দিনের প্রতি বিশ্বাসঃ

এর অর্থ হলো কেয়ামতের দিন। কারণ কেয়ামতের দিনটিই হলো সর্বশেষ দিন। আবার এর অর্থ ব্যাপক ভাবে এই, কবরে জীবিত করার সময় থেকে নিয়ে অনন্ত কাল পর্যন্ত। এর মধ্যে হিসাবের সময়, আমল-নামা ধারণের সময়, মীযান, পুলছেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম, শাফাআত, মাগফেরাত, সওয়াব, স্থায়ী আযাব ইত্যাদি সবকিছু অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

وَالْمَلٰٓئِكَةِ

"এবং ফেরেশতাদের প্রতি"

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনঃ

একথা বিশ্বাস করতে হবে যে ফেরেশতাগণ আল্লাহ্‌র বন্দা এবং নূর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। তাদের দেহ আছে এবং আত্মাও আছে। তাদের মধ্যে কারো দু'টি করে ডানা আছে। কারো তিনটি এবং কারো চারটি ডানা রয়েছে। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ফেরেশতা জিব্রাঈল (আঃ)-কে দেখেছেন, তাঁর ছয়শত ডানা ছিল। আর একথাও বিশ্বাস করতে হবে যে, তাঁরা পানাহার করেন না, বিবাহও করেন না। তাঁদের খোরাক হলো আল্লাহ্‌র পবিত্রতা বর্ণনা করা (তাস্‌বীহ) এবং তাঁর একত্ববাদের জিকর (তাহ্‌লীল) করা। তাঁরা আল্লাহ্‌র না-ফরমানী করেন না, যা আল্লাহ্ পাক হুকুম করেন তাঁরা তাই করে থাকেন। তাঁদেরও মৃত্যু হবে এবং অন্যদের ন্যায় তাঁদেরকেও জীবিত করে আবার উত্তোলন করা হবে। এদের মধ্যে কেউবা আল্লাহ্‌র দূত নবীগণের নিকট ওহী নিয়ে আসতেন। তাঁদের আমলের বিনিময়ে তাঁরা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ করবেন এবং কম বেশী আল্লাহ্‌র নৈকট্য বা মর্যাদা লাভ করবেন। যেমন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٌ

অর্থাৎ তাঁরা আরশের মালিক আল্লাহ্‌র কাছে মর্যাদাবান। এজন্যে তাঁরা আমলের সওয়াব পেয়ে থাকেন। বেহেশ্‌ত তাদের প্রয়োজন হয় না। এমনকি দোযখের হেফাজতকারী হিসাবে থাকতেও তাদের অসুবিধা হয় না। আবার আযাবের জন্য নিয়োজিত ফেরেশতাগণও তাঁদের আমলের পূর্ণ সওয়াব পেয়ে থাকেন। এখানে এ বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, সাধারণ মোমেনগণ ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক

মর্যাদাবান নয়। কারণ সাধারণ মোমেনগণ তাদের সওয়াব এবং আমলের বিনিময়ে জান্নাত লাভ করবে কিন্তু ফেরেশতাগণ জান্নাত পাবেনা। তবে মানব জাতির মধ্যে এক বিশেষ দল অর্থাৎ নবী এবং রসূলগণ ফেরেশতাদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদাবান। কারণ এ মাটির মানুষকে যতটুকু খাছ তাজাল্লী প্রদান করা হবে তা শুধু নবীগণই লাভ করবেন। ফেরেশতাগণ এ অমূল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকবেন। কারণ তাদের সৃষ্টি মাটি থেকে হয়নি।

কিতাবের প্রতি বিশ্বাসঃ

কিতাব বলতে হয়তো সকল আসমানী কিতাব বোঝানো হয়েছে, না হয় শুধু কোরআনে পাককে বোঝানো হয়েছে। কারণ এক কোরআন পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে সকল আসমানী কিতাবকে বিশ্বাস করা হয়ে যায়। কোরআন এবং সমস্ত আসমানী কিতাব এক আল্লাহরই বাণী, এগুলো 'মখলুক' (সৃষ্ট বস্তু) নয়। এর শব্দ সমূহ এবং অর্থ উভয়ই অবিকল আল্লাহ পাকের বাণী।

নবীগণের প্রতি বিশ্বাসঃ

নবীগণের প্রতি বিশ্বাসের ব্যাপারে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন কোন নবী বিশ্বাসের আওতা থেকে বাদ না পড়েন। প্রথম নবী হলেন হযরত আদম (আঃ) এবং সর্বশেষ নবী হলেন হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের বেলায় কোন সংখ্যা যেন নির্ণয় না করা হয়। কারণ নবীর সংখ্যা কত তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যেমন আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ

"এদের মধ্যে কিছু সংখ্যকের আলোচনা আপনার নিকট করেছি এবং এদের মধ্যে কিছু (নবী) এমন রয়েছেন যাদের আলোচনা আপনার নিকট করা হয়নি"। নবীগণের মধ্যে প্রত্যেকেই ছগীরা কবীরা গুণাহ্ থেকে পবিত্র এবং সুরক্ষিত। একজন নবী অপর নবীর সাথে বিশ্বাসের দিক থেকে কোন মতভেদ রাখেন না।

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

"সম্পদ দান করে থাকে তার প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও"।

'তার প্রতি মহব্বত' অর্থাৎ আল্লাহর মহব্বতে সম্পদ দান করা। কারণ একমাত্র আল্লাহর মহব্বতে সম্পদ দান করলে তার সওয়াব আল্লাহ পাক দান করে থাকেন। অন্যথায় আল্লাহর প্রতি আসক্তি না রেখে যে-দান করা হয় সে-দানের প্রতি আল্লাহ পাকের কোন সম্পর্ক থাকে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম তিন ধরনের লোকের ফয়সালা

হবে। এর মধ্যে তৃতীয় ধরনের লোক হবে তারা, যাদেরকে আল্লাহ পাক দুনিয়াতে স্বচ্ছলতা এবং সব ধরনের সম্পদ দিয়েছেন। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে পেশ করা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবেঃ "মনে পড়ে আমি তোমাকে দুনিয়াতে অমুক অমুক নেয়ামত দান করেছিলাম। তখন সে ব্যক্তি স্বীকৃতি স্বরূপ আরজ করবে, "নিশ্চয় হে পরওয়ারদেগার! এসব নেয়ামত আমি পেয়েছিলাম"। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করবেন, "তাহলে তুমি ঐ সমস্ত থেকে আমার জন্যে কি কাজ করেছ"? সে ব্যক্তি আরজ করবে, "হে আল্লাহ! আপনার যতগুলো পথ আছে, কোন একটিকেও ছাড়িনি, আপনার সকল পথেই সম্পদ ব্যয় করেছি"। তখন হুকুম হবে, "তুমি মিথ্যা বলছো। তুমি এজন্যে ব্যয় করেছ যেন লোকে তোমাকে দানশীল বলে। অতঃপর লোকে তোমাকে দানশীল বলে ডেকেছে"। এরপর আল্লাহ পাক হুকুম করবেন, "এই লোকটিকে মুখ নীচের দিকে করে দোযখে নিক্ষেপ কর"। (মুসলিম শরীফ)

অথবা 'তার প্রতি মহব্বত থাকা অবস্থায়' অর্থাৎ সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা সত্ত্বেও সম্পদ দান করেছে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ দানের দ্বারা বেশী সওয়াব লাভ হয়ে থাকে"? এরশাদ হলো, "দান করার সময় নিজে সুস্থ থাকবে, বস্তুটির প্রয়োজন থাকবে, দারিদ্র্যের ভয় থাকবে, ধনী হওয়ার আকাংক্ষা থাকবে এবং দান করতে কোন দ্বিধা থাকবে না তখন দান করলে অধিক সওয়াব পাওয়া যাবে"। যখন রূহ কণ্ঠনালীর কাছে এসে প্রাণ বায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হবে তখন সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার গুরুত্ব নাই। কারণ মৃত্যুর পর তো সম্পদ ওয়ারিশগণ এমনিতেই পেয়ে যাবে।

এ আয়াত–لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ

(কিছুতেই নেকী লাভ করতে পারবে না যতক্ষণ না তোমাদের নিজেদের প্রিয় বস্তু থেকে ব করছো।) দ্বারাও বোঝা যায় যে 'তার প্রতি মহব্বত' অর্থাৎ সম্পদের প্রতি মহব্বত থাকা অবস্থায় দান করা বোঝানো হয়েছে।

ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

"আত্মীয়-স্বজন, এতীম, মিসকীন, মুসাফির ও আবেদনকারীকে এবং মুক্তিপণ দিয়ে মানুষকে মুক্ত করার ব্যাপারে"।

আত্মীয়-স্বজনঃ

অন্যদেরকে দান করার চেয়ে আত্মীয়-স্বজনকে দান করার মধ্যে আল্লাহ পাক অধিক সওয়াব রেখেছেন। আত্মীয়-স্বজন বলতে যার সঙ্গে বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে তাকেই বোঝাবে। যেমন স্বামী, স্ত্রী, ক্রীতদাস ইত্যাদি। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যদি তুমি একটি দীনার আল্লাহর রাহে ব্যয় কর এবং একটি দীনার মিস্কীনকে দান

করে তাহলে সবচেয়ে অধিক সওয়াব সেই দীনারের হবে যে-দীনারটি তোমার পরিবারের জন্যে ব্যয় করেছ। (–মুসলিম শরীফ)

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর স্ত্রী হযরত যয়নব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "হে স্ত্রী জাতি! গহনা বিক্রয় করে হলেও দান খয়রাত করতে থাক"। তখন হযরত যয়নব (রাঃ) এবং অন্য একজন স্ত্রীলোক আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! নিজের স্বামী এবং নিজের অধীনস্থ এতিমদেরকে যদি দান করা হয় তবে চলবে কি"? এরশাদ হলো, "এরূপ দানের মধ্যে দুটি সওয়াব। এক সওয়াব হলো আত্মীয়তা রক্ষার অপর সওয়াব হলো দান করার (বোখারী শরীফ)।

হযরত সালমান বিন আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মিসকীনকে কিছু দেয়ার মাধ্যমে দান করা হলো আর আত্মীয়-স্বজনকে কিছু দেয়া দানও হলো আবার ছেলায়ে রেহমীও (আত্মীয়তা রক্ষা) হলো। (তিরমিজী শরীফ)

এতীমঃ

সেই বালককে বলে যার পিতা তার প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মারা যায় অথবা নিখোঁজ হয়ে যায়। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "আমি এবং যারা এতীমের প্রতিপালন করে বেহেশতের মধ্যে এত নিকটে থাকবো যেমন শাহাদাত অঙ্গুলী তার পরবর্তী অঙ্গুলীর কাছে থাকে"।[১] (বোখারী শরীফ)

মিসকীন এবং মুসাফিরঃ

মিসকীন ঐ ব্যক্তিকে বলে যে সে পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় যদ্বারা খাদ্য, পানীয়, পরিধেয় ও বিছানার বস্ত্র এবং বাস করার স্থান সংগ্রহ করা চলে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সে সব লোকেরাই শুধু মিসকীন নয় যারা শুধু চেয়ে বেড়ায় এবং দু' একটি খেজুর ও দু' এক লোক্‌মা রুটি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়; বরং তারাও মিসকীন যাদের কাছে সে পরিমাণ অর্থ না থাকে যার দ্বারা সকল প্রয়োজন মেটাতে পারে। আর তারা নিজেদের অবস্থা এমন বানিয়ে রাখবে না যা কিছু পাওয়ার জন্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মুসাফির বলতে এখানে সেই মুসাফিরকে বলা হয়েছে যার কাছে সফরের খরচ নেই। এ ধরনের মুসাফিরকে সেই পরিমান দান করা উচিত যাতে সে নির্বিঘ্নে দেশে ফিরে যেতে পারে।[২]

---

(১) তফসীর মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৭–৩০৩

(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫

আবেদনকারী ঃ

আবেদনকারী ('সায়েল' বা ভিক্ষুক) সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করে মানুষের কাছে কিছু চেয়ে থাকে। এদেরকেও দান করা উচিত।[১] হযরত হুসাইন এবনে আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ আবেদনকারীর (কিছু পাওয়ার) হক্ব আছে যদিও সে নিজের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসে।[২] (আবু দাউদ)

সালেম বিন আবিল জা'দ থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেনঃ আবেদনকারীর (পাওয়ার) হক্ব আছে যদিও সে তোমার কাছে এমন ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে আসে যার 'হালকা' (ঘেরা) রৌপ্য দ্বারা নির্মিত থাকে (আহ্‌মদ)।[৩] মূল কথা এই, আবেদনকারী ধনী হওয়ার কারণে সওয়াল করা তার জন্যে হারাম হলেও তাকে দান করা জরুরী।

মুক্তিপণ ঃ

যদি কোন ক্রীতদাস এবং মালিকের মধ্যে এমন লিখিত চুক্তি হয় যে, এই পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রীতদাস মুক্ত হবে। অতঃপর ক্রীতদাস সে পরিমাণ অর্থের সংস্থান করতে না পারলে সেখানে দান করে মানুষকে মুক্ত করা।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ
الْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ
بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ وَلَكُمْ
فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

তরজমা

(১৭৮) হে মোমেনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি কেসাসের বিধান অবশ্য কর্তব্য হলো। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, গোলামের পরিবর্তে গোলাম, নারীর

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৩
(৩) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৫

পরিবর্তে নারী, যদি কেউ তার ভ্রাতার তরফ থেকে ক্ষমা পায় তবে তা ন্যায়সঙ্গতভাবে অনুসরণ করবে এবং সৎ ভাবে তা পরিশোধ করবে, এটি তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজতর ব্যবস্থা এবং রহমত। এরপর যে ব্যক্তি সীমা লংঘন করবে তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

(১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাস ব্যবস্থায় তোমাদের জন্যে রয়েছে সত্যিই জীবন– যেন তোমরা সাবধান হতে পার।

তফসীরুল কোরআন

'কেসাস' অর্থ হলো সমান, অনুরূপ। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির সাথে ঐরূপ ব্যবহার করা যেরূপ সে নিজেও ইতোপূর্বে করেছে। যদি হত্যা করে থাকে তবে হত্যা করা, যদি হাত কেটে থাকে তবে হাত কাটা, যদি কারো পা কেটে থাকে তবে তারও পা কাটা ইত্যাদি। কেসাস ঐ সকল নিহত ব্যক্তিদের ব্যাপারে ফরয করা হয়েছে যাদেরকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে। আযাদ ব্যক্তি নিহত হয়ে থাকলে তার বদলে আযাদ ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে, দাসের পরিবর্তে দাস এবং স্ত্রীলোকের পরিবর্তে স্ত্রীলোককে হত্যা করা হবে। তবে যদি কেসাসের দাবীদার ব্যক্তি হত্যাকারীকে কিছুটা মাফ করে দেয় এবং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের মধ্য থেকে কেউ যদি হত্যাকারীকে মাফ করে দেয় তবে উভয় পক্ষের এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে ক্ষতিপূরণ দাবীকারী যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে দাবী করে এবং হত্যাকারী খুশী মনে সুষ্ঠু আচরণের সাথে ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দেয়।[১]

শানে নজুল

এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে ইমাম রাযী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন, এ আয়াত নাজিল হওয়ার কারণ ছিল ঃ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যে-সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রচলিত ছিল তা দূর করা। কেননা তখন ইহুদীরা হত্যার বদলে হত্যা করাকে অবশ্য কর্তব্য মনে করতো। পক্ষান্তরে, খৃষ্টানরা হত্যাকারীকে ক্ষমা করা অবশ্য কর্তব্য মনে করতো। আর যারা পৌত্তলিক ছিল তারা কখনো হত্যাকারীকে হত্যা করা অবশ্য কর্তব্য মনে করতো আর কখনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণকে কর্তব্য মনে করতো।

এরা সর্বদা সীমা লংঘন করতে সিদ্ধ হস্ত ছিল। যে-দু' গোত্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ড হতো তাদের একদল যদি মর্যাদা সম্পন্ন বা শক্তিশালী হতো তবে দুর্বল লোকদের প্রতি জুলুম করা হতো চরমভাবে। তাদেরকে বলা হতো, "আমাদের গোলামের বদলে

(১) কাশফুর রহমান খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২

তোমাদের আযাদকে হত্যা করবো, আমাদের স্ত্রীলোকের হত্যার বদলে তোমাদের পুরুষকে হত্যা করবো, আর আমাদের একজন পুরুষ হত্যা করলে তোমাদের দু'জন পুরুষ হত্যা করবো"। এমনকি তাদের কোন লোককে যখম করলে তারা তার দ্বিগুণ যখম করতো। এমন পরিস্থিতিতে এ আয়াত নাজিল হলো এবং মানুষের সত্যিকার মর্যাদা সুনিশ্চিত হলো। পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলো যে, হত্যার বদলে হত্যা অবশ্যই হবে, তবে তা ইনসাফ-ভিত্তিক হতে হবে। কোন প্রকার জুলুম অত্যাচারের পন্থা গ্রহণের অনুমতি দেয়া যাবে না। যা ন্যায় বা সুবিচার তাই কায়েম হতে হবে।[১] যদি হত্যাকারীকে মাফ করা হয় অথবা হত্যার জন্যে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করে ছেড়ে দেয়া সমীচীন মনে করা হয় তবে তা-ও করা যাবে। হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে যে মানবিক ঘোষণা করা হলো তারপরও যদি কেউ এ পর্যায়ে সীমা লংঘন করে তবে তার জন্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

অর্থাৎ তার জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এ আয়াতের শানে নজুল সম্পর্কে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ জাহেলী যুগে বনু কোরায়যা এবং বনু নযীরের মধ্যে এক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে বনু নযীর জয়লাভ করে। এরপর থেকে এই প্রচলন হয়ে পড়ে যে, বনু নযীরের কেউ বনু কোরায়যার কাউকে হত্যা করলে তার বদলে কোন হত্যা করা হতো না; বরং এক শত ওয়াসেক খেজুর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ প্রদান করা হতো। আর যখন বনু কোরায়যার কেউ বনু নযীরের কোন ব্যক্তিকে হত্যা করতো তখন কেসাস স্বরূপ বনু কোরায়যার লোককে হত্যা করা হতো। আর ক্ষতিপূরণ নেয়া হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ দুইশত ওয়াসেক খেজুর নেয়া হতো। এরপর আল্লাহ পাক এ আয়াতের দ্বারা জাহেলী যুগের নিয়মকে দূর করে ইনসাফের নির্দেশ প্রদান করেন। আবু হাতেমের বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতের শানে নুযুল হলো– আরবের দু' গোত্রের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর তারা পরস্পর কেসাস নেয়ার সুযোগ খুঁজতে লাগলো। প্রত্যেক গোত্র দাবী করতে লাগলো যে তাদের দাস নিহত হওয়ার দরুণ অপর গোত্রের আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। অতঃপর এ সবকিছুর প্রতিবাদ করে এ আয়াত নাজিল হয় এবং জাহেলী যুগের দাবী বাতিল ঘোষণা করা হয়। পবিত্র কোরআন নির্দেশ করছে ঃ

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

অর্থাৎ প্রত্যেক হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। আযাদ হত্যাকারী যদি দাসকে হত্যা করে থাকে তবু আযাদ হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। অনুরূপভাবে দাস

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৬

হত্যাকারী যদি আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করে তবু দাসকে হত্যা করা হবে। আবার পুরুষ যদি স্ত্রীলোককে হত্যা করে অথবা স্ত্রীলোক যদি পুরুষকে হত্যা করে তবে হত্যাকারীকেই হত্যা করা হবে। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এরা স্ত্রীলোকের কেসাস স্বরূপ পুরুষকে হত্যা করতো না যার দরুণ

النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ

("প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ") নাজিল হয়। সুতরাং আযাদ ব্যক্তি সবাই সমান। প্রাণের বদলে প্রাণ সংহার করা হবে সে হত্যাকারী পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক। অনুরূপভাবে নিহত ব্যক্তি পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক যখন একজন আযাদ ব্যক্তি অপর একজন আযাদ ব্যক্তিকে হত্যা করেছে তখন হত্যাকারীকেই হত্যা করে ফেলতে হবে। অনুরূপ নির্দেশ দাস এবং দাসীদের ক্ষেত্রেও বহাল থাকবে। মোট কথা, যে কেউ হত্যার উদ্দেশে কাউকে হত্যা করবে তাকে কেসাস স্বরূপ হত্যা করা হবে। হত্যার মত জখম এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হানি করার নির্দেশও একই প্রকার।[১]

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর এক হওয়া এবং আমার রসূল হওয়াকে স্বীকার করে সাক্ষ্য দিয়েছে তাকে তিনটি কারণ ব্যতীত হত্যা করা জায়েয নয়। প্রথমতঃ যদি সে কাউকে হত্যা করে থাকে তবে কেসাস স্বরূপ তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হবে। দ্বিতীয়তঃ সে যদি বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও যেনা করে। তৃতীয়তঃ যদি সে ইসলাম থেকে ধর্মান্তরিত হয়।[২] (বোখারী শরীফ)

কয়েক ব্যক্তি দ্বারা এক ব্যক্তি নিহত হওয়াঃ

হযরত সাঈদ এবনে মুসাইয়্যেব (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি 'সান্‌আ' শহরে নিহত হয়, খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) তার বদলে সাত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন এবং বলেন, যদি এ হত্যাকাণ্ডে 'সানআ' শহরের সমস্ত লোক অংশ গ্রহণ করতো তবে আমি সকলকে প্রাণদণ্ড দিতাম। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম মালেক (রঃ) তাঁর মুআত্তায় এবং ইমাম মালেক (রঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী (রঃ)। ইমাম মালেক (রঃ) এই হাদীসকে অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

এক ব্যক্তি দ্বারা কয়েক ব্যক্তি নিহত হওয়া ঃ

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ) বলেন, এ অবস্থায় কেসাস ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যদি সে

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৬

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩০৮–৩০৯

একাধিক ব্যক্তিকে একজনের পর একজন হত্যা করে তবে প্রথম নিহত ব্যক্তির বদলে তাকে হত্যা করা হবে এবং অবশিষ্ট নিহত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের বদলে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। আর যদি একের পর এক না করে, একসঙ্গে সবাইকে হত্যা করে তবে নিহতদের ওয়ারিশদের মধ্যে ভাগ্য-পরীক্ষা হবে। যে-ওয়ারিশ ভাগ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তার নিহত ব্যক্তির বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে এবং অবশিষ্ট ওয়ারিশদের নিহত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের পরিবর্তে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে।

অনিচ্ছাকৃত হত্যা

এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, অনিচ্ছাকৃত হত্যার শাস্তি কেসাস নয়। কেসাস শুধুমাত্র ইচ্ছাকৃত হত্যার জন্য। 'ইচ্ছাকৃত হত্যা'র ব্যাখ্যায় কিছুটা মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেন, জেনে বুঝে কোন অস্ত্র, ধারালো কাঠ বা পাথর অথবা আগুণ দ্বারা হত্যা করাকে 'ইচ্ছাকৃত হত্যা' বলা হয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছাড়া এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, বস্তুটি ধারালো না হলেও যদি তা দিয়ে জেনে বুঝে হত্যা করা হয় তবে তার দরুণ কেসাস কার্যকর হবে। প্রমাণ স্বরূপ বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে। হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ইহুদী ব্যক্তি এক স্ত্রীলোকের মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেতলে হত্যা করে ফেলে। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ লোকটির মাথাও দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে থেতলে দেন।

ধারহীন ভারী বস্তু দিয়ে হত্যার দরুণ ইমাম আবু হানিফা (রঃ) কিছুতেই কেসাসের পক্ষপাতী নন। প্রমাণ স্বরূপ হযরত আলী (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখযোগ্য। হযরত আলী (রঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ লৌহ ছাড়া অন্য কোন বস্তু দ্বারা হত্যা করলে তার দরুণ কেসাস হবে না।[১]

وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ

অর্থাৎ "কেসাসের বিধান প্রবর্তনের মধ্যে হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের জন্যে রয়েছে জীবন"।

এর তাৎপর্য এই, যে ব্যক্তি হত্যাকারী হতে চায় সে যখন এ সত্য উপলব্ধি করবে যে আমাকেও হত্যা করা হবে তখন সে হত্যাকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। আর এ অর্থে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তোমাদের জন্যে কেসাসের বিধানে রয়েছে জীবন। এমনিভাবে যাকে হত্যা করার ইচ্ছা তার পক্ষেও কেসাসের বিধানে রয়েছে জীবন। অর্থাৎ যখন হত্যাকারী কেসাসের বিধানের কথা মনে করবে তখন হত্যা থেকে বিরত থাকবে। আর তখন একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে যে, কেসাসের বিধান প্রবর্তনেই রয়েছে জীবন।[২]

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩১৩-৩১৪

(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৫৬।

মূলত ঃ কেসাসের বিধানের মধ্যে রয়েছে ন্যায় বিচার ও সাম্যের নিশ্চয়তা। ইসলাম মানবতার উৎকর্ষ সাধনের তা'লীম দেয়। একে অন্যের প্রতি জুলুম অত্যাচার নিঃসন্দেহে মানবতা বিরোধী কাজ। তাই ইসলাম এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا –(সূরা মায়েদা)

"যে কেউ অন্য কারো জীবনের বিনিময়ে অথবা পৃথিবীতে ভীষণ গোলযোগ ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করে সে যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীকে হত্যা করলো"।

আর এজন্যেই হত্যা, খুন-জখমের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে কেসাসের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। যেন মানুষ হত্যার শোচনীয় পরিণামের কথা মনে করে নিজেকে এমন অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।

كُتِبَ
عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖ الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾
فَمَنْۢ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَاۤ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا
فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾

তরজমা

(১৮০) তোমাদের মধ্যে কারো যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, যদি সে কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে যায় তবে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে নিয়মিত ভাবে অছিয়ত করার বিধান তোমাদেরকে প্রদান করা হলো। মুত্তাকী বা পরহেযগার লোকদের এটি অবশ্য কর্তব্য।

(১৮১) অতঃপর যে কেউ তা শ্রবণের পরও অছিয়ত পরিবর্তন করে তবে অছিয়ত পরিবর্তন কারীদের উপরই তার পাপ বর্তাবে। আল্লাহ্ পাক সর্ব-শ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(১৮২) তবে যদি কেউ অছিয়তকারী সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব বা পাপের আংশকা করে অতঃপর সে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয় তবে তাতে তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব করুণাময়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মৃত ব্যক্তির প্রাণের বদলা সম্পর্কে নির্দেশ ছিল, আর এ আয়াতে মৃত ব্যক্তির অর্থ-সম্পদ সম্পর্কে বিধান পেশ করা হচ্ছে।[১]

আল্লামা আবদুল হক (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে হক্কানীতে পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্কের বিবরণ এভাবে দিয়েছেন ঃ পূর্ববর্তী আয়াতে 'কতল' বা হত্যা সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে, আর তার পরবর্তী এ আয়াতে অছিয়তের আলোচনা রয়েছে। কেননা অর্থ-সম্পদ থাকা সত্বেও আত্মীয়-স্বজনকে তা থেকে মাহ্রূম করা যেন তাদেরকে হত্যা করা, তাই হত্যার বদলে কেসাসের বর্ণনার পর অসিয়তের আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।[২]

তফসীকারগণ লিখেছেন, আরবে পূর্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী এবং তার সন্তান-সন্ততি এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তার পুত্র-সন্তানগণই শুধু উত্তরাধিকারী বিবেচিত হতো। তার অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন এমনকি পিতা-মাতা পর্যন্ত পরিত্যক্ত সম্পদের কোন কিছুরই মালিক হতো না। এত নিকটাত্মীয় হওয়া সত্বেও তারা হতো মৃত ব্যক্তির অর্থ সম্পদ থেকে বঞ্চিত। তাই আলোচ্য আয়াতে পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ-সম্পদ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, 'মীরাছ' সম্পর্কে যে নির্দেশ সূরায়ে নেছায় অবতীর্ণ হয়েছে তার পূর্ব পর্যন্ত এ আয়াত মোতাবেক অছিয়ত করা মৃত্যু-পথের যাত্রী ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য ছিল। 'মীরাছ' সম্পর্কীয় আয়াতে ওয়ারিশদের হক্ব বা অধিকার নির্দিষ্ট হওয়ার পর অছিয়তের এ নির্দেশ পালন করা স্বাভাবিক কারণে আর ফরয রইল না। তবে 'মোস্তাহাব হিসেবে' আজও বর্তমান রয়েছে। এ পর্যায়ে তফসীরকারগণ অছিয়তের কয়েকটি স্তর নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন।

(১) অছিয়ত ওয়াজিব বা অবশ্য কর্তব্য ঃ

মৃত ব্যক্তির কাছে যদি কারো আমানত থাকে অথবা মৃত ব্যক্তি যদি ঋণগ্রস্ত থাকে তা আদায়ের অছিয়ত করা। এমনিভাবে হক্কুল্লাহ তথা যাকাত, মানত, কাফ্ফারা, ফেদিয়া প্রভৃতি বিষয়ে অছিয়ত করা।

(১) ফাওয়াদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৩৫
(২) তফসীরে হক্কানী পারা ২, পৃষ্ঠা ৪০

(২) অছিয়ত মোস্তাহাব ঃ

কোন আত্মীয়-স্বজন যদি উত্তরাধিকার লাভ না করে তার জন্যে অছিয়ত করা (যা এক তৃতীয়াংশের অধিক কোন অবস্থাতেই হবে না) অথবা কোন কল্যাণকর কাজের জন্যে অছিয়ত করা।

(৩) অছিয়ত বৈধ ঃ

কোন বৈধ কাজের জন্যে অছিয়ত করা অথবা কোন জিম্মির মুক্তিপণ পরিশোধের জন্যে অছিয়ত করা।

(৪) অপছন্দনীয় অছিয়ত ঃ

এমন কোন ব্যক্তির অছিয়ত করা যার সম্পদ খুবই সামান্য অথবা একজন আত্মীয়কে বেশী দেয়া এবং অন্যকে বঞ্চিত করা।

(৫) যে অছিয়ত কার্যকর হবে না ঃ

এক তৃতীয়াংশের অধিক সম্পদের জন্যে অছিয়ত করা। এমনি অছিয়তের বাস্তবায়ন শুধু অন্য ওয়ারিশদের সন্তুষ্টির উপর ন্যস্ত থাকবে। অর্থাৎ অন্য ওয়ারিশগণের সন্তুষ্টির প্রেক্ষিতেই এমনি অছিয়ত কার্যকর হবে।

(৬) অবৈধ অছিয়ত ঃ

অর্থাৎ কোন কাফেরের জন্যে অছিয়ত করা অথবা কোন অবৈধ কাজের জন্য অছিয়ত করা।

অতএব, অছিয়তের নিয়ম হলো, মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফনের পর তার কোন দেনা ও দায়িত্ব থাকলে তা আদায়ের পর উত্তরাধিকার বিতরণের পূর্বে এক তৃতীয়াংশের অধিকতর সম্পদের জন্যে অছিয়ত করা হলে ওয়ারিশদের সন্তুষ্টি পূর্বশর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হবে।[১]

إِنْ تَرَكَ خَيْرًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ শব্দটির অর্থ ধন-সম্পদ বলেছেন। কেননা কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন ঃ

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ

এ আয়াতে শব্দটি অর্থ সম্পদের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এমনিভাবে আরো এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ

এ আয়াতেও خير অর্থ ধন-সম্পদ।

তবে সম্পদ মাত্রকেই خير বলা হয়না; বরং অধিক পরিমাণ সম্পদ হলে তাকে خير বলা হয়। যেমন হযরত আলী (রাঃ) তাঁর আযাদ করা গোলামকে অসুস্থ অবস্থায়

(১) খোলাসাতুত তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৬

দেখতে যান। সে তখন অছিয়তের ইচ্ছা করে। হযরত আলী (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার সম্পদ কি আছে"? সে বললো, "আমার নিকট সাতশ' দেরহাম বা ছয়শ' দেরহাম রয়েছে। আমি কি আমার এই সম্পদের অছিয়ত করবো না"? তিনি বললেন, "না"। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرَ

"আর خير সামান্য সম্পদকে বলা হয় না। অতএব, তোমার যা-কিছু আছে তা ওয়ারিশদের জন্যে রেখে যাও"।

এমনিভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো, "আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কিছু অছিয়ত করতে চাই"। তিনি বললেন, "তোমার কি সম্পদ আছে"? সে বললো, "তিন হাজার"। হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, "তোমার পরিবারভুক্ত লোক কয়জন?" সে বললো, "চারজন"। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنْ تَرَكَ خَيْرَ

অর্থাৎ যার অধিক পরিমাণ সম্পদ থাকে। অথচ তোমার সম্পদ অতি সামান্য। অতএব যা আছে তা তোমার সন্তান-সন্ততির জন্যে রেখে যাও আর তাই হবে উত্তম।[১]

بِالْمَعْرُوْفِ ج حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ

অর্থাৎ অছিয়ত হতে হবে নিয়ম মাফিক তথা সুবিচার ভিত্তিক, যেন অছিয়তের কারণে কারো প্রতি জুলুম না করা হয়।

فَمَنْ بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ

অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির অছিয়তের কথা শ্রবণের পরও যদি কেউ তার মধ্যে পরিবর্তন করে তবে পরিবর্তনকারীর উপরই তার দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। এজন্যে অছিয়তকারীর কোন দায়িত্ব থাকবে না।

اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্ব-জ্ঞাত। অর্থাৎ অছিয়তকারী কি বলেছে আল্লাহ্ পাক শ্রবণ করেছেন এবং পরিবর্তনকারী যা কিছু করেছে সে সম্পর্কে তিনি ওয়াকেফহাল। তাঁর নিকট কোন কিছুই গোপন নেই।

---

(১) তফসীরে রূহুল মা'আনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫২

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ

যারা অছিয়ত পরিবর্তন করে তথা অছিয়ত মোতাবেক আমল না করে তাদের পরিণাম সম্পর্কে পূর্বের আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ আয়াতে অছিয়তের পরিবর্তনের একটি বৈধ পন্থা সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে, যদি কেউ এমন আশংকা করে যে মরণোন্মুখ ব্যক্তি অছিয়তের ব্যাপারে ভুল করতে পারে তথা ইসলামী শরীয়ত অছিয়তের ব্যাপারে যে বিধান পেশ করেছে তা ভুলক্রমে লংঘন করতে পারে অথবা কারো প্রতি অন্যায় ভাবে পক্ষপাতিত্ব করতে পারে, এতে পরস্পরের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্বেরও আশংকা থাকে, এমনি অবস্থায় যাদের জন্যে অছিয়ত করা হয়েছে তার মধ্যে এবং ওয়ারিশদের মধ্যে ন্যায়-নীতির ভিত্তিতে শরীয়ত মোতাবেক যদি একটা মীমাংসা করে দেয়া যায় তবে তাতে কোন গুনাহ্ নেই। অছিয়ত সম্পর্কে পরিবর্তন অনুমোদিত এবং বৈধ। এজন্যেই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিতান্ত সংশোধনের লক্ষ্যে সকলকে অন্যায় থেকে রক্ষা করলো তার প্রতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম করুণা, ক্ষমা এবং মাগফেরাত ও রহমত রয়েছে, এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এভাবে যে ব্যক্তি অসিয়ত করে এবং অছিয়তের ভুল করার পর তা সংশোধন করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেও আল্লাহ্ পাকের রহমত এবং মাগফেরাত লাভে ধন্য হয়।

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) তাঁর তফসীরে একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– "মানুষ সত্তর বছর যাবত নেক আমল করে আর অছিয়তের ব্যাপারে জুলুম করে ফলে মন্দ কাজের উপর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আর এ কারণে সে দোযখবাসী হয়। পক্ষান্তরে কোন কোন লোক সত্তর বছর যাবত মন্দ কাজে লিপ্ত থাকে কিন্তু অছিয়তের ব্যাপারে সে ন্যায় বিচার কায়েম করে। আর তার শেষ আমল ভাল হওয়ার কারণে সে জান্নাত বাসী হয়"।

অতঃপর হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, যদি তোমরা চাও তবে কোরআনে করীমের এ আয়াত পাঠ কর–

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا

অর্থাৎ এগুলো হলো আল্লাহ্ পাকের সীমারেখা। এ সীমারেখা লংঘন করোনা।[১]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۚ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِيْنَ
يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهٗ ۚ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

তরজমা

(১৮৩) হে মোমেনগণ! তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরজ ছিল, হয়তো তোমরা পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

(১৮৪) গণনার কয়েকটি দিন মাত্র, তবে যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ বা মুসাফির হয় তবে তার জন্যে এ ব্যবস্থা, পরবর্তী কোন সময় এ সংখ্যা পূর্ণ করবে এবং যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম (কিন্তু কষ্টের কারণে রাখে না) তার জন্যে এক মিসকীনকে ভোজন দান করতে হবে। অতঃপর যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সৎ কাজ করে তার জন্যে তা উত্তম এবং রোজা রাখাই তোমাদের জন্যে কল্যাণকর কাজ, যদি তোমরা বুঝতে পার।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে কেসাস এবং অসিয়ত সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যা এ পার্থিব জীবনের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আলোচ্য আয়াতে চিরস্থায়ী জীবনের সাফল্য লাভে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার কর্মসূচী পেশ করা হয়েছে।[১]

রোজা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম

মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। এ গুরুত্বপূর্ণ বিধান আদি পিতা হযরত আদম (আঃ)-এর সময় থেকেই প্রবর্তিত এবং প্রচলিত রয়েছে।

(১) তফসীরে হক্কানী পারা ২, পৃষ্ঠা ৪১

মানব জীবনকে পূতঃ পবিত্র করে গড়ে তোলার অত্যন্ত কার্যকর পন্থা হলো মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা। একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ্ পাকের রহমতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। মানুষকে বেহেশ্তী সওগাত লাভের উপযুক্ত করে দেয়।

সওম শব্দের অর্থ

"সওম" শব্দের আভিধাণিক অর্থ বিরত থাকা। আর ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার এবং পাপাচার পরিহার করার নামই সওম বা রোজা। পবিত্রতা অর্জনের তথা আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এক দুর্লভ সুযোগ এনে দেয় মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মাহে রমজান সম্পর্কে বিশেষ তাগিদ করেছেন।

সিয়াম সাধনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মানুষের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি রয়েছে, যে কু-প্রবৃত্তি মানুষকে অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে, কু-প্রবৃত্তির এ তাড়না থেকে আত্মরক্ষার তথা আত্মশুদ্ধি লাভের এবং উন্নততর আদর্শের অনুসারী হওয়ার উদ্দেশেই রমজানের রোজা ব্রত পালনের এ বিধান পেশ করা হয়েছে। মোট কথা মানুষ যেন কুপ্রবৃত্তিকে দমন করতে পারে, শরীয়তের বিধান পালন করতে পারে এবং যাবতীয় অকল্যাণকর কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতের যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে– এ উদ্দেশেই মাহে রমজানের সিয়াম বিধান প্রবর্তিত হয়েছে।

মাহে রমজানের রোজার গুরুত্ব কত বেশী তার যথার্থ উপলব্ধির জন্যে একখানি হাদীস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ وَاَنَا اَجْزِىْ بِهٖ

অর্থাৎ "রোজা আমার জন্যে আর আমিই এর প্রতিদান দেব"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমিই এর প্রতিদান তথা আমার সন্তুষ্টি লাভই হবে এর সত্যিকার প্রতিদান, যা রোজাদার লাভ করবে। আল্লামা আবু ওবায়েদ (রঃ) লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ রোজাকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ পাকের সাথে সম্পর্কিত করার কারণ এই, অন্যান্য এবাদতে লোক দেখানোর সম্ভবনা থাকে কিন্তু রোজায় এ সম্ভাবনা নেই। রোজা শুধু আল্লাহ্ পাকের জন্যেই হয়।

দ্বিতীয়তঃ এই হাদীসের অন্য একটি অর্থ এই, অন্যান্য এবাদতের সওয়াব নির্ধারিত রয়েছে আর তা পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু রোজার ফজিলত নির্ধারিত হয়নি, আল্লাহ্ পাক এর সওয়াব দান করবেন।

তৃতীয়তঃ অথবা এই হাদীসের ব্যাখ্যা হলো ঃ

اَحَبُّ الْعِبَادَاتِ اِلَىَّ اَلصَّوْمُ

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে প্রিয় বন্দেগী হলো রোজা।

চতুর্থতঃ কোন কোন মোহাদ্দেস এই হাদীসের এ ব্যাখ্যাও করেছেনঃ

اَلصَّوْمُ لِىْ اَىْ اَلصَّوْمُ مُوَافِقَةٌ لِصِفَاتِىْ

অর্থাৎ রোজা আমার গুণাবলীর অনুরূপ। কেননা আল্লাহ পাক পানাহার ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজন থেকে মুক্ত ও পবিত্র। রোজাদারও ক্ষণিকের জন্যে এ গুণটি অর্জনে সচেষ্ট হয়।

পঞ্চমতঃ এই হাদীসের এ অর্থও হতে পারে যে, রোজা বন্দাকে আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ এনে দেয়। এই হাদীস দ্বারা রোজার অপরিসীম ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। রমজানের রোজার মাধ্যমে মানুষকে লোভ-লালসা, হিংসা প্রভৃতি অন্যায় আচরণ পরিহার করার এবং অতি মানবের জীবনের দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তাই রমজানের রোজার এমনি গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমজানের রোজার গুরুত্ব ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে ভাষণ দান করেছেন।

সিয়াম সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে প্রিয়নবী (সঃ)-এর মহান বাণী

সিয়াম সাধনার তাৎপর্য সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে হলে হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) বর্ণিত এই হাদীসের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। তিনি বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম শা'বানের ২৯ তারিখে এক ভাষণ দান করেন। তাতে তিনি এরশাদ করেন ঃ হে লোক সকল! একটি বরকতময় মাস তোমাদের দ্বারে সমুপস্থিত।

এ মাসে এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাত রয়েছে যে রাতের এবাদত হাজার মাসের এবাদতের চেয়েও উত্তম। আল্লাহ পাক এ মাসের রোজা ফরজ করেছেন। এ মাসের রাতে বন্দেগী করা অতি সওয়াবের কাজ। এ মাসে কেউ যদি কোন নফল এবাদত করে তবে তার সওয়াব বা শুভ পরিণতি হবে অন্য মাসের ফরজের সমতুল্য। আর এ মাসে একটি ফরজের সওয়াব অন্যান্য মাসের সত্তরটি ফরজের সমতুল্য।

এ মাস সবর বা ধৈর্যের, আর ধৈর্যের প্রতিদান হলো বেহেশ্‌ত। এ মাস পরস্পরের মধ্যে সদ্ব্যবহার করার ও সকলের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের। এ মাসে মোমেনের রিয্‌ক বৃদ্ধি করে দেয়া হয়। যে ব্যক্তি কোন রোজাদারকে ইফতার করাবে তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে দোযখ থেকে নাজাত দেয়া হবে। এতে (ইফতারকারী) রোজাদারের সওয়াবের কোন কমতি হয় না। উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ

ইয়া রসূলাল্লাহ! সকলে রোজাদারকে ইফতার করাবার সামর্থ রাখে না, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, শুধুমাত্র একটি খেজুর বা একটু দগ্ধ বা পানি দ্বারা ইফতার করানোই যথেষ্ট হবে।

এ মাহে রমজানের প্রথম দশ দিন রহমতের, দ্বিতীয় দশ দিন মাগফেরাতের, আর তৃতীয় দশ দিন হলো দোযখ থেকে নাজাত লাভের। যে ব্যক্তি তার অধীনস্থ লোকদের প্রতি সদয় ব্যবহার করে তার গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়।

মাহে রমজানের করণীয় কাজ

এ মাহে রমজানে চারটি কাজ অবশ্য করণীয়। দুটি কাজ তো এমন যে তার দ্বারা তোমাদের পরওয়ারদেগার সন্তুষ্ট হন, আর অবশিষ্ট দুটি এমন যা ছাড়া তোমাদের কোন গত্যন্তর নেই। এ চারটির মধ্যে একটি কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করা, আর দ্বিতীয়টি হলো অধিক পরিমাণে এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ দুটি কাজ আল্লাহ্ পাকের দরবারে অতি পছন্দনীয় আর তৃতীয় ও চতুর্থ হলো জান্নাতের আশা করা ও দোযখ থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা করা। এ দুটি এমন বিষয় যা তোমাদের জন্যে একান্ত জরুরী। রোজাদারকে কেয়ামতের দিন আমার হাউজ থেকে পানি পান করানো হবে এরপর জান্নাতে প্রবেশ করা পর্যন্ত সে আর কখনও পিপাসা অনুভব করবে না। (এবনে খোজাযমা)

রমজানের সিয়াম সাধনা হলো সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের সাধনা। এতে লোক দেখানোর অহেতুক অভিলাষ থাকেনা, এক আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হয় রোজাদারের একটানা সিয়াম সাধনা। তাই আল্লাহ পাকের দরবারে এর এতো মর্তবা। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, রমজানের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত এবং জাহান্নামের দ্বার বন্ধ করে দেন। দুবৃত্ত শয়তানদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করে রাখেন।

প্রশ্ন হতে পারে এই পবিত্র রমজানেরও যে শয়তানী কাজ হতে দেখি? ওলামায়ে কেরাম এর জবাব দিয়েছেন ঃ রৌদ্র তাপে অথবা আগুনে উত্তপ্ত প্রস্তর খণ্ড রৌদ্র ও আগুনের অবর্তমানেও অনেক সময় পর্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, তেমনি বছরের ১১টি মাস যারা পাপাচারে লিপ্ত থাকে শয়তানকে বন্দী করলেও তাদের অপকর্ম-বন্ধ হয় না। বস্তুত যারা শয়তানের অশ্বে পরিণত হয় শয়তান বন্দী হলেও তাদের শয়তানী কাজ অব্যাহত থাকা অতি স্বাভাবিক।

বস্তুতঃ রোজার মর্যাদা অপরিসীম। যারা আল্লাহ্ পাকের প্রেম ভালবাসায় মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা হয়ে রোজা ব্রত পালন করেন তারা এর যথার্থ মাহাত্ম উপলব্ধি করেন, রমজানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাদের হৃদয় মন আনন্দে পরিতৃপ্তিতে ভরে ওঠে, তারা পরম করুণাময়, প্রেমময় আল্লাহ্ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকেন।

রোজার স্তর সমূহ

ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ এহইয়াউল উলুমে রোজার তিনটি স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন ঃ

১. পরম প্রিয়তম আল্লাহ্ পাকের প্রেমে বিভোর ও তন্ময় থেকে সোবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, কামাচার এবং সকল প্রকার পাপাচার থেকে সম্পূর্ণ রূপে বিরত হওয়াই হলো প্রকৃত রোজা।

২. পানাহার, কামাচার এবং যাবতীয় পাপাচার পরিহার করা।

৩. শুধু পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকা, আর এটি রোজার সর্ব নিম্ন স্তর।

মানুষের মধ্যে যে পশু-প্রবৃত্তি রয়েছে, যে কুপ্রবৃত্তি মানুষকে অন্যায় অনাচারে ব্যাপৃত করে, সেই পশু-প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে মুক্তি লাভ করার তথা আত্ম সংশোধন করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়ার জন্যে, পরহেযগারী অবলম্বন করার জন্যে এবং উন্নত আদর্শের অনুসারী হবার জন্যেই রোজার এ সাধনা।

কিন্তু রোজা রেখেও যদি কেউ কু-কথা, কু-কাজে, বাজে কথা, বাজে কাজে, অন্যায় অবিচারে লিপ্ত হয় তবে তার রোজার সাধনা ব্যর্থ এবং উদ্দেশ্য হয় বিনষ্ট। এজ ন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে রোজাদার রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও অন্যান্য পাপাচার থেকে বিরত থাকেনা, তার পানাহার পরিত্যাগ এবং এমনি রোজায় আল্লাহ্ পাকের কোন প্রয়োজন নেই। এমনি রোজা দ্বারা কর্তব্যের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায় সত্য, তবে এর সত্যিকার সওয়াব লাভের আশা সুদূর পরাহত। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে বোখারী শরীফে।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ

রোজা ঢাল স্বরূপ

অর্থাৎ রোজা হলো মানুষের জন্যে ঢাল স্বরূপ, অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে, দোযখের শাস্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে রোজা হলো ঢাল স্বরূপ। যেভাবে মানুষ ঢাল দ্বারা আত্মরক্ষা করে থাকে তেমনি রোজা দ্বারা দুবৃত্ত শয়তানের আক্রমণ থেকেও আত্মরক্ষা করা যায়। তাই কল্যাণকামী মানুষের জন্যে রোজা হয় ঢাল স্বরূপ। তবে তার জন্যে শর্ত রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

مَالَمْ يُخْرِقْهَا

"যতক্ষণ না সেই ঢালকে কেউ বিনষ্ট করে ফেলে"।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমীপে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করেছেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ্! রোজা কিভাবে বিনষ্ট হয়? তিনি এরশাদ করেছেন ঃ মিথ্যা এবং পরনিন্দা দ্বারা রোজার ঢাল বিনষ্ট হয় তথা এর মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

অতএব, রোজার হেফাজত করতে হবে মিথ্যা কথা, পরনিন্দা প্রভৃতি পাপাচার থেকে দূরে থেকে। শুধু এভাবেই রোজা শান্তি, মুক্তি ও কল্যাণের কারণ হবে।

বস্তুত ঃ রমজানের রোজা হলো গুনাহ্ মাফ করাবার, আত্মশুদ্ধি লাভের, দেহ-মনের পবিত্রতা অর্জনের সবার উপরে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের এক অতি বাস্তব ও কার্যকর পন্থা। পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চরম সাফল্য লাভের এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ রমজানের প্রত্যেক দিন ও রাতে দোযখের বন্দীদের মুক্তি প্রদান করা হয়, আর প্রত্যেক মুসলমানের একটি দোয়া অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয়।

হযরত কা'ব এবনে আজুরাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একদিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে কদম মুবারক রেখে বললেন ঃ আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে আরোহণ করেও বললেন ঃ আমীন। আর তৃতীয় সিঁড়িতে পৌঁছেও বললেন ঃ আমীন। পরে সাহাবায়ে কেরাম যখন এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন তখন তিনি বললেন ঃ জিব্রাঈল (আঃ) এসেছিলেন, তিনি দোয়া করেছেন ঃ ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যে রমজানের সুযোগ লাভ করেছে অথচ সে তার গুনাহ্ মাফ করাবার সাধনা করেনি, তাই তার গুনাহ্ মাফ হয়নি তখন আমি বলেছি আমীন (হে আল্লাহ! কবুল কর)।

এরপর যখন জিব্রাঈল (আঃ) বলেছেন ঃ ধ্বংস হোক সে ব্যক্তি যার নিকট প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা হয় আর সে তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করেনা। তখন আমি বলেছি আমীন।

এরপর যখন জিব্রাঈল (আঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে বা তাদের একজনকে পায় অথচ তাদের সেবা যত্ন ও খেদমত করে জান্নাতের ব্যবস্থা করে না নেয় সে ধ্বংস হোক। তখন আমি বলেছি আমীন।

মাগফেরাত লাভের অপূর্ব সুযোগ

এতেও একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, রমজানের রোজা হলো গুনাহ মাফ করাবার ও মাগফেরাত লাভ করার তথা চির শান্তি চির মুক্তি লাভের একটি সুনিশ্চিত ব্যবস্থা, একটি অতি নির্ভরযোগ্য সুযোগ।

কিন্ত যে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার না করে তার ধ্বংস অনিবার্য, তার বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

আর রোজাদার সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেনঃ

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ اِلَّا الْجُوْعُ-(الحديث)

অর্থাৎ অনেক রোজাদার রয়েছে যাদের রোজায় অনাহারে থাকা ব্যতীত কোন উপকার নেই আর অনেক লোক রয়েছে যারা রাত্রে জাগ্রত থেকে নামাজে দন্ডায়মান হয় জাগরণ ব্যতীত তাদের কোন উপকার নেই। কেননা সারা দিন রোজা রেখে হারাম অবৈধ পন্থায় অর্জিত অর্থ সম্পদ দ্বারা ইফতার করলে রোজা নামাজ দ্বারা কী উপকার হতে পারে!

অতএব, রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করা না হলে রোজার হক্ব আদায় না করা হলে এর আসল উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ।

আত্মশুদ্ধি লাভ করে মানুষ যেন উন্নততর মহত্তর চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পারে, সংযম-চর্চা করে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালনে অভ্যস্ত হতে পারে সবার উপরে এ জীবন-সাধনার মাধ্যমে পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হতে পারে, এজন্যেই রোজা সহ অন্যান্য এবাদতের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রমজান মাসের ফজিলত সম্পর্কে আরও অনেক হাদীসে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ যখন রমজান মাস আসে তখন শয়তান এবং অশান্তি সৃষ্টিকারীদেরকে আবদ্ধ করা হয় এবং জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। আর জান্নাতের দরজাগুলো সব খুলে দেয়া হয়– একটিও বন্ধ থাকে না। অতঃপর একজন আহ্বানকারী (ফেরেশতা) আহ্বান করতে থাকে ঃ "হে কল্যাণকামী! অগ্রসর হও। আর হে অকল্যাণকামী! বিরত হও"! রমজানের প্রতি রাত্রেই এমনিভাবে আহ্বান করা হয়।

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন ঃ আমি প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি– তিনি এরশাদ করেছেনঃ রমজানে যে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করে আল্লাহ পাক তাকে মাগফেরাত দান করেন এবং রমজানে যে দোয়া করে সে মাহরূম হয় না।

বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সঙ্গে সওয়াবের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে রোজা ব্রত পালন করে আল্লাহ পাক তার অতীত গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেন। আর যে ব্যক্তি লাইলাতুল কদরে আন্তরিকতার সঙ্গে সওয়াবের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবাদত করে আল্লাহ পাক তার অতীত গুনাহ্ সমূহ মাফ করে দেন।(বুখারী ও মুসলিম)[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ রোজা এবং কোরআন কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে শাফাআত করবে। রোজা বলবে, "হে পরওয়ারদেগার! আমি দিনের বেলায় এ ব্যক্তির পানাহার প্রভৃতি কাজ বন্ধ রেখেছিলাম। এখন তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর"। আর কোরআন মজীদ বলবে, "হে আল্লাহ! আমি এ ব্যক্তিকে রাত্রের নিদ্রা থেকে বঞ্চিত করেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ কবুল কর"। তখন আল্লাহ পাক রোজা এবং কোরআন উভয়ের সুপারিশ কবুল করবেন। (বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "রমজানের শেষ রাত্রে আমার উম্মতকে মাগফেরাত দান করা হয়"। এক ব্যক্তি আরজ করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ! সে রাতটি কি কদরের রাত্রি"? তিনি এরশাদ করলেন, "না, কদরের রাত্রি নয় তবে নিয়ম হলো যখন মানুষ কাজ শেষ করে তখন তার মজুরী দেয়া হয় (যেহেতু এ রাতে বন্দা মালিকের নির্ধারিত ফরজ কাজ সমাপ্ত করে এজন্যে সে এ রাতে মাগফেরাত লাভ করে থাকে)।

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ "অল্প কয়েকটি নির্দিষ্ট দিন মাত্র"।

অর্থাৎ মাহে রমজানের সিয়াম সাধনাকে কঠিন মনে করার কোন ন্যায্য কারণ নেই। কেননা এ সাধনা কয়েকটি দিন মাত্র।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর তফসীরে বলেছেন ঃ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا অর্থাৎ ত্রিশ দিন।[১]

আল্লামা আলূসী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে লিখেছেন যে اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ এর এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ), হাসান (রঃ), আবু মুসলিম (রঃ) এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণ। এখানে একথা প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ পাক প্রথমে রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। এরপর আল্লাহ পাক اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বলে রমজানের দিন যে সামান্য সংখ্যক একথা ঘোষণা করে এ পর্যায়ে মানব মনের আশংকা ও সন্দেহ দূর করেছেন। এরপর তৃতীয় পর্যায়ে আল্লাহ্ পাক পরবর্তী আয়াতে شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِىْ বলে রমজানের রোজার ব্যাপারটিকে আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। বারে বারে ঘোষণার মাধ্যমে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার প্রতি যে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তা অতি সহজেই অনুমেয়।[২]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ কোন কোন তফসীরকার প্রতি মাসের তিন দিন রোজা এবং আশুরার একদিন রোজা বলে এর ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা রবিউল আউয়াল থেকে নিয়ে রমজান পর্যন্ত প্রতি

(১) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ২৫

(২) তফসীরে রূহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৭

মাসে তিন দিন করে রোজা ওয়াজিব ছিল। অতঃপর রমজানের রোজার হুকুম হলো তাই মাসে তিন দিন রোজার হুকুম বাতিল হলো। এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর কথার উদ্ধৃতিও তিনি দিয়েছেন যে, হিজরতের পর সর্ব প্রথম যে হুকুম বাতিল হয় তা হলো কেবলা এবং রোজা সম্পর্কীয়। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার হুকুম বদরের যুদ্ধের ঘটনার কয়েকদিন পূর্বে নাজিল হয়। উল্লেখ্য, বদরের যুদ্ধ দ্বিতীয় হিজরীর ১৭ই রমজান শুক্রবারে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও রয়েছে, মাহে রমজানের হুকুম নাজিল হওয়ার পূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আশুরার দিন রোজা রাখার হুকুম করতেন। কিন্তু রোজা সম্পর্কীয় ঘোষণার পর আশুরার রোজা ঐচ্ছিক হয়ে যায়। (বোখারী ও মুসলিম)

মসনদে আহমদে রয়েছে ঃ হযরত মাআজ এবনে জাবাল (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, নামাজ এবং রোজার তিনটি অবস্থার পরিবর্তন হয়।

(১) মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজতের পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৬/১৭ মাস বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে নামাজ আদায় করেন, এরপর যখন قَدْ نَرٰى আয়াত নাজিল হয় তখন তিনি কেবলা পরিবর্তন করেন এবং মক্কা শরীফের দিকে ফিরে নামায আদায় শুরু করেন।

(২) নামাযের জন্যে আযানের হুকুম লাভের পূর্বে একে অন্যকে আহ্বান করতেন এবং একত্রিত হতেন কিন্তু এ পন্থা অবশেষে কষ্টকর প্রমাণিত হয়। এমন সময় হযরত আবদুল্লাহ এবনে যায়েদ এবনে আবদে রাব্বিহী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি স্বপ্নে দেখি এক ব্যক্তি সবুজ রংয়ের পোশাক পরিহিত অবস্থায় কেবলার দিকে ফিরে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার তথা আযানের শব্দগুলো বলতে থাকে, একটু পরে সে পুনরায় ঐ শব্দগুলো উচ্চস্বরে উচ্চারণ করে দু'বার 'কদকামাতিচ্ছালাহ' বলতে থাকে তথা একামতের বাক্যগুলো উচ্চারণ করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেন, তুমি এ বাক্যগুলো বেলালকে শিখিয়ে দাও আর এভাবে সর্বপ্রথম হযরত বেলাল (রাঃ) আযান দেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ এমনি স্বপ্ন হযরত ওমর (রাঃ)-ও দেখেছিলেন। যাহোক এভাবে আযানের বিধান প্রবর্তন করা হয়।

(৩) তৃতীয় পরিবর্তন হলো, ইতোপূর্বে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামাজের ইমামতি করতেন, কয়েক রাকাআত হওয়ার পর কোন লোক এসে জিজ্ঞেস করতো কত রাকাআত হয়েছে তখন তাকে বলা হতো এত রাকাআত হয়েছে। তখন ঐ ব্যক্তি সে কয়েক রাকাআত আদায়ের পর জামাআতে শামিল হতো।

একবার হযরত মাআজ (রাঃ) এভাবে নামাযের জামাআতের সময় হাযির হয়ে বললেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে অবস্থায় পাবো ঐ অবস্থায় নামাযে শরীক হবো আর তিনি সালাম ফেরাবার পর আমার অবশিষ্ট নামায

শেষ করব এবং তিনি তাই করলেন, তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ মাআজ (রাঃ) তোমাদের জন্যে অত্যন্ত উত্তম পন্থা বের করেছে। তখন থেকে সে বিধানই কার্যকর হয়।

রোজার বিধানে তিনটি পরিবর্তন

রোজাব্রত পালনের ব্যাপারে যে পরিবর্তন হয়েছে তা হলো, যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফে আগমন করেন তখন প্রতি মাসে তিনটি রোজা রাখতেন। আর আশুরার দিনের রোজাও রাখতেন। অতঃপর كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ। এ আয়াত নাযিল হলো এবং রমজানের রোজা ফরজ করা হলো।

দ্বিতীয় পবির্তন হলো, রমজানের রোজা ফরজ হওয়ার পর কেউ রোজাব্রত পালন করতো আর কেউ তার বিনিময়ে মিসকীনকে খাবার দিয়ে দিত। অতঃপর فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সকলের জন্যে রোজা অবশ্য কর্তব্য হলো, এখন শুধু রুগ্ন এবং সফররত ব্যক্তির জন্যেই অন্য সময় রোজা রাখার অনুমতি হয়েছে।

তৃতীয় পরিবর্তন হলো, প্রাথমিক যুগে রমজানের রাত্রে পানাহার প্রভৃতি কাজ নিদ্রার পূর্বেই বৈধ ছিল। একবার নিদ্রিত হয়ে পড়লে আর পানাহার প্রভৃতি কাজের অনুমতি ছিলো না। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটলো। হযরত কায়েস বিন সারমা (রাঃ) নামক একজন আনসারী সাহাবী সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর কর্মক্লান্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরলেন, এশার নামায আদায় করলেন, এরপর তিনি নিদ্রিত হলেন। দ্বিতীয় দিন কোন প্রকার পানাহার ব্যতীত রোজা রাখলেন, এ কারণে তাঁর অবস্থা অত্যন্ত নাযুক হয়ে পড়ল। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি হয়েছে? তখন তাঁকে বিস্তারিত ঘটনা জানানো হলো।

অন্যদিকে অপর একটি ঘটনা এই, হযরত ওমর (রাঃ) রমজানের রাত্রে নিদ্রিত হওয়ার পর স্ত্রী-সহবাস করেন।

এ সময়---

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ.....

ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ.....

পর্যন্ত আয়াত নাযিল হয়, ফলে মাগরিবের পর থেকে সোবহে সাদেক পর্যন্ত রমজানের রাত্রে পানাহার, কামাচার প্রভৃতি কাজের অনুমতি দেয়া হলো।[১]

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ এর ব্যাখ্যা হলো "রমজানের মাস"।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا

অতঃপর যে ব্যক্তি অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে তাকে তার পক্ষে রোজা রাখা অত্যন্ত কষ্টকর হয় অর্থাৎ রোজার কারণে তার রোগ বৃদ্ধি পাবার আশংকা থাকে অথবা এখন রুগ্ন নয় অথচ দুর্বল এবং রোজা রাখা হলে রুগ্ন হওয়ার যথেষ্ট আশংকা আছে, এমনিভাবে অন্তঃসত্বা ও স্তন্যদানকারিনী মা রোজা রাখলে তার বা তার শিশুর প্রাণনাশের আশংকা থাকে এমনি অবস্থায় রমজান মাসে রোজা না রেখে নিজের সুবিধা মোতাবেক অন্য সময় রোজা রাখার অনুমতি রয়েছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ রোগীকে রমজান ব্যতীত অন্য সময় রোজা রাখার অনুমতি দানের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেন। এমনিভাবে যে ভ্রমণরত তাকেও ইফতার করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে তিন দিন তিন রাতের সফর হলে নামাজে কছর করা এবং রোজা ইফতার করা বৈধ।

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ

শানে নুজুল ঃ ইসলামের প্রথম যুগে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে এ অনুমতি ছিল যে, যদি অনভ্যাসের কারণে রোজা রাখা কঠিন হয় তখন একটি রোজার বদলে একজন মিসকীনকে দু' বেলা পেট ভরে খাবার সরবরাহ করবে। একজন মিসকীনকে এক দিনের পেট ভরা খাবার দিলে একটি রোজার 'ফেদিয়া' হতো। এ নির্দেশ ইসলামের প্রথম যুগের জন্যে ছিল। পরবর্তীতে এ অনুমতি রহিত হয় এবং রোজা অবশ্য কর্তব্য ঘোষণা করা হয়।

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا

অর্থাৎ যদি কেউ একটি রোজার বদলে একজন মিসকীনকে একদিনের পরিমাণের চেয়ে বেশী খাবার দেয় অথবা একাধিক মিসকীনকে পেটভর্তি খাবার দেয় তবে তা তার জন্যে উত্তম এবং অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ, অর্থাৎ রোজার বদলে দানের ব্যাপারে যত বেশী দান করা যায় ততই উত্তম, তবে একজন মিসকীনকে অবশ্যই পেট ভরা খাবার দিতে হবে, এর কম করা যাবে না।

وَاَنْ تَصُوْمُوْا

অর্থাৎ যারা অসুস্থ বা ভ্রমণরত তাদের জন্যে তো রোজা ইফতার করা বৈধ কিন্তু যাদের শক্তি আছে অথচ তারা রোজার 'ফেদিয়া' আদায় করে রোজা পালন থেকে বিরত থাকতে চায় তাদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে যে, রোজার অনন্ত অসীম বরকত ও সওয়াবের প্রতি লক্ষ্য রেখে রোজার পরিবর্তে 'ফেদিয়া' না দিয়ে রোজা ব্রত পালন

করাই উত্তম। যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার। বস্তুত ঃ মাহে রমজানের যে ফজিলত এবং গুরুত্ব রয়েছে সেদিক থেকে বিচার করলে রোজা রাখার ব্যাপারে গাফলত করার মত বদ নছিবী আর কিছুই হতে পারে না।

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি রোজা রাখতে সক্ষম তার রোজা 'ফেদিয়া' আদায় করার এ বিধান রহিত হয়েছে। এখন সক্ষম ব্যক্তিকে অবশ্যই রোজা রাখতে হবে। একটি রোজা ইচ্ছা-কৃত নষ্ট করলে তার বদলে আরও ষাটটি রোজা বিরতিহীন ভাবে রাখতে হবে। যদি কোন কারণে এই রোজায় বিরতি ঘটে তবে পুনরায় প্রথম রোজা থেকে শুরু করতে হবে। কিন্তু তবু মাহে রমজানের রোজার বরকত ও ফজিলত থেকে মাহরূম হবে। এজন্যে ইমাম নখয়ী (রঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন ওজর ব্যতীত কেউ রমজানের রোজা না রাখে পরে এক হাজার বছরও রোজা রাখে তবু মাহে রমজানের রোজার ক্ষতিপূরণ হবে না।

হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি সারা জীবন রোজা রাখে তবু মাহে রমজানের রোজার ফজিলত পাবে না। আর রমজানে রোজা না থাকার ক্ষতি কোন অবস্থাতেই পূরণ হবে না।[১]

شَهْرُ
رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۡ وَلِتُكْمِلُوا
الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾

তরজমা ঃ

(১৮৫) রমজানের মাস- সেই মাস যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে যা মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শক ও যাতে রয়েছে হেদায়েতের নিদর্শন সমূহ এবং যা হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব, তোমাদের যে কেউ এ মাস পাবে তাকে অবশ্যই এ মাসে রোজা রাখতে হবে এবং যে অসুস্থ বা মুসাফির হবে সে অন্য সময় সংখ্যা পূরণ করবে। যা সহজ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে তাই ইচ্ছা করেন এবং যা কঠিন তিনি কোন দিন তার ইচ্ছা করেন না, যেন তোমরা নির্ধারিত সময়টি সম্পূর্ণ করতে পার এবং যেহেতু আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন এজন্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এবং যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩২

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াত পূর্ববর্তী আয়াতের পরিসমাপ্তি। কেননা ইতোপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের জন্যে রোজা ফরজ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে "কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনের" ব্যাখ্যা করে এরশাদ হয়েছে, সেই কয়েক দিন হলো রমজানের মাস। আর এই সেই মোবারক মাহে রমজান যে মাসে পবিত্র কোরআন নাজিল হয়েছে যা মানুষের জন্যে হেদায়েত এবং হক্ব ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌র নূর

যেহেতু কোরআনে করীম আল্লাহ্‌র নূর আর আল্লাহ্ পাকের এ নূর অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে মাহে রমজানকে পছন্দ করা হয়েছে, যেমন হযরত মূসা (আঃ)-কে কোহেতূরে তৌরাত প্রদান করা হয়, আল্লাহ্ পাক তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন, আর এজন্যে তিনি চল্লিশটি রোজা রাখেন। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আঃ) যখন চল্লিশটি রোজা রেখেছিলেন তখনই আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি ইঞ্জিল নাজিল করেন। আর এভাবেই প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেরা নামক গুহায় রোজা রেখেছিলেন তখন কোরআনে করীম নাজিল হয়েছে। আল্লাহ্ পাকের তাজাল্লী লাভের বিশেষ সময় হলো মাহে রমজান কেননা, এ মাসেই কোরআনে করীম লওহে মাহ্‌ফুয থেকে দুনিয়ার নিকটস্থ আসমানে নাজিল করা হয়। আর সেখান থেকে বায়তুল মা'মুরে সংরক্ষণ করা হয় এবং বায়তুল মা'মুর থেকে অতঃপর প্রয়োজন বোধে অল্প অল্প ক্বরে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হতে থাকে।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, এতে মাহে রমজানের ফজিলত এবং মাহাত্ম বর্ণিত হয়েছে। মসনদে আহমদে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট সহীফা অবতীর্ণ হয় রমজানের প্রথম তারিখে। আর তৌরাত অবতীর্ণ হয় ৬ রমজান এবং ইঞ্জিল নাজিল হয় মাহে রমজানের ১৩ তারিখে আর কোরআন মজীদ ২৪ তারিখে নাজিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, যবুর রমজানের বার তারিখ আর ইঞ্জিল ১৮ তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য– যে সমস্ত সহীফা এবং তৌরাত, যবুর, ইঞ্জিল যে যে পয়গম্বরের নিকট অবতীর্ণ হয়েছে তা একই সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কোরআনে করীম লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত একসাথে নাজিল হয়, এরপর বিভিন্ন সময় প্রয়োজন মাফিক নাজিল হতে থাকে। এজন্যেই কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّا أَنْزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(১) তফসীরে হক্কানী খণ্ড ১ পারা ২, পৃষ্ঠা ৪৬

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কোরআনকে লাইলাতুল কদরে নাজিল করেছি। অর্থাৎ রমজানের পবিত্র মাসে লাইলাতুল কদরে পবিত্র কোরআন নাজিল করেছি। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ

অর্থাৎ নিশ্চয় আমি কোরআন নাজিল করেছি এক মুবারক রাত্রে।

যে রাতে কোরআন নাজিল করা হয়েছে এ আয়াতে সে রাতকে মুবারক রাত বলা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কোরআনে করীম তো বিভিন্ন সময় বহু বছরে অবতীর্ণ হয়েছে– অথচ এ আয়াতে বলা হয়েছে "লাইলাতুল কদরে কোরআন নাজিল হয়েছে"-এর তাৎপর্য কি? তখন তিনি বলেছিলেন ঃ লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে সম্পূর্ণ কোরআন লাইলাতুল কদরে একই সঙ্গে নাজিল হয়েছে।[১]

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ

অর্থাৎ রমজানের মাস এমন পবিত্র ও বরকতময় এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের এত উপযোগী সময় যে, এ সময়কেই বিশ্ব মানবের মুক্তির মহাসনদ পবিত্র কোরআন নাযিল করার জন্যে পছন্দ করা হয় যে কোরআন মজীদ সমগ্র মানব জাতির জন্যে পথ প্রদর্শক, যা মানুষের জন্যে হেদায়েতের উপায় এবং হেদায়েতের পথ-নির্দেশ করার জ ন্যে পবিত্র কোরআনের প্রতিটি অংশ প্রমাণ স্বরূপ। শুধু তাই নয়; বরং পবিত্র কোরআন সত্য-মিথ্যার মাঝে পার্থক্যকারীও । হক্ব ও বাতিল, হালাল-হারাম, ন্যায়-অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করে সত্যের সন্ধান দেয় পবিত্র কোরআন।

মাহে রমজানের বৈশিষ্ট্য

এখানে উল্লেখ্য, আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে একথা বিশেষভাবে এরশাদ করেছেন যে, এ মাসে কেন সিয়াম সাধনাকে ফরজ করা হয়েছে? কেননা এ মাস আসে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের তথা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের এক শুভ সম্ভ াবনা। এজন্যে পবিত্র কোরআন সহ সমস্ত আসমানী কিতাব এ মাসেরই বিভিন্ন তারিখে অবতীর্ণ হয়েছে। এটি এ মাসেরই বৈশিষ্ট্য।

এমনি আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, এ মাসেই রোজা ব্রত পালনের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কেননা এ মাসেই আল্লাহ্র বন্দেগী সহজ হয় এবং আল্লাহ্ ওয়ালাদের কল্বে নূর বর্ষিত হতে থাকে এবং আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর বন্দেগীর জন্যে বিশেষভাবে তওফিক প্রদান করা হয়।[২]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৩
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৮৪

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে যে মাহে রমজানে উপস্থিত থাকে তথা যে রমজানের সময় সুস্থ থাকে এবং ভ্রমণরত না হয় এবং যে-মহিলা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হয় তাদের সকলের উপর মাহে রমজানের রোজা অবশ্য কর্তব্য।

এর তাৎপর্য হলো, অসুস্থ এবং ভ্রমণরত ব্যক্তির জন্যে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে।

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক মহিলা এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! "মহিলাদের দ্বীনের ব্যাপারে ত্রুটি কোথায়"? তখন তিনি এরশাদ করলেন, "লক্ষ্য কর না হায়েয হলে নামাজ রোজা কিছুই করা সম্ভব হয় না"। (বোখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ বরকতময় মাস রমজান উপস্থিত হলে সকলকে অবশ্যই রোজা ব্রত পালন করতে হবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে রোজা পালনের বদলে ফেদিয়া দেয়া বৈধ ছিল কিন্তু এ আয়াত দ্বারা সে বিধান রহিত হলো।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, যে ব্যক্তি মাহে রমজানে তার গৃহে অবস্থান করে অতঃপর সে ভ্রমণরত হয় তার রোজা রাখার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, এমন ব্যক্তির জন্যে ইফতার করা বৈধ নয় এবং ওবায়দা সালমানিও একই মত পোষণ করেন। অনেক সাহাবায়ে কেরাম এ মত পোষণ করতেন মাহে রমজানে ভ্রমণরত হলে ভ্রমণের দিনের রোজা ভাঙ্গা বৈধ নয়। হ্যাঁ, এরপর ইফতার করা বৈধ হবে।[১]

অতএব, বাক্যটির তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, মাহে রমজানের যে ক'দিন পাওয়া যায় সে কয়দিনই যেন রোজা রাখা হয়। যদি সারা মাস পাওয়া যায় তবে সারা মাসই রোজা রাখতে হবে। আর যদি কিছুদিন পাওয়া যায় তবে সে কয়েক দিনই রোজা রাখতে হবে।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত যাবের (রাঃ) এবং হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসও এ ব্যাখ্যা সমর্থন করে। সেই হাদীস হলো, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর মক্কা শরীফ গমন করেন তখন রমজানের দিন ছিল। তিনি রোজাদার অবস্থায় ছিলেন। তিনি যখন 'কাদীদ' নামক স্থানে পৌঁছেন তখন তিনি ইফতার করেন এবং উপস্থিত লোকেরাও ইফতার করেন।

মাসআলা ঃ কোন ব্যক্তি যদি দিনের প্রারম্ভে স্বগৃহে অবস্থান করে অতঃপর সফরে গমন করে তবে তাকে সেদিন অবশ্যই রোজা অব্যাহত রাখতে হবে। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ)। কেননা, সে দিনের প্রথম অংশে মুসাফির ছিল না অবশ্য ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে তার পক্ষে ইফতার করা বৈধ হবে।[২]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৫
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৩৫

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ

আর যে অসুস্থ অথবা ভ্রমণরত হবে তাকে অবশ্যই অন্য সময় রোজার এ দিনগুলো পূর্ণ করতে হবে। এ হুকুমটি দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার কারণ এই, ইতোপূর্বে সুস্থ ব্যক্তি রোজার বিনিময়ে ফেদিয়া দানের মাধ্যমে রোজা থেকে বিরত থাকার যে অনুমতি লাভ করেছিল তা এখন থেকে রহিত হলো। এরপর কারও পক্ষে রোজা না রাখা বৈধ নয়, এটি অবশ্য কর্তব্য। মাহে রমজানের ফজিলত ও মর্যাদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর কারও পক্ষেই এ মর্যাদা থেকে মাহরুম হওয়া সম্ভব নয়। শুধু যারা রুগ্ন এবং মুসাফির তারা যদি মাহে রমজানের রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তাদের জন্যে অনুমতি রয়েছে অন্য সময়ে তারা যেন উল্লেখিত সংখ্যক রোজা রাখে।

কয়েকটি মাসআলা

উল্লেখ্য, যে ব্যক্তি মাহে রমজানের পর রোজার কাজা আদায়ের কিছু সময় পায় কিন্তু কাজা আদায় না করেই মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তার ওয়ারিশদের প্রতি ফেদিয়া বা কাজা ওয়াজিব হবে কি? এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মত হলো ওয়ারিশদের প্রতি এক্ষেত্রে কোন দায়িত্ব বর্তাবে না। তবে যদি মৃত ব্যক্তি ফেদিয়া আদায়ের অসিয়ত করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে তার পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মাধ্যমে অসিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব হবে। আর এক তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে ওয়ারিশদের সন্তুষ্টি পূর্বশর্ত। তাদের সন্তুষ্টি ব্যতীত তাতে হাত দেয়া বৈধ হবে না। এমনিভাবে কারও যদি মানত বা কাফ্ফারার রোজা থাকে আর সে অসিয়ত করে মারা যায় তবে তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদের দ্বারা অসিয়ত পূর্ণ করা বৈধ হবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একজন মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো এবং আরজ করলো,"ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমার মা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। তাঁর উপর এক মাসের রোজা রয়ে গেছে। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে এ রোজা আদায় করবো"? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমার মায়ের উপর যদি ঋণ থাকতো তা কি তুমি আদায় করতে"? সে আরজ করলো, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! অবশ্যই আদায় করতাম"। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আরোপিত ফরজ ঋণ আদায়ের চেয়ে অধিকতর উপযুক্ত"।[১] (বোখারী, মুসলিম)

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি বলেন ঃ সা'দ এবনে ওবাদাহ্ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৭

আরজী পেশ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার মাতার একটি মানত ছিল যা আদায়ের পূর্বেই তিনি মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছেন"। তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি তার পক্ষ থেকে তা আদায় কর"।[১]

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"যা সহজ আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে তাই ইচ্ছা করেন আর যা কঠিন তিনি তোমাদের জন্যে তা ইচ্ছা করেন না"।

এজন্যেই ওলামায়ে কেরামের মতে সফরে যদি রোজা রাখা কঠিন হয় তবে ইফতার করা উত্তম। হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তির উপর ছায়া করে রাখা হয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার"? লোকেরা জবাব দিল, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! এ ব্যক্তি রোজা অবস্থায় আছে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে গেছে"। তিনি এরশাদ করলেন ঃ

ليس من البر الصيام فى السفر

অর্থাৎ "সফর অবস্থায় রোজা রাখা নেক কাজ নয়"।[২]

কেননা আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন– তিনি তাঁর বন্দাদের জন্যে যা সহজ তারই ইচ্ছা করেন। তিনি বন্দাদের কষ্ট চান না। এজন্যে এরশাদ হয়েছে, যেন তোমাদের কষ্ট না হয়, সওয়াবের পরিমাণেও কমতি না হয়, এ উদ্দেশে তোমরা যেন রোজার সংখ্যা পূর্ণ করে নাও আর তোমাদেরকে আল্লাহ্ পাক যে হেদায়েত করেছেন তার জন্যে তোমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা বর্ণনা কর এবং তোমরা যেন আল্লাহ্ পাকের এই নেয়ামতের জন্যে শোকর আদায় কর।

আল্লাহ্ পাকের অপূর্ব নেয়ামত

আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের এক দুর্লভ সুযোগ আসে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনার মাধ্যমে। অতএব, মাহে রমজানের সিয়ামের ব্যবস্থা আল্লাহ্ পাকের এক অপূর্ব নেয়ামত। পক্ষান্তরে যে রুগ্ন অথবা ভ্রমণরত হয় যার পক্ষে সিয়াম সাধনা অব্যাহত রাখা কঠিন তার জন্যে রোজা না রাখার অনুমতি দেয়াও আল্লাহ্ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত। আর পরে সুযোগ মত রোজা কাজা করে ক্ষতিপূরণ করার সুযোগ দেয়া আর একটি নেয়ামত। এই সমস্ত নেয়ামতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের হুজুরে কৃতজ্ঞতা প্রকার করা একান্ত করণীয় কাজ।

আল্লাহ পাক মানুষের জন্যে কত দয়াবান তা উপলব্ধি করাও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুন্দরতর ও উন্নততর করে গড়ে তোলার নির্দেশ দেয়

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৪
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৭৬

আর এজন্যে ইসলাম সহজতর পন্থা অবলম্বন করার আহ্বান জানায়। এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কয়েক খানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ঃ

মসনদে আহ্মদে আছে–হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, সহজ ধর্মটিই হলো উত্তম ধর্ম। মসনদে আহমদে অন্য একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত আবু উরওয়া (রাঃ) বলেন, আমরা একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। তিনি যখন আগমন করলেন তখন তাঁর মস্তক মোবারক থেকে পানির ফোটা ঝরছিল। মনে হচ্ছিল তিনি অজু করে অথবা গোসল করে এসেছেন। অতঃপর যখন তিনি নামায থেকে ফারেগ হলেন তখন লোকেরা নানা প্রকার প্রশ্ন আরজ করতে লাগলো যে, অমুক কাজে কোন দোষ আছে নাকি, তমুক কাজে কোন দোষ আছে নাকি ইত্যাদি। অবশেষে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্র ধর্মটি হলো সহজ বিষয়ে ভরপুর। এই একই কথা তিনি তিন বার এরশাদ করলেন।

মসনদে আহ্মদে আরেকখানি হাদীস আছে– হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ হে লোক সকল! সহজ হও কঠিন হয়োনা। সান্ত্বনা দাও, বিরূপ ভাব সৃষ্টি করোনা।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে আছেঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত মাআয (রাঃ) এবং হযরত আবু মূসা (রাঃ)-কে ইয়ামনে প্রেরণ করার সময় এরশাদ করলেন, "তোমরা দু'জন (মানুষকে) খোশ খবর দিও, ঘৃণার উদ্রেক করোনা। সহজ ব্যবস্থা করো, কঠিন হয়োনা। একতাবদ্ধ হয়ে থেকো, পরস্পর মতভেদ করোনা"।

সুনান এবং মসনদ সমূহে আছে– হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আমি এক নরম ও সহজ ধর্ম সহ প্রেরিত হয়েছি। মুহ্জেন বিন আওরা (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে নামায পড়তে দেখে তার দিকে নিবিষ্ট চিত্তে চেয়ে রইলেন। এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমরা কি এ লোকটিকে আন্তরিকতার সাথে নামায পড়তে দেখতে পাও"? লোকেরা জবাব দিল, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! মদীনার অধিবাসীদের মধ্যে এ লোকটিই অধিক নামায পড়ে থাকে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তাকে একথা জানতে দিও না– পাছে একথা তার ধ্বংসের কারণ হবে। শোনো! আল্লাহ পাক এ উম্মতের বিষয়ে সহজ করতে চান, কঠিন করতে ইচ্ছা করেন না"।[১]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু), খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৫

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾
أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ
لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ
أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا
مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

তরজমা

(১৮৬) আর (হে রসূল!) যখন আমার বন্দা আপনাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তখন তাকে আপনি বলুন, আমি তার নিকটবর্তী, যখন কোন দোয়া প্রার্থী আমাকে ডাকে, আমি তার ডাকে সাড়া দেই, অতএব আমার নিকট প্রার্থনা করা ও আমার প্রতি ঈমান আনাই তাদের কর্তব্য, হয়তো তারা হেদায়েত লাভ করবে।

(১৮৭) রমজানের রাত্রিতে তোমাদের জন্যে স্ত্রী-সহবাস হালাল করা হলো। স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্যে পোশাক। তোমরা স্বীয় ক্ষতি সাধন করেছিলে এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল ছিলেন, এজন্যে তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করলেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন, অতএব এখন তোমরা তোমাদের পত্নীদের সাথে সহবাস করতে পার এবং আল্লাহ্ পাক যা তোমাদের জন্যে লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার অন্বেষণ কর এবং পানাহার কর যে পর্যন্ত প্রত্যুষের কালো রেখা থেকে সাদা রেখা প্রকাশ হয় তৎপর রোজাকে রাত্রি পর্যন্ত পূর্ণ কর এবং মসজিদে এ'তেকাফ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করোনা, এটিই আল্লাহ্ পাকের নির্দিষ্ট সীমা, অতএব এর নিকটবর্তী হয়োনা, এভাবে আল্লাহ্ পাক মানব জাতির জন্যে নির্দশন সমূহ বর্ণনা করে থাকেন হয়তো তারা পরহেযগারী অবলম্বন করবে।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতে আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ব বর্ণনা করার এবং তাঁর শোকর গুজারী ও তাঁকে স্মরণ করার আদেশ ছিল। তাতে সম্ভাবনা ছিল, কারো মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে আমরা তো আল্লাহ্ পাককে স্মরণ করি এবং তাঁর শোকর গুজারীও করে থাকি কিন্তু আল্লাহ্ পাক আমাদের প্রতি মনোযোগী থাকেন কি-না? নাকি দুনিয়ার রাজা-বাদশাহ্দের ন্যায় তাঁর নিকটও আমাদের কথা পৌঁছে না। এ আয়াতে এ সন্দেহের নিরসন-কল্পে এরশাদ হয়েছে ঃ হে নবী! যখন আমার কোন বন্দা আপনার নিকট আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন আপনি বলে দিন যে আমি তাদের নিকটেই রয়েছি, যে-কেউ আমাকে আহ্বান করে আমি তা শ্রবণ করে থাকি এবং জবাব প্রদান করে থাকি আর যা দোয়া করে থাকে, আমি তা কবুল করে থাকি। সুতরাং আমার বন্দাদেরও উচিত যেন আমার অনুগত হয় এবং যদিও আমি তাদের দৃষ্টিগোচর হই না তবু আমার প্রতি ঈমান রাখবে তাহলে তারা আমার নৈকট্য লাভের পথ পাবে।[১]

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকারগণ একাধিক মত ব্যক্ত করেছেনঃ

(১) একজন গ্রাম্য ব্যক্তি এসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাদের "রব" কোথায়? তিনি কি নিকটে? তবে আমরা নিম্নস্বরে দোয়া করবো আর যদি তিনি দূরে থাকেন তবে উচ্চ স্বরে ডাকবো। তখন এ আয়াত নাজিল হয়েছে।

(২) অনেকে বলেন– হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি যুদ্ধে গমন করেছিলেন। সেখানে সাহাবাগণ উচ্চস্বরে তাকবীর এবং তাহ্লীল শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তোমাদের রব বধির নন এবং তিনি দূরে অবস্থান করেন না"। এরপর এ আয়াত নাজিল হয়।[২]

(৩) আল্লামা বগভী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে আবু ছালেহ্ এবং আবু ছালেহ্ থেকে কালবী বর্ণনা করেন, মদীনার ইহুদীরা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলো– আল্লাহ্ পাক আমাদের দোয়া কিভাবে শ্রবণ করে থাকেন? আপনি তো বলে থাকেন যে আসমানের দূরত্ব আমাদের কাছ থেকে পাঁচশ' বছরের এবং প্রতিটি আসমানের দূরত্বই অন্য আসমান থেকে সে অনুপাতেই রয়েছে। তাদের এ বক্তব্যের জবাবে আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন।[৩]

---

(১) তফসীরে হক্কানী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬
তফসীরে কবীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৪
(২) তফসীরে হক্কানী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৬
(৩) তফসীরে মাজহারী খন্ড-১, পৃষ্ঠা ৩৪২-৪৩

(৪) হযরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন– যখন ادعونى استجب لكم (তোমরা আমার নিকট দোয়া কর আমি দোয়া কবুল করবো) আয়াত নাজিল হলো তখন লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো– কোন্ সময় দোয়া করা উচিত? এ জিজ্ঞাসার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাজিল হয়েছে।[১]

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন স্বীয় বন্দাদেরকে এ নিশ্চয়তা বিধান করেছেন যদি কেউ তাঁকে ডাকে তিনি তার ডাকে সাড়া দেন। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– আল্লাহ্ পাকের ফরমান এসেছে, আমার বন্দা আমার সম্পর্কে যেমন ধারণা রাখবে আমি তার সাথে তেমনি ব্যবহার করবো। انا عند ظن عبدى بى সে যখন আমার নিকট দোয়া প্রার্থী হয় আমি তখন তার সাথেই থাকি।[২]

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতেও এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে, এরশাদ হয়েছে,

وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

"এবং তিনি তোমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, তোমরা যেখানেই থাক, আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করছেন"।

এমনিভাবে অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে,

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ

(সূরা ক্বাফ)

"আর আমি তোমাদের গর্দানের শাহরগ থেকেও নিকটবর্তী"।

এমনিভাবে সূরা ওয়াক্বেয়ায় এরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ

"আর আমি তোমাদের সর্বাধিক নিকটবর্তী কিন্তু তোমরা দেখনা"।

এ আয়াত সমূহে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক শুধু নিকটেই নন; বরং সর্বাধিক নিকটে এতদসত্ত্বেও আল্লাহ পাককে দেখা যায় না, এর কারণ দূরত্ব নয়; বরং দেখার শক্তির অভাব। যেমন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্যের দিকে আমরা

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা ২, পৃষ্ঠা ৩৬
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা ২, পৃষ্ঠা ৩৬

তাকাতে পারি না সূর্যের জ্যোতির কারণে, তেমনি আল্লাহ্ পাক নিজেই এরশাদ করেছেন ঃ

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

আসমান যমীনের নূরই হলেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক। তাই এই নূর দর্শন মানুষের পক্ষে সাধ্যাতীত। এ পর্যায়ে মাওলানা রুমী (রঃ) অন্য জবাব দিয়েছেন ঃ

جان نهان درجسم داد ودرجان نهان

اے نهان اندو نهان اے جان جان

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মানব দেহের মধ্যে তাঁর প্রাণকে গোপন করে রেখে দিয়েছেন। আর সেই গোপন প্রাণের মাঝে নিজে আত্মগোপন করে আছেন। এ অর্থেই তিনি মানুষের সর্বাধিক নিকটবর্তী।

কিন্তু মানুষ যেহেতু তার প্রাণকে দেখতে পারে না, তাই আল্লাহ্ পাককে দেখা তার পক্ষে শুধু সাধ্যাতীতই নয়, বরং কল্পনাতীতও।

শুধু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এটি বৈশিষ্ট্য যে, তিনি শবে মে'রাজে আল্লাহ পাকের দীদার লাভে ধন্য হয়েছেন। যাহোক এ বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। এ আয়াত দ্বারা শুধু একথাই ঘোষণা করা হলো যে, আল্লাহ পাক অতি নিকটবর্তী, তিনি সব কিছু শ্রবণ করেন, সব কিছু দেখেন, কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নয়; বরং,

اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

"কোন দোয়া প্রার্থী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকি"। অর্থাৎ যে আমার নিকট দোয়া করে, আমি তার দোয়া কবুল করি। এ পর্যায়ে কয়েক খানি হাদীস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি তোমরা কোন পাপ কার্যের জন্যে অথবা পরস্পরের আত্মীয়তার বন্ধন বিনষ্ট করার জন্যে দোয়া না কর এবং দোয়ার বিষয় পাওয়ার জন্যে তাড়াহুড়া না করে তবে আল্লাহ পাক তোমাদের দোয়া কবুল করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, তাড়াহুড়া করার অর্থ কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, এর অর্থ হচ্ছে কেউ যদি একথা বলে হে আল্লাহ্! আমি আপনার নিকট দোয়া করছি কিন্তু আপনি আমার দোয়া কবুল করলেন না, একথা বলে সে দোয়া ছেড়ে দিল।

হযরত ওবাদা এবনে সামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এ পৃথিবীতে যে আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করে

আল্লাহ্ পাক হয়তো তার কাম্য বস্তু তাকে দান করেন অথবা তার কোন বিপদ দূর করে দেন অবশ্য এ অবস্থা তখন হয় যখন কোন পাপকার্যের জন্যে অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করার জন্যে দোয়া না করে (বগভী)।

ইমাম আহমদ (রহঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে মুসলমান তার কোন প্রয়োজনের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে আল্লাহ্ পাক তার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন, অথবা তার পরকালীন জিন্দেগীর জন্যে তা সংরক্ষণ করেন যা সে আখেরাতে পাবে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির উল্লেখ করেছেন, যে ভ্রমণরত অবস্থায় হাত আসমানের দিকে ওঠায় এবং সে অত্যন্ত পেরেশান রয়েছে কিন্তু তার অবস্থা এই, তার পানাহার হারাম, তার পোশাক হারাম, এমন অবস্থায় দোয়া কিভাবে কবুল হবে! (মুসলিম শরীফ)

তিরমিজী এবং আবু দাউদ শরীফে সংকলিত, হযরত সালমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং অতীব দয়াবান– যখন কোন বন্দা তাঁর নিকট হাত ওঠায় তখন তার হাতকে ফিরিয়ে দিতে তিনি লজ্জাবোধ করেন। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে অনেক সময় কেন দোয়া কবুল হয় না অথবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে বিলম্ব কেন হয়? এর কয়েকটি কারণ রয়েছে (১) বিলম্ব হওয়ার ব্যাপারে কোন হেকমত থাকে। (২) অথবা ঐ দোয়া কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা থাকে (৩) কখনো কখনো দোয়া কবুল হওয়ার শর্ত অনুপস্থিত থাকে।[১]

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! যখন আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া প্রার্থী হও, দোয়া কবুল হবে একথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করো। মনে রেখো গাফলতের আবর্তে নিপতিত অন্তরের দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করেন না।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াতের মমার্থ জিজ্ঞাসা করলেন, তখন তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এভাবে আরজী পেশ করলেন ঃ হে আল্লাহ! আয়েশার এ প্রশ্নের জবাব কি? তখন জিব্রাঈল (আঃ) হাযির হলেন এবং বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলছেন এ আয়াতের অর্থ সে ব্যক্তি যে নেক আমল করে, অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার নিকট দোয়া করে, তখন আমি তার দোয়া কবুল করি।

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ হে আদম-সন্তান!

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৫-৪৭

একটি বিষয় শুধু আমার, আর একটি শুধু তোমার, একটি বিষয় এমন যা আমার ও তোমাদের মধ্যে একত্রিত রয়েছে। আমার হক্ব হলো, তোমরা শুধু আমার বন্দেগী করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না, আর তোমার হক্ব, তোমার সওয়াব বা শুভ পরিণতি অবশ্যই আমি প্রদান করব, তোমায় কোন নেক আমলকে আমি বিনষ্ট করব না, আর সম্মিলিত বিষয় হলোঃ তোমরা দোয়া করবে, আমি কবুল করব। দোয়া করা তোমার কাজ আর কবুল করা আমার কাজ। (বাজ্জাজ)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেনঃ দোয়া সম্পর্কীয় এ আয়াতকে রোজার বিধি-নিষেধের মাঝে স্থান দেয়ার মধ্যে হেকমত হলো রোজা ব্রত পালনের পর মানুষকে দোয়ার প্রতি আকৃষ্ট করা, বরং প্রতি দিন ইফতারের সময় অধিক পরিমাণে দোয়া করা রোজাদার মাত্রেরই কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ রোজাদার ইফতারের সময় যে দোয়া করে, আল্লাহ্ পাক তা কবুল করেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) ইফতারের সময় বাড়ীর সকল লোককে একত্রিত করে দোয়া করতেন।

হাদীস শরীফে একথাও আছে, তিন ব্যক্তির দোয়া ফেরত দেয়া হয়না অর্থাৎ কবুল করা হয় (১) সুবিচারক শাসনকর্তা (২) রোজাদার এবং (৩) মজলুম। মজ লুমের ফরিয়াদের জন্যে আসমানের দ্বার উন্মুক্ত হয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ আমার ইজ্জতের শপথ! আমি অবশ্যই তোমার সাহায্য করব, যদিও তা বিলম্বে হয়। (তিরমিজী, নেসায়ী, এবনে মাজা)।[১]

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي

পূর্ববর্তী বাক্যে বলা হয়েছে– "যে আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দেই"। আর এ বাক্যে এরশাদ হয়েছে, আমার বন্দাগণও যেন আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে অর্থাৎ যেভাবে আমি তাদের দোয়া কবুল করি তারাও যেন আমার বিধি-নিষেধ মেনে চলে।

وَلْيُؤْمِنُوا بِي

আর তারা যেন আমার প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ এবং প্রকৃত ও সুদৃঢ় ঈমান অর্জন করে।

لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

হয়তো তারা পূণ্য-পথে-আসতে পারে অর্থাৎ যারা উপরোল্লখিত গুণাবলী অর্জন করবে তারাই সরল পূণ্য পন্থা লাভে ধন্য হবে, অতএব এক আল্লাহ্র প্রতি পরিপূর্ণ ও

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭

সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা তথা তাঁর যাবতীয় বিধি-নিষেধ যথাযথ ভাবে পালন করা তাঁর নৈকট্য লাভের জন্যে পূর্বশর্ত।

أُحِلَّ لَكُمْ

(তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে)

এ শব্দটি দ্বারা একথা প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিষয়টি ইতোপূর্বে হারাম ছিল তা এখন হালাল করা হলো।

শানে নুযুল

মাহে রমজানে রোজাব্রত পালনের হুকুম জারী হওয়ার পর এই বিধান ছিল যে, ইফতারের পর এশার নামাযের বা নিদ্রাগমনের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস বৈধ ছিল। কিন্তু কেউ নিদ্রিত হলে বা এশার নামায আদায় করলে পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ হয়ে যেতো। এ নির্দেশ ছিল অত্যন্ত কঠিন। ইমাম বোখারী (রঃ) সহ অন্যান্য হাদীসবেত্তাগণ বিখ্যাত সাহাবী হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) এর বর্ণনা সংকলন করেছেনঃ প্রথম যখন রমজানের রোজা ফরজ হলো তখন উপরোক্ত নির্দেশের কারণে অনেক সাহাবীর কষ্ট হতে লাগলো। যেমন একবার আনসারী কায়েস বিন ছারমা (রাঃ) রোজা রেখেছিলেন। যখন ইফতারের সময় হলো তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরে খাবার কিছু আছে কি-না। স্ত্রী জবাব দিলেন, "খাবার কিছু নেই তবে আপনার জন্যে কোথাও থেকে নিয়ে আসি"। হযরত কায়েস বিন ছারমা (রাঃ) সারাদিন কাজ করতেন। স্ত্রী চলে যাওয়ার পর তিনি ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন। যখন স্ত্রী-ফিরে আসলেন তখন তাঁকে নিদ্রিত দেখতে পেয়ে আফসোস করে বললেন, দুভার্গ্য আমার, এখন ইনি খাবেন কি করে! পরদিন যখন দ্বিপ্রহর হলো তখন তাঁর দুর্বলতা এত বেড়ে গেল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ ঘটনা হযরত রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পেশ করা হলো। তখন এ আয়াত নাযিল হলো।

হযরত বারা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, রমজানের রোযা ফরয হওয়ার পর সারা রমজান মাসে কেউ স্ত্রীর কাছে যেতো না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক

عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ

আয়াতখানি নাযিল করেন (বোখারী)।

আবদুল্লাহ্ এবনে কা'ব তাঁর পিতার সূত্র উল্লেখ করে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন– রমজান মাসে মানুষের অবস্থা ছিল এই, যখন কোন ব্যক্তি রাত্রে ঘুমিয়ে পড়তো তখন তার উপর পানাহার করা বা স্ত্রী-সহবাস করা হারাম হয়ে যেতো এবং পরদিন ইফতারের সময় পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকতো। একদিন হযরত ওমর

(রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে কথা-বার্তায় অনেক রাত করে ফেললেন। পরে যখন সেখান থেকে ফিরে আসলেন তখন স্ত্রী-সহবাসের ইচ্ছা করলেন। কিন্তু স্ত্রী আপত্তি জানালেন যে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, তিনি নিজে ঘুমাননি। এই বলে তিনি তাঁর আকাংক্ষা পূর্ণ করলেন। এমন ঘটনা হযরত কা'ব বিন মালেক (রাঃ) দ্বারাও সংঘটিত হলো। সকালে হযরত ওমর (রাঃ) এ ঘটনা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন। তখন উপরোক্ত আয়াত নাজিল হলো[১] (ইমাম আহ্‌মদ, এবনে জরীর ও এবনে আবি হাতেম)।

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে মানুষ যখন এশার নামায সম্পন্ন করতো অথবা নামাযের আগেই ঘুমিয়ে পড়তো তখন তার উপর পরদিন রাত পর্যন্ত পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস হারাম হয়ে যেতো। হযরত ওমর (রাঃ) যখন এশার পর স্ত্রী-সহবাস করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কাছে ওজ র পেশ করলেন, তখন তিনি এরশাদ করলেন, "হে ওমর! তোমার জন্যে এ কাজ শোভনীয় ছিল না"। এরপর যখন আরও কয়েকজন নিজেদের ব্যাপারে অনুরূপ ঘটনার কথা ব্যক্ত করলেন তখন উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয়।[২]

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

"তারা তোমাদের এবং তোমরা তাদের পোশাক, তথা একে অন্যের আবরণ"।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে চরম ও পরম গভীর ও ঘণিষ্ঠ সম্পর্ক বিরাজমান থাকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন দেহ এবং তার পরিধেয় পোশাকের সাথে। অর্থাৎ মানব দেহের সাথে তার পরিহিত পোশাক যেমন অত্যন্ত নিবিড় হয়ে থাকে, দেহ থেকে পোশাককে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ঠিক তেমনি স্বামী–স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ঘণিষ্ঠতম। বাক্যটি অতি সংক্ষিপ্ত কিন্তু তার তাৎপর্য অত্যন্ত বিস্তারিত। এ তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যে আল্লাহ পাক সংসার জীবনে স্বামী স্ত্রীর মর্যাদা, গুরুত্ব এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন।

প্রশ্ন হলো আল্লাহ্ পাক স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের আবরণ কেন বলেছেন? এ পর্যায়ে বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, "স্বামী-স্ত্রী যখন একে অন্যকে আলিঙ্গন করে তখন তারা যেন একে অন্যের জন্যে পোশাক হয়ে যায়। যেভাবে পোশাক মানুষের দৈহিক দোষ-ত্রুটি গোপন করে তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দোষ গোপন রাখে। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রীকে স্ত্রী-স্বামীকে মন্দ কাজ থেকে রক্ষা করে। এ জন্যে হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৪
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৬–৪৭

من تزوج فقد احرز ثلثى دينه

অর্থাৎ "যে বিবাহ করলো সে যেন তার দ্বীনের দু' তৃতীয়াংশ রক্ষা করলো"। এতদ্ব্যতীত যেভাবে মানুষ তার পোশাক নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে তেমনি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্যে নির্দিষ্ট করে।[১]

ভাষাগত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, এ আয়াতখানি একটি প্রশ্নের জবাব। যেন কেউ প্রশ্ন করেছে, রমজানের রাতে স্ত্রী সহবাস জায়েয হওয়ার কারণ কি? তখন জবাব স্বরূপ এরশাদ হচ্ছে যে, স্ত্রীদের ব্যাপারে সংযমী হওয়া তোমাদের জন্যে কঠিন।

অধিক মেলা-মেশা এবং ঘণিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, তোমরা একে অপরের পোশাক হয়ে গেছো। সুতরাং বেঁচে থাকা মুশকিল। এজন্যে রমজানের রাতেও স্ত্রী সহবাস জায়েয করা হলো। যেহেতু স্বামী এবং স্ত্রী একে অপরকে আলিঙ্গন করে থাকে এবং একে অপরের সাথে পোশাকের মত মিশে যায় এজন্যে স্বামী এবং স্ত্রীকে একে অপরের পোশাক রূপে অভিহিত করা হয়েছে। অথবা এমনি উপমা দেয়া হয়েছে এজন্যে যে, যেভাবে পোশাক পরিহিত ব্যক্তিকে তার পোশাক লুকিয়ে রাখে তেমনি স্ত্রী এবং স্বামী ও একে অপরকে হারাম কাজ থেকে লুকিয়ে রাখে এবং বাঁধা দেয়। এজন্যে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিবাহ করেছে সে দু' তৃতীয়াংশ দ্বীন অবলম্বন করে ফেলেছে।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) পবিত্র কোরআনের এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করে বলেছেন স্বামী-স্ত্রীর জন্যে এবং স্ত্রী-স্বামীর জন্যে শান্তি এবং সান্ত্বনার উপকরণ এজন্যে আল্লাহ্ পাক একে অন্যকে অঙ্গাবরণ বলে ঘোষণা করেছেন। এতদ্ব্যতীত আল্লামা আলুসী (রঃ) একথাও বলেছেন যেহেতু স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের দোষ গোপন রাখে এবং একে অন্যকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে তাই তাদেরকে একে অন্যের অঙ্গাবরণ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।[৩]

এমনিভাবে একে অন্যের অঙ্গাবরণ কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রহঃ) লিখেছেন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সর্বাধিক ঘণিষ্ঠতর হওয়ার কারণে একে অন্যের জন্যে পরিপূরক ও পরস্পরের দোষ-ত্রুটি গোপনকারী হিসাবে এ দৃষ্টান্ত দেয়া হয়েছে। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, মানুষের জীবনে পোশাকের যে গুরুত্ব রয়েছে তা বর্ণনাতীত তবে পোশাকের দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যনীয় ঃ

এক ঃ পোশাক মানব দেহের ত্রুটিগুলোকে গোপন রাখে।

দুই ঃ মানব দেহের সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। পবিত্র কোরআনের এই বাক্যে স্বামী স্ত্রীকে একে অন্যের অঙ্গাবরণ বলে একথার প্রতি তাগিদ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১০৬
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৪৭-৪৮
(৩) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৫

মুসলিম পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর একে অন্যের দোষ গোপনকারী হওয়া উচিত এবং পরস্পরের সৌন্দর্য তথা গুণাবলী প্রকাশ করা উচিত।[১]

মূলত আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের পবিত্র কালামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কোন দিন শেষ করা যাবে না। তবে স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের পোশাক বা অঙ্গাবরণ বলে আল্লাহ্ পাক যেন মানব সভ্যতার মূলতত্ত্ব মাত্র একটি বাক্যে বর্ণনা করেছেন। আমরা বিষয়টিকে এভাবেও দেখতে পারি যে, সভ্যতার বিকাশ সাধনে ভদ্রতা রক্ষায় এমনকি লজ্জা নিবারণে পোশাকের গুরুত্ব যেমন অনস্বীকার্য ঠিক তেমনি সভ্যতার প্রথম দিন থেকেই নর-নারী তথা স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের জন্যে একান্ত প্রয়োজনীয় পোশাকের ন্যায় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নারীকে বাদ দিলে পুরুষের জীবন অপূর্ণ আর পুরুষ ব্যতীত নারীর জীবন ব্যর্থ। অতএব, স্বামী স্ত্রী হিসেবে একের জন্যে অন্যের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। যেমন সভ্য মানুষের জন্যে পোশাক একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীকে একে অন্যের অঙ্গাবরণ বলে ঘোষণা করেছেন।

عَلِمَ اللّٰهُ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক জানতে পেরেছেন যে, তোমরা রমজান মাসের রাত্রিতে স্ত্রী-সহবাস সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ পুরোপুরি পালন করতে সক্ষম হওনি। যা নিঃসন্দেহে শাস্তি যোগ্য অপরাধ। কিন্তু আল্লাহ্ পাক দয়া করে তোমাদের এ অপরাধ ক্ষমা করেছেন। তোমাদের দুর্বলতার প্রেক্ষিতে এক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রহিত করেছেন এবং সূর্যাস্তের পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার ও কামাচারের অনুমতি প্রদান করেছেন।

فَالْئٰنَ بَاشِرُوْهُنَّ

অতএব এখন থেকে মাহে রমজানের রাত্রিকাল যে কোন সময় তোমরা স্ত্রী-সহবাস করতে পার। তবে এক্ষেত্রেও যে কথাটি বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হলো শুধু ইন্দ্রীয় তৃপ্তিই যেন স্ত্রী-সহবাসের একমাত্র লক্ষ্য না হয়, বরং আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে যে সন্তান-সন্ততি লিখে রেখেছেন তা পাওয়ার উদ্দেশেই তোমাদের এ কাজ করা উচিত। এজন্যে আল্লাহ্ পাক পরবর্তী বাক্যে এরশাদ করেছেন ঃ

وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে যা লওহে মাহ্ফুজ লিখে রেখেছেন তা কামনা কর"।

وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭১

অর্থাৎ যেভাবে রমজানের রাত্রিতে কামাচারের অনুমতি দেয়া হলো তেমনি পানাহারের অনুমতির কথাও ঘোষিত হলো।

ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ

অর্থাৎ সুবহে সাদেক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থেকে রোজা পূর্ণ কর। তবে কেউ যদি এ'তেকাফে রত হয় তবে তার জন্যে রমজানের রাত্রে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি নেই, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ

অর্থাৎ যারা এ'তেকাফের উদ্দেশে মসজিদে অবস্থান করছে তাদের জন্যে রমজানের রাত্রিতে স্ত্রী সহবাসের অনুমতি নেই।

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

অর্থাৎ মাহে রমজানের রোজা, এ'তেকাফ এবং এ পর্যায়ে যাবতীয় বিধি-নিষেধকে আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের নির্ধারিত সীমা-রেখা বলে বিশ্বাস কর। এ সীমা রেখা অতিক্রম করার তো প্রশ্নই ওঠে না; বরং এ সীমা রেখার কাছেও তোমরা যেয়ো না। কেননা এ সীমা-রেখা লংঘনের শোচনীয় পরিণতি ধ্বংস ব্যতীত আর কিছুই নয়।

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ

এভাবে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিধি-নিষেধ বর্ণনা করে থাকেন, হয়তো তোমরা আত্মরক্ষা করবে।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا
بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ ع
وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ
الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾

তরজমা

(১৮৮) আর তোমরা অন্যায় ভাবে একে অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাত করোনা এবং অপরের ধন-সম্পদ গ্রাস করার উদ্দেশে তা শাসকদের নিকট পৌছাইও না আর তা তোমরা খুব ভাল ভাবেই জান।

(১৮৯) (হে রসূল!) তারা চন্দ্র সম্বন্ধে আপনাকে প্রশ্ন করছে। আপনি বলে দিন, এ চন্দ্র মানুষের সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নিরুপক এবং তোমরা গৃহের পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর, এতে কোন পূণ্য নেই বরং পূণ্য সে ব্যক্তির যে পরহেযগারী করেছে আর গৃহ সমূহের দ্বার দিয়েই প্রবেশ করে এবং আল্লাহকে ভয় কর হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ আয়াতখানি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যার নিকট অন্যের ধন-সম্পদ থাকে। আর সম্পদের মালিকের নিকট তার কোন প্রমাণ না থাকে, এ ব্যক্তি সম্পদের মালিকের নিকট তা ফেরত দিতে অস্বীকৃতি জানায় এবং বিচারকের নিকট গিয়ে সে দায়মুক্ত হয়ে যায় অথচ সে জানে যে, তার নিকট অন্যের হক্ব রয়েছে, আর সে হক্ব না দিয়ে অবৈধভাবে অর্থ-সম্পদ সঞ্চয় করছে এবং অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। হযরত মুজাহেদ (রহঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের, একরামা, কাতাদা, হাসান, সাদী, মোকাতেল, যায়েদ এবনে আসলাম (রহঃ) প্রমুখ তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় উপরোক্ত অভিমতই ব্যক্ত করেছেন।[১]

শানে নুযুল

রবীআ এবনে আরদ্ হাজরামী নামক এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ মোকদ্দমা দায়ের করে যে, এমরাউল কায়েস নামক এক ব্যক্তি আমার অমুক জমি জবরদখল করে নিয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার নিকট এর কোন সাক্ষী আছে? সে বললো, 'না'। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করলেন ঃ এমন অবস্থায় বিবাদী এমরাউল কায়েসের শপথের উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। একথা শ্রবণ করে এমরাউল কায়েস শপথ গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হলো। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যদি তুমি মিথ্যা শপথ করে অন্যায়ভাবে তার সম্পদ ভোগ কর তবে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে এমন অবস্থায় হাযির হবে যে, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবেন। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবনে আবি হাতেম সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) থেকে।[২]

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-২, পৃষ্ঠা ৪২

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৭

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে মাহে রমজানের রাত্রে এশার নামাযের পর পানাহারকে খেয়ানত আখ্যা দেয়া হয়েছে। পরে অবশ্য মানুষের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য রেখে অনন্ত অসীম করুণাময় আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন দয়া করে মাহে রমজানের রাত্রিকালে সুবহে সাদেক পর্যন্ত পানাহার প্রভৃতি কাজের অনুমতি প্রদান করেছেন। এতদ্বারা কারও মনে এ সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে যে, রমজানের রাত্রিকালীন পানাহারকে খেয়ানত বলেও যখন তার অনুমতি দিয়েছেন এমনিভাবে হয়তো পরস্পরের অর্থ সম্পদের খেয়ানতের ব্যাপারেও অনুমতি থাকবে। তারই জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়েছে। এতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, পরস্পরের অর্থ সম্পদে খেয়ানত করা বা অন্যায় ভাবে অর্থ-সম্পদ আহরণ করা অবৈধ।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, "আর তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ আত্মসাত করোনা" অর্থাৎ কারো সম্পদের উপর মিথ্যা দাবী করা অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, কারো সত্য দাবীকে অস্বীকার করে তার উপর মিথ্যা শপথ করা অথবা কারো ধন-সম্পদ জবরদখল করা, লুণ্ঠন করা, চুরি করা, খেয়ানত করা, জুয়ার মাধ্যেমে অর্থ-সম্পদ রোজগার করা, গান-বাজনার বিনিময় গ্রহণ করা, গণকের রোজগার, ঘুষ প্রভৃতি পন্থাকে পবিত্র কোরআনে বাতিল পন্থা বলে আখ্যায়িত করেছে।[১]

উপার্জনের অবৈধ পন্থা সমূহ বাতিল

এক কথায় মানবতার অবমাননাকর, মানুষের জন্যে ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর যত পন্থা রয়েছে- সবই পবিত্র কোরআন অবৈধ বলে ঘোষণা করছে। যেমন ঘুষখোরি, চুরি-ডাকাতি, প্রতারণা, ছল-চাতুরি, পরিমাপে কম দেয়া, কুকুরের মূল্য, ব্যাভিচার-লব্ধ অর্থ, মদ ও মূর্তির ব্যবসা, গান-বাজনার পারিশ্রমিক, ভেজাল দ্রব্যের বিক্রয় তথা এমনি ধরনের যাবতীয় পন্থাকে ইসলাম অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করেছে কেননা, এসব পন্থা মানুষের জন্যে ক্ষতিকর, মানবতার জন্যে অবমাননাকর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ ঘুষ গ্রহণকারী ও ঘুষ দাতা উভয়েই দোযখে প্রবেশ করবে। আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল হারাম ঘোষণা করেছেন মদ, মৃত শুকর এবং মূর্তি বিক্রয়।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কুকুরের মূল্য, দেহ বিক্রয় ও বিনিময় এবং জ্যেতিষী গণনার পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ। (বোখারী ও মুসলিম)

প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো এক বিঘত জমিন দখল করেছে, কেয়ামতের দিন তার সাত তবক জমিন লোকটির স্কন্ধে শেকল রূপে পরিয়ে দেয়া হবে।

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫৭

হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেনঃ 'যে ব্যক্তি ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'। মুক্তিদূত হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমনিভাবে হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে এরশাদ করেছেন ঃ যে দেহ হারাম বা অবৈধ জীবিকা দ্বারা পরিপুষ্টি লাভ করেছে তা বেহেস্তে স্থান পাবে না।

আর একখানি হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেন ঃ 'সাবধান! কারও অর্থ সম্পদ তার মনের সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্যের জন্যে বৈধ নয়'।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের এরশাদ হলো কেয়ামতের দিন আমি নিজেই কয়েক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করবো তার পরিণাম কেমন শোচনীয় হবে তা সহজেই অনুমেয় (১) যে ব্যক্তি ওয়াদা করে, পরে বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে (২) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রয় করে ও তার মূল্য ভোগ করে, (৩) যে ব্যক্তি শ্রমিকদের পুরোপরি পরিশ্রম করায় অথচ তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক প্রদান করে না। কেয়ামতের দিন আমি এ তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যাব এবং তাদের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকবে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি হারাম অর্থ দ্বারা বস্ত্র ক্রয় করে পরিধান করে, তার নামায আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয় না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মানুষ দীর্ঘ মোনাজাত করে অথচ তারা যে আহার গ্রহণ করে তা অবৈধ পন্থায় অর্জিত, যা পরিধান করে তা হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থের। এমন অবস্থায় তাদের এ মোনাজাত কি করে কবুল হবে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ হারাম খাদ্য ভক্ষণ করা অপেক্ষা মৃত্তিকা ভক্ষণ করা অনেক শ্রেয়।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি দশ দেরহাম দিয়ে কোন বস্ত্র ক্রয় করে এবং সেই দশ দেরহামের মধ্যে একটি দেরহামও যদি হারাম হয় তবে যতক্ষণ সেই বস্ত্র তার পরিধানে থাকবে, ততক্ষণ তার নামাজ কবুল হবে না।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ধোকাবাজ সে আমাদের দলর্ভুক্ত নয়।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কা'ব এবনে ওজ্‌রাকে বলেছেন ঃ যে দেহের অস্থি-মজ্জা হারাম সম্পদ দ্বারা

প্রতিপালিত হয়েছে তা কখনো বেহেশ্‌ত প্রবেশ করবে না এবং একমাত্র দোযখই হবে তার জন্যে সঠিক স্থান।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি ৪টি বিষয় তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায় তবে দুনিয়া ও আখেরাতে যা কিছুই হোক না কেন ভয়ের কারণ নেই।

(১) আমানত রক্ষা করা (২) সত্য কথা বলা (৩) সৎ ভাবে জীবন যাপন করা (৪) হালাল রুজী খাওয়া। (আহ্‌মদ ও বায়হাকী)

তিরমিজী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হে লোক সকল! আল্লাহ্ পাকের জন্যে লজ্জা কর এবং লজ্জার হক্ব আদায় করো। একজন সাহাবী আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর জন্যে খুব লজ্জা করে থাকি। তার জবাবে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেলেন ঃ

একে লজ্জা বলা হয় না, বরং মস্তিষ্কের সকল ধারণাকে কেন্দ্রীভূত করে সঠিক পথে রাখতে হবে, উদরকে হারাম খাদ্য থেকে পবিত্র রাখতে হবে, মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করবে এবং কবরে হাড়গুলো পঁচে গলে যাওয়ার কথা উপলব্ধি করবে। যে ব্যক্তি পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, যে দুনিয়ার সকল সৌন্দর্য-বিলাস থেকে দূরে থাকে, যে ব্যক্তি এসব পালন করলো প্রকৃতপক্ষে সে ব্যক্তিই আল্লাহর প্রতি লজ্জার হক্ব আদায় করলো।

আর একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হলো, সে খেয়ানতের অপরাধ থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিল, সে বেহেশ্‌ত লাভ করবে। (তিরমিজী শরীফ)

হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি হারাম পন্থায় অর্থ উপার্জন করে আর তা অন্যায় পথেই ব্যয় করে, তবে আল্লাহ্ পাক তাকে অসম্মানের বিভীষিকায় নিপতিত করবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ পরিমাপে কম দেয়ার পরিণাম স্বরূপ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যেমন ব্যাভিচারের ফলে কলেরার প্রার্দুভাব ঘটে।

অন্য একখানি হাদীস হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ হালাল ও হারামের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য বিচার করবে না।

বস্তুত ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আজ সর্বত্র প্রমাণিত হচ্ছে। বর্তমান যুগে হালাল হারামের মধ্যে সাধারণত ঃ পার্থক্যই করা হয় না। এটি এ যুগের দুর্ভাগ্য, এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু পবিত্র কোরআন চিরন্তন সত্য, পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের আহবায়ক। তাই পবিত্র কোরআন সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করছে, "অন্যায় ভাবে কারো অর্থ সম্পদ আত্মসাত করোনা"।

وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) লিখেছেন, এর কয়েকটি ব্যাখ্যা হতে পারে (১) কারো ধন-সম্পদের খবর কোন অত্যাচারী শাসনকর্তাকে না দেয়া, (২) অথবা উৎকোচ প্রদানের মাধ্যেমে বিচারককে নিজের পক্ষাবলম্বনে রাজী করা এবং অন্যের ধন-সম্পদ আত্মসাত করার হীন চেষ্টা করা, (৩) এমনিভাবে মিথ্যা সাক্ষ্যের মাধ্যমে (৪) মিথ্যা শপথ করে, (৫) মিথ্যা মামলা রুজু করে, জেনে শুনে অন্যের ধন-সম্পদ গ্রাস করতে সচেষ্ট হওয়া। এসবই অন্যায়, অবৈধ, তাই পবিত্র কোরআন এ সর্মস্ত অবৈধ পন্থায় রুজী রোজগার আহরণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন অত্যন্ত কঠোর ভাষায়।[১]

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ

"(হে রসূল!) আপনাকে নতুন চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে"।

"আহেল্লাহ" হেলাল শব্দের বহুবচন, হেলাল শব্দের অর্থ নতুন চাঁদ।

শানে নুযুল

এ আয়াতের শানে নুযুল হলো, সাহাবী মাআজ এবনে জবল আনসারী (রাঃ) এবং সা'লাবা এবনে গনম আনসারী (রাঃ) প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! কি কারণে চন্দ্র প্রথম সূক্ষ্ম পরে ধীরে ধীরে তা পূর্ণ হয়। এরপর পুনরায় ধীরে ধীরে সে পূর্বের ন্যায় সূক্ষ্ম হয়ে যায়। এর জবাবে এ আয়াত নাজিল হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন ঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কিছু লোক চন্দ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে এ আয়াত নাজিল হয়।

এবনে আবি হাতেম আবুল আলীয়া থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! চন্দ্র কেন সৃষ্টি হয়েছে? তখন এ আয়াত নাজিল হয়।[২]

---

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৩৬

(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৫

পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইসলামে মাসের হিসাব চন্দ্রের হিসাবে রাখা হয়। এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম রমজান সম্পর্কে ঘোষণা করেছেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে ইফতার কর। পূর্বের আয়াতে রমজান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে আর এ আয়াতে চন্দ্র সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে। তাই এ আয়াতে চন্দ্র সম্পর্কে এ আলোচনার সাথে পূর্বের আয়াতের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে, কেননা রমজানের রোজা রাখা না রাখা নতুন চাঁদ ওঠার উপরই নির্ভরশীল। এর পরবর্তী আয়াতে হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। আর হজ্জ সম্পর্কীয় অনুষ্ঠান সমূহের সাথেও চন্দ্রের সম্পর্ক অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই রমজানের রোজা ও হজ্জের আলোচনার মাঝখানে চন্দ্রের প্রসঙ্গ শুধু সমীচীনই নয়; বরং অতি সুন্দর।

এ পর্যায়ে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সূর্য সর্বদা একই অবস্থায় থাকে। তা কোন অবস্থাতেই ছোট বড় হয় না। কিন্তু চন্দ্রের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কেননা, চন্দ্রের আকৃতির পরিবর্তন হতে থাকে। কখনো ছোট এবং কখনো বড় হয়। মূলতঃ এ কারণেই সাহাবায়ে কেরাম চন্দ্র সম্পর্কে উপরোক্ত প্রশ্ন করেছেন, তারই জবাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ هِيَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ

"(হে রসূল!) আপনি তাদেরকে জানিয়ে দিন, তা মানুষের জন্যে সময় নির্ধারক এবং হজ্জের সময় নির্দিষ্ট করার মাধ্যম"।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, চন্দ্রের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলেও আল্লাহ্ পাক সরাসরি তার জবাব না দিয়ে চাঁদের পরিবর্তনে মানুষের যে উপকার রয়েছে তার বিবরণ দান করেছেন। এতে একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যে কথা বা কাজে মানুষের কল্যাণ হয়, সে কল্যাণ বা উপকার এই পার্থিব জিন্দেগীর হোক বা পরকালীর চিরস্থায়ী জিন্দেগীর, সেদিকেই মানুষের মনোনিবেশ করা উচিত।

পক্ষান্তরে, যে কথা বা কাজে মানুষের এ জীবন ও পরজীবনের কোন কল্যাণ নেই তা থেকে বিরত থাকা মানুষের কর্তব্য। চাঁদে পরিবর্তন কেন হয় একথার জ্ঞানে কোন উপকার নেই তবে এ পরিবর্তনের ফলে উপকার কি হয় তা জানা দরকার। মানুষের শুধু এবাদত-বন্দেগীই নয়; বরং দৈনন্দিন জীবনের অনেক কিছুই চাঁদের এ পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট হয়। প্রথমতঃ রোজা এবং হজ্জের দিনগুলো নির্দিষ্ট হয় চাঁদের হিসাবের মাধ্যমে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, আদান-প্রদানের দিন তারিখ নির্দিষ্ট হওয়া, ঋণ আদায়ের সময় নির্ধারিত হওয়া, এমনকি শিশুদের দুগ্ধ-পানের হিসাব রক্ষা করা, এমনি আরো অনেক কিছু এ চাঁদের পরিবর্তনের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

এ আয়াতে যেহেতু হজ্জের উল্লেখ রয়েছে আর জাহেলিয়াতের যুগেও হজ্জ বিশেষ এবাদত রূপেই পরিগণিত হতো এবং হজ্জ সম্পর্কে অনেক কুসংস্কার প্রবর্তিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি কুসংস্কার ছিল এই, কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের জন্যে এহরাম

বাঁধার পর কোন প্রয়োজনে বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা করতো তখন বাড়ীর সম্মুখ দ্বার দিয়ে প্রবেশ করাকে দোষণীয় মনে করতো, তাদের ধারণা ছিল, এভাবে বাড়ীতে ফিরলে হজ্জের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করা হয়, এজন্যে তারা ঘরের পেছন দিক থেকে সিঁড়ি ব্যবহার করে বা দেয়াল টপকে ঘরে প্রবেশ করার প্রথা চালু করেছিল। ঘরের পশ্চাত-দ্বারে প্রবেশ করে অথবা ছাদের উপর থেকে ফাক করে ঘরে প্রবেশ করাকে তারা বিরাট সওয়াবের কাজ মনে করতো। অন্ধকার যুগের এ কুপ্রথা এবং কুসংস্কারের বাতুলতা ঘোষণা করে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا

অর্থাৎ তোমরা গৃহের পশ্চাত-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করো এতে কোন পূণ্য নেই, পূণ্য সে ব্যক্তির যে পরহেযগারী করে এবং যে আল্লাহ্কে ভয় করে।

অতএব, জীবনের সকল অবস্থায় আল্লাহ্ পাককে ভয় করাই হলো মূল পূণ্য কাজ, তোমরা ঘরের সদর দরজা দিয়েই প্রবেশ করো, আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক, এতেই রয়েছে তোমাদের সাফল্য।[১]

এ আয়াত সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে কিছু লোক যেমন কেনানা এবং খাজাআ গোত্রের কেউ কেউ এহরাম অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করার প্রয়োজন হলে অন্ধকার যুগের কু-প্রথা মোতাবেক ঘরের পশ্চাত-দ্বার দিয়ে বা ছাদ ফাঁক করে ঘরে প্রবেশ করেছিলেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং এটি যে বর্জনীয় কু-প্রথা তা ঘোষিত হয় এবং আল্লাহ্কে ভয় করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। এহরাম অবস্থায় ঘরের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করায় শরীয়ত মোতাবেক কোন বাধা নেই- একথাও ঘোষণা করা হয়।[২]

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১০৮
(২) তফসীরে হক্কানী পারা, ২ পৃষ্ঠা ৫০

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا
تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ
ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ
مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ
فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ الْكٰفِرِيْنَ ۝
فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ
فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى
الظّٰلِمِيْنَ ۝

তরজমা

(১৯০) আর তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ কর তাদের সাথে, যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে এবং সীমা লংঘন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

(১৯১) আর তাদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর এবং তাদেরকে বহিষ্কার কর যেখান থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে কারণ, অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর। যে পর্যন্ত কাফেররা পবিত্র কা'বা শরীফের নিকট তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে যেখানে যুদ্ধ করোনা, তবে যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তোমরাও (সেখানেই) তাদেরকে হত্যা কর, এভাবেই হয় কাফেরদের শাস্তি।

(১৯২) অতঃপর তারা যদি ক্ষান্ত হয় তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অতিশয় ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

(১৯৩) আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ পাকের হুকুমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, অতঃপর যদি তারা ক্ষান্ত হয় তবে অত্যাচারীরা ব্যতীত কারো সাথে শত্রুতা নাই।

তফসীরুল কোরআন

পূর্বের আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্বের আয়াতে এরশাদ হয়েছে, গৃহের পশ্চাত-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা কোন সৎ কাজ নয়; বরং প্রকৃত সৎ কাজ হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা। আর তাকওয়া পরহেযগারীর অন্যতম শাখা হলো আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করা, অন্যায়-অসত্যের মূলোৎপাটন করা, আল্লাহ্‌র যমীনকে তাঁর নাফরমানী থেকে পবিত্র রাখা যদ্বারা যুগ যুগ ধরে মানুষ উপকৃত হয়, মানবতার কল্যাণ সাধন হয়, এজন্যে এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

শানে নুযুল

হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর যমানা থেকে পবিত্র মক্কা ছিল শান্তির নগরী। এতে ছিল সকলের জন্যে নিরাপত্তা। এখানে মারামারি, হত্যাকাণ্ড, জুলুম-অত্যাচার তো দূরের কথা দুশমনকেও কেউ মন্দ কথা বলতো না।

এমনিভাবে 'আশহুরে হুরুম' তথা সম্মানিত মাস সমূহে সারা আরবে যুদ্ধ বন্ধ থাকার নিয়ম প্রচলিত ছিল।

ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাসে ১৪শত সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওমরার উদ্দেশে মদীনা শরীফ থেকে রওনা হন। মক্কা শরীফের অদূরে অবস্থিত হোদায়বিয়া নামক স্থানে পৌঁছলে মক্কার পৌত্তলিকরা তাঁকে বাধা প্রদান করে। কয়েকদিন তাঁকে এখানে অবস্থান করতে হয় এবং অনেক কথাবার্তার পর অবশেষে একটি "যুদ্ধ নয়" চুক্তি সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি অনুসারে এ বছর ওমরা না করেই মুসলমানগণকে মদীনা মোনাওয়্যারায় ফিরে যেতে হয়। পরবর্তী বছর মুসলমানগণ মক্কায় এসে ওমরা করবেন এবং তিনদিন অবস্থান করতে পারবেন।

সপ্তম হিজরীতে যখন ওমরার উদ্দেশে মক্কা শরীফ রওয়ানা হওয়ার ইচ্ছা করেন তখন এ প্রশ্ন সাহাবায়ে কেরামের মনে উত্থিত হয়, যদি পৌত্তলিকরা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং নিরস্ত্র-প্রায় মুসলমানদের প্রতি আক্রমণ করে বসে তখন মুসলমানরা কি করবেন? কেননা, মক্কা নগরী হলো শান্তি-ধাম, এতদ্ব্যতীত সম্মানিত মাস সমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে। এমনি অবস্থায় মুসলমানদের জন্যে কোন্ পথ গ্রহণীয় হবে? এ প্রশ্নের জবাবেই আল্লাহ্ পাক এ আয়াত সমূহ নাযিল করেছেন। এরশাদ হয়েছে, পবিত্র মক্কা শরীফ এবং সম্মানিত মাস সমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু যদি পৌত্তলিকরা শান্তি চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয় তবে হে মুসলমানগণ! তোমরা যুদ্ধ কর আল্লাহ্‌র রাহে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা নিজেরা সীমা লংঘন করোনা।[১] যুদ্ধকালে নারী-শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে

(১) তফসীরে হক্কানী ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৫১

হত্যা করোনা, একথা নিশ্চতভাবে জেনে রেখ, যারা সীমা লংঘন করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন না।

وَلَا تَعْتَدُوْا

"এবং সীমা লংঘন করোনা"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ সীমা লংঘন না করার অর্থ হলো নারী-শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মযাজক এবং শান্তি চুক্তিকারীদেরকে হত্যা না করা।

হযরত বোরায়দা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখনই কোন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করতেন তখন এই নসীহত করতেন যে, আল্লাহ্র নামে-আল্লাহ্র রাহে জেহাদ কর, যে আল্লাহ্র অবাধ্য, যে আল্লাহ্র নাফরমানী করে তার সাথে লড়াই কর, তবে লড়াইর ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করোনা আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করোনা এবং নারী-শিশু ও বৃদ্ধদেরকে হত্যা করোনা। আল্লামা বগভী (রঃ) এই হাদীসের উল্লেখ করেছেন।

আর ইমাম মুসলিম (রঃ) এ মর্মে একখানি সুদীর্ঘ হাদীস সংকলন করেছেনঃ তাতে একথাও রয়েছে যে, নিহতদের হস্ত-পদ কর্তন করোনা আর শিশুদেরকেও হত্যা করোনা।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৈন্যবাহিনী প্রেরণের সময় বলতেন, আল্লাহ্র নামে এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মিল্লাতে তোমরা এগিয়ে যাও। তবে বৃদ্ধ, শিশু এবং মহিলাদেরকে হত্য করোনা। গণীমত তথা-যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে খেয়ানত করোনা, গণীমতের সম্পদ সমূহ একত্রিত কর, নিজের সকল অবস্থাকে সঠিক রাখ, মানুষের প্রতি এহসান কর, নিশ্চয় নেককার লোকদেরকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আবু দাউদ (রঃ)।[১]

আল্লাহর নাম বুলন্দ করার সাধনা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, হযরত আবুল আলীয়া (রঃ) বর্ণনা করেন, মদীনা শরীফে জেহাদের প্রথম হুকুম এ আয়াত দ্বারা অবতীর্ণ হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াতের আলোকে শুধু তাদের সাথে লড়াই করতেন যারা তাঁর সাথে যুদ্ধরত হতো। আর যারা তাঁর সাথে যুদ্ধ করতো না তিনিও তাদের সাথে লড়াই করতেন না। এ অবস্থা সূরায়ে বারাতের নির্দেশ জারী হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ইমাম মুসলিম (রঃ) সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা ইতোপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) অন্য একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে রয়েছে।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৩

একবার এক যুদ্ধে একজন নিহত মহিলার লাশ দেখতে পেয়ে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং মহিলা ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করলেন।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত আরও একখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যা বর্ণনা করেছেন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)। তিনি বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়, এক ব্যক্তি স্বীয় বীরত্ব প্রকাশ করার জন্যে যুদ্ধ করে, আর এক ব্যক্তি নিজের গোত্রীয় সম্মানের খাতিরে যুদ্ধ করে, আর অন্য এক ব্যক্তি যুদ্ধ করে লোক দেখানোর জন্যে– এদের মধ্যে কে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্‌র রাহে সে ব্যক্তিই জেহাদ করে যে শুধু এজন্যে যুদ্ধরত হয় যেন আল্লাহ্ পাকের কথা বুলন্দ হয়, আল্লাহ্‌র দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে সংকলিত আরও একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি মানুষের সাথে জেহাদ করি যে পর্যন্ত না তারা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলে, যখন তারা এ কালেমা উচ্চারণ করবে তখন তারা আমার পক্ষ থেকে নিজের প্রাণ এবং সম্পদ রক্ষা করবে। তবে শুধু ইসলামী হুকুমের ব্যাপারে (অর্থাৎ যদি ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত কোন শাস্তি প্রয়োগ করতে হয় তবে তা অবশ্যই ভোগ করতে হবে)। তাদের বাতেনী হিসাব আল্লাহ্‌র হিসাব আল্লাহ্‌র নিকট। এরপর তিনি এরশাদ করেছেনঃ যদি এ কাফেররা শেরক এবং কুফর অবস্থায় থেকেও তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে বিরত হয় তবে তোমরাও তাদের ব্যাপারে বিরত হও। এরপর যে যুদ্ধ করবে সে জালেম হবে।[১] আর জালেমকে তার জুলুমের বদলা দেয়া জরুরী।

وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ

অর্থাৎ হরম শরীফের ভেতরে বা বাইরে যেখানে কাফেরদেরকে পাও হত্যা কর।

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন, এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী মুহাজেরদেরকে আর যাদেরকে হত্যা করার আদেশ দেয়া হয়েছে তারা হলো মক্কার কাফের।[২]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর, (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৪–৪৫
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা, ১২৯

তাই পরবর্তী বাক্যে বলা হয়েছে (হে মুসলমানগণ!) যে মক্কা থেকে তারা তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার কর।

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

'ফেৎনা' শব্দের আভিধাণিক অর্থ হলো পরীক্ষা যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক অন্যত্র এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের জন্যে একটি পরীক্ষা। যদি মানুষ ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততির মোহে আচ্ছন্ন হয়ে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ কে ভুলে যায়, যদি এ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার লোভে আকৃষ্ট হয়ে চিরস্থায়ী জিন্দেগী আখেরাতের কথা ভুলে যায় তবে সে জীবনের এ পরীক্ষায় ব্যর্থ হয় এজন্যেই আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন ঃ

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِاللهِ

"হে মোমেনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহ্র জিকর থেকে গাফলতের আর্বতে নিপতিত না করে"।

এতদ্ব্যতীত, জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সকল অবস্থাই মানুষের জন্যে একটি পরীক্ষা। সুখ বা আনন্দে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয়। আর দুঃখ বা বিপদে সবর অবলম্বন করতে হয়। যারা ইসলামের নির্দেশিত এ নীতি অনুসরণ করে তারা জীবন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

যাহোক, এ-তো হলো 'ফেৎনা ' শব্দের আভিধাণিক অর্থ। আলোচ্য আয়াতে ফেৎনা শব্দ দ্বারা আল্লাহ্র সাথে শেরক্ ও মূর্তি পূজাকে বোঝানো হয়েছে বলে অভিমত প্রকাশ করছেন হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)।[১]

অতএব, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ-বিগ্রহ, মারামারি, খুন-খারাবি অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এজন্যে তা বর্জনীয়। তদুপরি হরম শরীফে অথবা পবিত্র মাস সমূহে খুন-খারাবী বা হত্যাকাণ্ড আরও বেশী নিন্দনীয়। কিন্তু আল্লাহ্র সাথে শেরক্, মূর্তি পূজা, মানুষকে সত্য ধর্ম গ্রহণে বাধা দেয়া, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত রাখার অপচেষ্টা করা হরম শরীফে হত্যাকাণ্ড থেকেও বড় অপরাধ। মক্কা শরীফ অবশ্যই সম্মানিত শহর। শান্তি ও নিরাপত্তার কেন্দ্র-ভূমি। কিন্তু যদি কাফেররা এ পবিত্র শহরের শান্তি ভঙ্গ করে এবং হত্যার ন্যায় অপরাধ করে বসে তবে এমন অবস্থায় দুস্কৃতকারীদের

(১) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস পৃষ্ঠা, ২৬

মোকাবেলা করা সত্য-সাধক মোমেনদের একান্ত কর্তব্য। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে- যে পর্যন্ত কাফেররা কা'বা শরীফের নিকট তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে সে পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ করোনা। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে সেখানেই তাদেরকে হত্যা কর। এভাবেই হয় কাফেরদের শাস্তি অর্থাৎ এ শাস্তি সমূহ যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে যেমন দেশত্যাগে বাধ্য করা এবং হরম শরীফে হত্যা করা কাফেরদের জন্যে সমুচিত শাস্তি।[১] কেননা, মক্কাবাসী কাফেররা মুসলমানদের প্রতি সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়ন করেছে, এমনকি মুসলমানদেরকে মক্কা শরীফ থেকে বহিষ্কার করেছে। তারা প্রথমে আবিসিনিয়া পরে মদীনা মোনাওয়্যারা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। শুধু তাই নয়; বরং স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত হিজরত করতে বাধ্য হয়েছেন। তাই সত্য ও ন্যায়ের জন্যে, সুবিচার কায়েম করার প্রয়োজনে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে নির্দেশ দিয়ছেন দুবৃত্ত কাফেরদের যথোপযুক্ত ও সমুচিত শাস্তি দেয়ার জন্যে। মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে এ শাস্তির ব্যবস্থা। এতদসত্ত্বেও পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَإِنِ انْتَهَوْا

অর্থাৎ যদি মুশরেকরা তাদের অন্যায় আচরণ থেকে বিরত হয় তথা ইসলাম কবুল করে তবে তাদের তওবা কবুল হবে। ইসলাম গ্রহণের প্রয়াস প্রশংসনীয় এবং তাদের অতীত অপকর্ম ক্ষমা করা হবে।

فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

"আর তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয় এবং আল্লাহ্ পাকের হুকুমত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়"।

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক জেহাদের মূলনীতি ও তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এরশাদ করেছেন। জেহাদের উদ্দেশ্য আদৌ ব্যক্তিগত শত্রুতা উদ্ধার বা প্রতিশোধ গ্রহণ নয়, কোন প্রকার স্বার্থ উদ্ধার এর লক্ষ্য নয়; বরং মানবতার বৃহত্তর কল্যাণেই ইসলাম জেহাদের কল্যাণকর বিধান প্রবর্তন করেছে। সমাজ জীবনের অশান্তি দূর করার লক্ষ্যে বিশ্ব মানবকে যারা সত্য ও ন্যায় থেকে বঞ্চিত করতে চায় তাদের প্রতিরোধ-কল্পে, সভ্যতার বিকাশ সাধনের প্রয়োজনে, সুবিচার কায়েম করার তাগিদে ইসলাম জেহাদের

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৫

বিধান প্রবর্তন করেছে। মানব দেহে যদি কোন ক্ষত দেখা দেয় আর তা দেহ-রাজ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে তখন চিকিৎসক মাত্রই দেহের ঐ ক্ষতকে অস্ত্রোপচার করে অশান্ত, অসুস্থ দেহকে শান্ত ও সুস্থির করেন, ঠিক তেমনি মানব সমাজে যখন অন্যায়-অসত্য, অনাচার-অত্যাচার, অবিচার অহরহ হতে থাকে এবং অন্যায়কারীদের দৌরাত্ম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তখন ইসলাম জেহাদের নির্দেশ দেয়, এজন্যেই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ দিয়েছেন, তোমরা কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না অশান্তি দূরীভূত হয়। অতএব, যখন শান্তি স্থাপিত হয় যখন দুবৃত্ত জালেমরা জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত হয়, জুলুমের মূল উৎস শেরক থেকে তওবা করে তখন তোমরা তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত হও। তবে যদি এতদসত্ত্বেও কেউ বাড়াবাড়ি করে এমন জালেমদের বিরূদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি রয়েছে।

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ
فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۹۴﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۹۵﴾

তরজমা

(১৯৪) আর সম্মানিত মাসের বদলে সম্মানিত মাস এবং এ সম্মান সমূহ বিনিময়মূলক, অতএব যে কেউ তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তার প্রতি-উত্তর কর, যেভাবে সে তোমাদের উপর নির্যাতন করেছে, আর আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাকে আর নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখ যে আল্লাহ্ পাক পরহেযগারদের সাথেই আছেন।

(১৯৫) আর তোমরা আল্লাহ্ পাকের পথে ব্যয় কর আর নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা। আর সৎ কাজ কর নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নেককার লোকদেরকে পছন্দ করেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের মর্ম হচ্ছে ঃ বিগত বছর এ জিলক্বদ মাসেই পৌত্তলিকরা তোমাদেরকে মক্কায় প্রবেশে বাধা দিয়েছিল। আজ তোমরা নিশ্চিন্ত মনে ওমরাহ্ কর, অতীতের বদলা গ্রহণ কর। কেননা সম্মানের পরিবর্তে সম্মান সুনিশ্চিত। যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে তবে তোমরা যুদ্ধ করোনা। গত বছর তারা তোমাদেরকে মক্কা শরীফ প্রবেশে বাধা দিয়েছিল, সম্মানিত মাস, হরম শরীফ এবং এহ্রামের কোন সম্মান পৌত্তলিকরা রক্ষা করেনি। তবু তোমরা ধৈর্য ধারণ করেছ, নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করেছ। এবারো যদি তারা অনুরূপ আচরণ করে তথা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হতে চায় তবে তোমরা পূর্বের ন্যায় নিষ্ক্রিয় থেকো না; বরং তাদেরকে সমুচিত জবাব দাও। কিন্তু সকল অবস্থায় যাবতীয় কর্ম-কাণ্ডে শুধু এক আল্লাহ্ পাককে ভয় করবে। আল্লাহ্ পাকের মর্জির খেলাফ কিছু করবে না। অতএব, আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক পরহেযগার লোকদের সঙ্গে রয়েছেন।[১]

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, সপ্তম হিজরীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ওমরাহ্র উদ্দেশে মক্কা শরীফ রওয়ানা হন তখন একথা প্রচারিত হয় যে এবারো পৌত্তলিকরা মুসলমানদেরকে বাধা দেবে। এ অবস্থায় মুসলমানগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন যে জিলক্বদ মাস তো সম্মানিত মাস সমূহের অন্যতম। এ সম্মানিত মাসে কি করে যুদ্ধ করবো, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। এ মর্মে যে "সম্মানিত মাসের বদলে সম্মানিত মাস"। অতএব, যে তোমাদের প্রতি এ পবিত্র মাসে বাড়াবাড়ি করবে তোমরাও তাদের প্রতি তদ্রুপ বাড়াবাড়ি কর। যেভাবে এ মাসের সম্মান তাদের করতে হয় তেমনি তোমাদেরও করতে হয়। কিন্তু তারা যদি এ মাসের সম্মান রক্ষা না করে এবং তোমাদের প্রতি হামলায় উদ্যত হয় তবে তাদের সমুচিত শাস্তি বিধান করা তোমাদের কর্তব্য।[২]

ইমাম রাজী (রঃ) তাঁর তফসীরে এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম হাসানের একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সে বর্ণনা এই ঃ পৌত্তলিকরা যখন শ্রবণ করলো যে আল্লাহ্ পাক সম্মানিত মাসে হত্যাযজ্ঞ করতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বাধা দিয়েছেন তখন তারা তাঁর মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। আর তারা একথা মনে করলো যে, তিনি তাদের মোকাবেলা করবেন না । তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাজিল করেন এবং ঘোষণা করলেন, পৌত্তলিকদের মধ্যে যারা তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তোমরাও তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি কর।

---

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী ৩, পৃষ্ঠা ৩৭

(২) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩২

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে আরো বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলোঃ যখন সম্মানিত মাস সমূহ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র অবাধ্য হতে বাধা দেয় না তখন কিভাবে আমাদেরকে তোমাদের মোকাবেলা করতে বাধা দেবে?[১]

এ আয়াতের ব্যখ্যায় মওলানা আবদুল হক্ব হক্কানী (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যদি পৌত্তলিকরা সম্মানিত মাস এবং মসজিদে হারামের তা'যীম এবং আদব করে তাহলে তোমরাও এই সময় এবং এ স্থানের প্রতি সম্মান করে তাদের সাথে লড়াই করোনা। কিন্তু যদি তারা নিজেরাই তোমাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তবে তাদের সমুচিত শাস্তি বিধানে তোমরা এতটুকু বিলম্ব করোনা। আর সকল অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করতে থাক।[২]

আল্লাহর রাহে জেহাদ পরিত্যাগ-ধ্বংস ডেকে আনে

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

আর তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর, অর্থাৎ ইসলামের জন্যে সত্য ও ন্যায়ের জন্যে জেহাদে এবং অন্যান্য জাতীয় প্রয়োজনে অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে গাফলত করোনা, এসব ব্যাপারে গাফলতের পরিণাম হলো ধ্বংস। অতএব, তোমরা নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিওনা, কেননা যদি তোমরা জেহাদ বর্জন কর, আল্লাহর রাহে ব্যয় করার ব্যাপারে গাফলত কর, তবে তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে। ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত হোজায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলন করেছেন, তাতে রয়েছে, এ আয়াত জেহাদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

এমনিভাবে আবু দাউদ (রঃ), তিরমিজী (রঃ), এবনে হাব্বান এবং হাকেম (রঃ) হযরত আবু আইউব (রাঃ), থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ আয়াত নাজিল হয়েছে আনসারদের সম্পর্কে। ঘটনার বিবরণ এই, আল্লাহ পাক যখন ইসলামকে বিজয়ী করেছেন, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তখন আমাদের মধ্যে কিছু লোক বলতে লাগলো আল্লাহ্‌ পাক যখন ইসলামকে বিজয় দান করেছেন, তখন আর জেহাদের প্রয়োজন নেই-জেহাদের জন্যে ইতিপূর্বে আমরা যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছি, তা পুষিয়ে নেয়ার উপযুক্ত সময় এসেছে।

এসব কথার বাতুলতা ঘোষণা করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ জেহাদের ব্যাপারে গাফলত করা জেহাদে অর্থ–সম্পদ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকার পরিণাম হলো নিশ্চিত ধ্বংস। অতএব, হে মোমেনগণ! তোমরা ধ্বংসের পথ ধরোনা।

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩৭
(২) তফসীরে হক্কানী পারা ২, পৃষ্ঠা ৫৮

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো, "হে মুসলমানগণ! যদি তোমরা জেহাদ পরিত্যাগ কর তবে দুশমন তোমাদের উপর বিজয়ী হবে আর তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে"।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন; এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর হযরত আবু আইউব আন্‌সারী (রাঃ) সর্বদা আল্লাহ রাহে জেহাদে মশগুল থাকতেন, অবশেষে তিনি আল্লাহর রাহে জেহাদ করে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো, আর জেহাদ করলো না আর কখনো জেহাদের ইচ্ছাও করেনি তবে সে নেফাকের একটি শাখা নিয়ে মৃত্যু বরণ করলো।[১]

হযরত যাহ্যাক এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেনঃ আনসারগণ সর্বদা আল্লাহর রাহে মুক্ত হস্তে দান করতেন কিন্তু একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আল্লাহর রাহে দান থেকে বিরত হলেন, তখন এ আয়াত নাজিল হয়। হযরত ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেছেনঃ এ আয়াতের অর্থ হলো আল্লাহর রাহে ব্যয় করার ব্যাপারে কার্পণ্য করা। হযরত নোমান এবনে বশীর (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলছেন, এর অর্থ হলো কোন গুনাহগার ব্যক্তির আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং এভাবে গুনাহ্‌র কাজে মশগুল থাকা। এটিই হলো নিজেকে ধ্বংস করা।

এ আয়াতের আরও একটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে, বর্ণিত আছে কোন কোন ব্যক্তি জেহাদ শরীক হতেন কিন্তু পথ-খরচ বাবদ কোন অর্থ-সম্পদ সঙ্গে নিতেন না, ফলে কষ্ট পেতেন অথবা নিজেকে অন্যের বোঝায় পরিণত করতেন। উভয় পথই অপছন্দনীয়, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ "তোমরা আল্লাহর রাহে ব্যয় কর আর নিজেকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিওনা"।[২]

এরপরই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَأَحْسِنُوْا

অর্থাৎ তোমরা সৎ কাজ কর, আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে অর্পিত ফরজ সমূহ আদায় কর আর আল্লাহর রাহে দানের ব্যাপারে সৎ কাজ কর। যাদের সাহায্য করা দরকার তাদের সাহায্য কর কেননা, যারা নেককার যারা সৎ কাজ করে আল্লাহ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন।

---

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৭-৬৮

(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭

তফসীরে কবীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৩৭

তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৭

এহ্সানের তাৎপর্য

'এহ্সান' কি ? এ সম্পর্কে হযরত ওমর (রঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একবার জিব্রাঈল (আঃ) হাযির হলেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে এবং এই প্রশ্ন করেন ঃ এহ্সান কি? এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন। তিনি এরশাদ করলেন এহ্সান হলোঃ তুমি এভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ, যদি তুমি না দেখতে পার তবে অন্ততঃ একথা বিশ্বাস কর যে, তিনি তোমাকে দেখছেন অর্থাৎ মনের একাগ্রতা নিয়ে, হুজুরে ক্বল্ব সহ আল্লাহর এবাদত করাই হলো এহ্সান অতএব যারা এভাবে আল্লাহর এবাদত করে, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন।

আর ব্যবসা-বাণিজ্য, লেনদেন বা পরস্পরের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এহ্সান হলো, মানুষ নিজের জন্যে যা পছন্দ করে অন্যের জন্যেও তা পছন্দ করা, প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে পর্যন্ত তুমি নিজের জন্যে যা পছন্দ কর তা অপরের জন্যে পছন্দ না কর সে পর্যন্ত প্রকৃত মোমেন হতে পারবে না। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মুসলমান সে ব্যক্তি যে অন্য মুসলমানকে তার রসনা ও হাত থেকে নিরাপদ রাখে, অর্থাৎ যে অন্য মুসলমানকে কোন ভাবেই কষ্ট দেয় না সে-ই হলো প্রকৃত মুসলমান। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আমার সবচেয়ে প্রিয়, যার আচার-ব্যবহার সবচেয়ে ভাল, যে চরিত্র মাধুর্যের অধিকারী।

অতএব, এভাবে যে অন্য মুসলমানকে কষ্ট না দেয় বরং পরোপকারে আত্মনিয়োগ করে, মানুষের কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়, দুর্গত মানবতার সেবা করে সে-ই মুহ্সিন বা নেককার, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এমন নেক আমল করার আদেশ দিয়েছেন এবং নেককার লোকদের আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন একথাও ঘোষণা করেছেন।

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ۭ فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ۭ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ
اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۠ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا
اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ
سَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ۭ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ
حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ ۝ ع

তরজমা

(১৯৬) আর তোমরা শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণভাবে সম্পাদন করে। কিন্তু যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তবে কোরবানীর জন্যে যা সহজ লভ্য হয় তা প্রেরণ কর এবং যে পর্যন্ত কোরবানীর পশু তার নির্দিষ্ট স্থানে না পৌঁছে সে পর্যন্ত তোমরা মস্তক মুণ্ডন করোনা। তবে তোমাদের মধ্য থেকে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা তার মাথায় যন্ত্রণা বোধ করে তাহলে তার পরিবর্তে সে রোজা রাখবে বা খয়রাত অথবা কোরবানী দ্বারা তার 'ফেদিয়া' দেবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন তোমাদের মধ্যে যে হজ্জের প্রাক্কালে ওমরাহ্ দ্বারা লাভবান হতে চায় সে সহজ লভ্য কোরবানী দেবে। তবে যদি কেউ কোরবানীর জন্তু না পায়, তাকে হজ্জের সময় তিন দিন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করার পর সাত দিন রোজা রাখতে হবে। এভাবে দশ দিন পূর্ণ হবে এবং আদেশ তার জন্যে যার পরিবারবর্গ মসজিদুল হারামের প্রতিবেশী নয়। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক এবং একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাকের শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

ইতোপূর্বে মাহে রমজানের সিয়াম সাধনা সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এরপর জেহাদের বিবরণ স্থান পেয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে হজ্জ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে।

হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম

এ সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ "আর তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণভাবে সম্পাদন কর"। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হজ্জ এবং ওমরাহ্ শুরু করার পর অবশ্যই সম্পূর্ণ করা উচিত। ওলামায়ে কেরাম এ সম্পর্কে একমত যে, হজ্জ ও ওমরাহ্ শুরু করার পর তা পূর্ণ করা একান্ত কর্তব্য। এখন প্রশ্ন হলো– হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ করার তাৎপর্য কি? হযরত আলী (রাঃ) বলেছেনঃ এর তাৎপর্য হলো নিজের বাড়ী থেকে এহ্রাম বাঁধা অর্থাৎ হজ্জ বা ওমরাহ্র উদ্দেশেই সফর শুরু করা।

হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেনঃ হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ করার আদেশের ব্যাখ্যা হলো এই, তোমরা এজন্যে নিজের বাসস্থান থেকেই এহ্রাম বাঁধ তথা এ সফর শুধু হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্যেই হতে হবে–অন্য কোন উদ্দেশে নয়। 'মীকাতে' পৌঁছার পর 'লাব্বাইক' বলতে থাক এমন যেন না হয় যে তোমরা ব্যবসা অথবা পার্থিব জীবনের অন্য কোন উদ্দেশে সফর শুরু করলে এবং মক্কা শরীফের নিকটবর্তী হওয়ার পর ইচ্ছা যে এই সুযোগে হজ্জ ও ওমরাহ্ও সম্পাদন করি। এতে হজ্জ ও ওমরাহ্ আদায় হয়ে যাবে ঠিকই তবে হজ ও ওমরাহ পূর্ণ করা হবে না। পূর্ণ করা হবে শুধু এ অবস্থায় যদি সে শুধু হজ্জ ও পূর্ণ ওমরাহ্র উদ্দেশেই ঘরথেকে বের হয়।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ হজ্জ ও ওমরাহ্র এহরাম বাঁধার পর তা পূর্ণ না করে ছেড়ে দেয়া জায়েয নয়। হজ্জ তখন পূর্ণ হয় যখন কোরবানীর দিন জমরায়ে ওকবায় কঙ্কর নিক্ষেপ করে এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফ করে (তওয়াফে যেয়ারত) এবং সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আরও বলেছেনঃ হজ্জ হলো আরাফাতের ময়দানে উপস্থিতি আর ওমরাহ্ হলো তওয়াফ।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন ঃ হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

অর্থাৎ এ ঘরের হজ্জ করা সে সব মানুষের জন্যে আল্লাহ্র নির্ধারিত একটি ফরজ, যারা সেখানে পৌঁছার সামর্থ রাখে। আর হযরত রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বস্তুর উপর রচিত।

প্রথমত ঃ এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের রসূল। দ্বিতীয়ত ঃ নামায প্রতিষ্ঠিত করা। তৃতীয়ত ঃ যাকাত প্রদান করা। চতুর্থত ঃ হজ্জ সম্পাদন করা। পঞ্চমত ঃ রমজান মাসে রোজা রাখা (বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)।

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর সূত্র উল্লেখ পূর্বক বর্ণনা করেছেন– জিব্রাঈল (আঃ) আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে অবগত করুন ইসলাম কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ একথা সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আর মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র রসূল, এবং নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, হজ্জ ওমরাহ্ করা, রমজানের রোজা পালন করা, জ ানাবতের গোছল করা এবং অজুকে পূর্ণ করা।

হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, তিনি বলেন,"আমি আরজ করলাম– ইয়া রসূলাল্লাহ্! "মহিলাদের উপরও কি জেহাদের দায়িত্ব রয়েছে"? তিনি এরশাদ করেছেন– "তাদের উপর এমন জেহাদ রয়েছে যাতে হত্যাকাণ্ড নেই আর তা হলো হজ্জ এবং ওমরাহ্"। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে এবনে মাজা শরীফে।[১]

একমাত্র উদ্দেশ্যঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ

আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

এখানে (অর্থাৎ আল্লাহ্র জন্যে) শব্দটির তাৎপর্য এই– যদিও সব আমলই আল্লাহ্র জন্যে হয় কিন্তু হজ্জ ও ওমরাহ্র ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে এজন্যে যে, হজ্জ ও ওমরাহ্র একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভ। প্রাক-ইসলামী যুগে লোকেরা মক্কা মোয়াজ্জমায় একত্রিত হতো অন্যান্য বহু উদ্দেশে। তাই পবিত্র কোরআন এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে, হজ্জ ও ওমরাহ্ হতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে।

বর্বরতার যুগে যেভাবে পার্থিব লাভ-লোভের আশায় মানুষ মক্কা মোয়াজ্জমায় একত্রিত হতো এমনিভাবে বর্তমান যুগেও হজ্জ ও ওমরাহ্র নামে ভিসা নিয়ে অর্থ-সম্পদ লাভের আশায় মক্কা ও মদীনা শরীফ সফরের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। এ পর্যায়ে কোরআনে করীমের এ সতর্কবাণী বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং আলোচ্য আয়াতের لِلّٰه শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। সূরায়ে হজ্জের যে আয়াতে হজ্জ সম্পর্কীয় বিধান ঘোষণা করা হয়েছে সে আয়াতে শব্দটিকে সর্ব প্রথম ব্যবহার করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

নিয়ত সঠিক করার তাগিদ

এখানেও لِلّٰه শব্দটির ব্যবহার করে হজ্জ যাত্রীকে সর্বপ্রথম তার নিয়ত সঠিক করার তাগিদ করা হয়েছে যেন শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হজ্জ ও ওমরাহ্ পালন করা হয়।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৯-৭০

হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ করার তাৎপর্য সম্পর্কে কোন কোন তফসীরকার একথাও বলেছেন ঃ

اَىْ اَدُّوْهُمَا تَامَّيْنِ بِشَرَائِطِهِمَا وَفَرَائِضِهِمَا لِوَجْهِ اللهِ تَعَالٰى

অর্থাৎ এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ কর– প্রত্যেকটির শর্ত ও ফরজ সমূহ আদায়ের মাধ্যমে।

হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ করার তাৎপর্য

হজ্জ ও ওমরাহ্ পূর্ণ করার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম কুরতবী (রঃ) এভাবে–

اَلَّا تَفْعَلُوْا فِيْهِمَا مَالَا يَنْبَغِىْ لَكُمْ

অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরায় এমন কাজ না করা যা তার শানের খেলাফ হয়।[১] অতএব, একথা প্রমাণিত হলো যে সর্ব প্রথম হজ্জ ও ওমরাহ্র ব্যাপারে নিয়ত সঠিক করতে হবে। অর্থাৎ শুধু এক আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই হজ্জ ও ওমরাহ্র জন্যে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত ঃ হজ্জ ও ওমরাহ্র সফরে এমন কোন কথা বা কাজে অংশ গ্রহণ করা যাবেনা যা পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ্র শানের খেলাফ হয়।

তৃতীয়তঃ হজ্জ ও ওমরাহ্ শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ফরজ হয়ে যায়, মাঝখানে তা অসম্পূর্ণ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া যায় না।

فَاِنْ اُحْصِرْتُمْ

কিন্তু কেউ যদি বাধাপ্রাপ্ত হয় বা অসুস্থ হয়ে মাঝ পথে আটকা পড়ে তবে তার জন্যে হুকুম হলো কোরবানীর জন্তু হিসেবে যা পাওয়া যায় তা মক্কা শরীফে প্রেরণ করবে এবং কোরবানীর জন্যে দিন এবং সময় নির্দিষ্ট করে দেবে। এরপর নির্দেশ মোতাবেক কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছেছে এবং সঠিক সময়ে কোরবানী করা হয়েছে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চিত হওয়ার পরই মাথা মুণ্ডন করবে। এর পূর্বে তার জন্যে মাথা মুণ্ডনের অনুমতি নেই।

উল্লেখ্য, হজ্জের ব্যাপারে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে যেমন মুসলমান বা কাফের দুশমনের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হওয়া অথবা অসুস্থ হওয়া বা পথ-খরচ বিনষ্ট হওয়া অথবা কোন মহিলার মোহরেমের মৃত্যু হওয়া। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) হজ্জের পথে বাধা প্রাপ্ত হওয়ার এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[২]

এ পর্যায়ে হজ্জের তাৎপর্য, ফজিলত ও নিয়ম কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা।

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৭
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৭৪

হজ্জের তাৎপর্য ও নিয়ম কানুন

যিনি লালন-পালন করছেন আমাদেরকে, যাঁর অনন্ত অসীম রহমতের মহাসমুদ্রে আমরা চির নিমজ্জিত, যিনি আমাদের প্রাণ তথা আমাদের জীবন ও জীবনের সর্বস্ব এক কথায় সবকিছুর স্বত্ত্বাধিকারী মালিক, সেই আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে হাযির হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায় হজ্জের মাধ্যমে। প্রেমময় আল্লাহ্ পাকের প্রেমসুধা পান করার জন্যে বছরে একবার ভক্ত-প্রেমিক বন্দাদেরকে তিনি সুদূর আরবের মরুভূমির বুকে অবস্থিত মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় হাযির হওয়ার আহ্বান জানান। এ আহ্বানে শুধু তারাই সাড়া দিতে পারে সত্যিকার অর্থে যারা ভাগ্যবান, যাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন, যাদের কিসমত বুলন্দ, যাদের নসীব ভাল, শুধু তারাই আহক্বামুল হাকেমীন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারের এ আহ্বানে সাড়া দিতে পারে। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَأَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَّعَلٰى كُلِّ ضَامِرٍ يَّأْتِيْنَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ (সূরা হজ্জ)

পবিত্র কা'বা শরীফ তৈরী হওয়ার পর আল্লাহ্ পাক হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে এ নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'হে ইব্রাহীম! মানুষের মধ্যে হজ্জের জন্যে আহ্বান কর'। তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আরজ করেছিলেন ঃ 'হে আল্লাহ! এখানে তো কোন আদম সন্তান নেই যাকে এই আহ্বান জানাবো'। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছিলেন, 'ইব্রাহীম! কা'বা শরীফের হজ্জের জন্যে ডাক দেয়া তোমার কাজ, আর এ ডাক মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া আমার কাজ'।

হাদীস শরীফে আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এ ডাক আল্লাহ্ পাক দুনিয়ার সর্বত্র পৌঁছে দিয়েছেন এবং যে যতবার এ ডাক শুনেছে সে ততবার আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হওয়ার তওফিক পাবে। আল্লাহ্ পাকের রহমতে হজ্জের সফরের সুযোগ হলে আল্লাহ্ পাকের সে তওফিকেরই বহিঃপ্রকাশ মনে করতে হবে। কোরআনে করীমের সূরা আলে-এমরানে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পবিত্র কা'বা শরীফের হজ্জ করা মানুষের কর্তব্য। অবশ্য তার জন্যে যে আল্লাহ্ পাকের ঘরে পৌঁছার সামর্থ রাখে। আর যে আল্লাহর অবাধ্য হয় তথা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও এ কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয় তার জানা উচিত (সে নিজেরই ক্ষতি করে কেননা) আল্লাহ পাক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগত থেকে বে-নিয়াজ।

বস্তুতঃ যাঁর প্রেমের আগুন বুকে নিয়ে, যার চিন্তায় মগ্ন থেকে, যাঁর ধ্যানে তন্ময় অবস্থায় কেটেছে আল্লাহর বন্দার পূর্ণ একটি মাস মাহে রমজান। যখন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, ভোগ-বিলাস আরাম-আয়েশ কোন কিছুই আল্লাহর প্রেমিক বন্দাকে আকৃষ্ট করতে

পারেনি, আল্লাহর ভক্ত প্রেমিক বন্দাকে তিনি সব কিছু সইবার শক্তি দিয়েছেন এবং ধৈর্য বা সবরের পরীক্ষায় আল্লাহ্ পাক তাকে উত্তীর্ণ করেছেন, তাই মাহে রমজানের পর তারা পেয়েছে খুশীর ঈদ। এরপর সেই প্রেমিক বন্দাদের মধ্য থেকে আল্লাহ্ পাক কিছু সংখ্যক প্রিয় বন্দাকে পছন্দ করেছেন তাঁর মহান দরবারে হাযির হওয়ার জন্যে। এহরাম অবস্থায় প্রেমের সাজ পরিধান করে তথা সেলাই বেহীন দু' খানা শুভ্র বস্ত্র খণ্ডই আজ প্রেমিক বন্দার অঙ্গের ভূষণ। অর্ধ নগ্ন পা, উলঙ্গ মাথা এসবই প্রেমের সাজ, আল্লাহ্র প্রতিটি প্রেমিক বন্দা পেছনে ফেলে এসেছে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পুত্র-পরিজন কিন্তু কারো মায়া তাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি, তার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি কেননা, তার বুকে রয়েছে আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের, তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের অদম্য পিপাসা, তার প্রাণের গোপনতম প্রকোষ্ঠে রয়েছে প্রেমময়ের প্রেমের লেলিহান বহ্নিশিখা, প্রত্যেকের মুখে আজ একই ভাষা আর প্রত্যেকের কণ্ঠে একই সুর, 'হে মালিক, হে মওলা, তোমার ভিখারী আমরা সকলে তোমার দুয়ারে হাযির, লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা-লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা, ওয়ান্নেমাতা লাকা, ওয়াল মুলক, লা-শরীকা লাকা'।

অতএব, মনের এ ভাব নিয়ে, প্রাণের এ উন্মত্ত আবেগ নিয়ে হজ্জের সফর শুরু করতে হয়। এ সফরের আদব শিক্ষা দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

যে ব্যক্তি এ মাসগুলোতে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জ করার দৃঢ় ইচ্ছা করেছে, সে রাফাস পরিহার করবে, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ-দ্বন্দ্ব, ঝগড়া-ফ্যাসাদ বর্জন করে চলবে। যে এভাবে হজ্জের সকল আরকান-আহকাম আদায় করবে সে হজ্জের পর এমনি বে-গুনাহ অবস্থায় ফিরে আসবে যেন সে আজই মায়ের উদর থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যেমন হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে ঃ

مَنْ حَجَّ وَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

অতএব, হজ্জের এ সফরে অত্যন্ত সংযত, সতর্ক এবং সচেতন অবস্থায় থেকে আল্লাহর রহমতের আশা এবং আল্লাহর আযাবের ভয় নিয়ে সময় আতিবাহিত করতে হবে এবং হজ্জের যাবতীয় আরকান-আহকাম যথা নিয়মে পালন করতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রেমিক বা আল্লাহর পাগল হওয়া পূর্ব শর্ত। তাই কবি বলেছেনঃ

دررہ منزل لیلی خطرها ست بجان

شرط اول قدم انست که مجنون باشی

বস্তুতঃ যে আল্লাহর পাগল হয়েছে শুধু সে-ই এর মাহাত্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম। আর যার প্রেমের আগুন যত বেশী তীব্র তার প্রাণের টান, তার-বিরহ-জ্বালা তত বেশী তীব্রতর। তাই হজ্জের মওসুম এলেই মর্দে-মোমেনের অন্তর-সমুদ্রে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, সে তার সব কিছু ছেড়ে হাযির হতে চায় পবিত্র কা'বা প্রাঙ্গণে, পবিত্র রওজা মোবারকের সম্মুখে। এজন্যে আল্লাহর প্রেমিক ঘর থেকে বের হওয়ার সময় তথা এ মহান সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় আত্মীয়-স্বজন, প্রিয়জন থেকে ক্ষমা চেয়ে বিদায় নেয়, তার উপর মানুষের হক্ব থাকলে তা আদায় করে দেয় এবং এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে তাঁর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাঁর রাহে বেরিয়ে পড়ে।

এ সময় এ দোয়া করার নিয়ম আছে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوٰى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضٰى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاَطْوِلَنَا بُعْدَهٗ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْاَهْلِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْاَهْلِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُوْمِ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি এ সফরে তোমার নিকট কল্যাণ এবং পরহেযগারী লাভের আরজী পেশ করি, আর যে কাজে তুমি সন্তুষ্ট হও এমন কাজের তওফিক চাই। হে আল্লাহ! আমাদের জন্যে এ সফরকে সহজ করে দাও, আর এর পথকে অল্প সময়ে অতিক্রম করিয়ে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সফরের সাথী এবং আমাদের পেছনে আমাদের বাড়ী-ঘরের তুমিই হেফাজতকারী। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি এ সফরের কষ্ট থেকে এবং মন্দ জিনিস দেখা থেকে এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের পর নিজের সম্পদ ও আওলাদের কোন ক্ষতি দেখা থেকে এবং কোন জিনিস অর্জিত হওয়ার পর বিনষ্ট হওয়া থেকে এবং মজলুমের বদ-দোয়া থেকে"।

যদি এ দোয়ার শব্দগুলো মনে না-ও থাকে তবে এর মর্ম উপলব্ধি করে দরবারে এলাহীতে দরখাস্ত করা কর্তব্য। এমনিভাবে, আত্মীয়-স্বজনের উদ্দেশে এই দোয়া করা ঃ

اَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِىْ لَاتَضِيْعُ وَدَائِعُهٗ

অর্থাৎ "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের হাতে সোপর্দ করছি আর যা কিছু আল্লাহ পাকের নিকট সোপর্দ করা হয় তা কখনো বিনষ্ট হয় না"।

আর যানবাহনে আরোহণ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলে আরোহণ করা এবং এ দোয়া পাঠের নিয়ম রয়েছে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ

অর্থাৎ "সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে যিনি এ যানবাহনকে আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন অথচ আমরা তাতে সক্ষম ছিলাম না। আর একথা নিশ্চিত যে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ফিরে যাব"।

এ সফরের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যকে সামনে রেখে সকল বাজে কথা ও বাজে কাজ এবং যাবতীয় অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকা কর্তব্য এবং সর্বদা আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

এভাবে সফর করে মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হাযির হওয়ার পর যখন সর্ব প্রথম বায়তুল্লাহ শরীফ দেখার সুবর্ণ-সুযোগ আসবে তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' বলে এই দোয়া পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ اَللّٰهُمَّ زِدْ بَيْتَكَ هٰذَا تَعْظِيْمًا وَتَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مَنْ حَجَّهٗ اَوِاعْتَمَرَهٗ تَشْرِيْفًا وَتَكْرِيْمًا وَتَعْظِيْمًا وَبِرًّا

"হে আল্লাহ! তুমিই সালাম আর তোমার তরফ থেকেই শান্তি। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে শান্তির সঙ্গে জীবন-যাপনের তওফিক দিও। হে আল্লাহ! তোমার এ ঘরের মর্যাদা, সম্মান, বুজুর্গী এবং হায়াত আরও বৃদ্ধি করে দিও আর যে এ ঘরের হজ্জ বা ওমরাহ করবে তার মর্যাদা, সম্মান এবং সওয়াব বৃদ্ধি করে দিও"।

এরপর নিজের মালপত্র এবং বাসস্থান ঠিক করে অত্যন্ত আদব, বিনয় ও মহব্বতের সঙ্গে বায়তুল্লাহ শরীফ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম তওয়াফ করতে হবে, যিনি হজ্জে তামাত্তো করেছেন তার জন্যে এটি হবে ওমরার তওয়াফ আর যিনি হজ্জে 'এফরাদ' বা 'কেরান' করেছেন তার জন্যে হবে এটি তওয়াফুল কুদুম।

তওয়াফের নিয়ম

তওয়াফের আভিধাণিক অর্থ হলো কোন বস্তুর চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা, আর শরীয়তের পরিভাষায় কা'বা শরীফের চারিপার্শ্বে ৭ বার প্রদক্ষিণ করাকে তওয়াফ বলা

হয়। আর বায়তুল্লাহ শরীফ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের তওয়াফ করা জায়েয নয়। তওয়াফের জন্যে নিয়ত ফরজ। নিয়ত ব্যতীত তওয়াফ হয় না। তওয়াফের নিয়ত এভাবে করতে হয় ঃ "হে আল্লাহ! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বায়তুল্লাহ'র তওয়াফের ইচ্ছা করছি, আমার জন্যে তওয়াফ সহজ করে দাও এবং কবুল কর"।

এরপর এই বলে তওয়াফ শুরু করতে হবে ঃ

بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ لَآاِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

এভাবে ৭ বার আল্লাহর ঘরের তওয়াফ করতে হয়। প্রত্যেক বার প্রদক্ষিণ করার সময় দোয়া পাঠ করতে হয়, এরপর মকামে ইব্রাহীমে দু' রাকাআত নামায আদায় করে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করতে হয়। এরপর জমজমের পানি পান করে দোয়া করতে হয়।

হজ্জের উপকারিতা

হজ্জের উপকারিতা অপরিসীম। আখেরাতে হজ্জের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে তা বর্ণনাতীত। তবে দুনিয়াতে হজ্জের মাধ্যমে যে উপকার লাভ হয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

মুসলিম জাহানের ঐক্য

এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের প্রয়োজনে, মুসলিম জাতির হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের তাগিদে, ইসলাম ও মুসলিম জাতির শান-শওকত ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে মুসলিম জাহানের ঐক্য পূর্বশর্ত। মুসলিম জাহানের ঐক্য স্থাপনের জন্যে সমগ্র মুসলিম জাহানের একটি বিশ্ব সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তবে এ বিশ্ব সম্মেলন হতে হবে এমন এক স্থানে যেখানে শুধু এক আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাসী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী, এক কোরআনের অনুগামী মুসলিম চিন্তানায়কগণই থাকবেন। কি আশ্চর্য এ কাজও আল্লাহ্ পাক সহজ করে দিয়েছেন হজ্জের মাধ্যমে। হজ্জের মওসুমে সমগ্র মুসলিম জাহানের প্রতিনিধিবৃন্দ ঐতিহাসিক আরাফাতের ময়দানে সমবেত হয়ে থাকেন। উল্লেখ্য, এখানেই জান্নাত থেকে বিচ্ছেদের পর সৃষ্টির প্রথম মানুষ হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়ার (আঃ) পুনঃমিলন হয়েছিল, তাঁরা একে অন্যের পরিচয় পেয়েছিলেন এখানেই, এজন্যে এর নামকরণ করা হয়েছে আরাফাত।

দিগন্তব্যাপী মরুভূমির এ ময়দানে আরাফাতে যেন সারা বিশ্বের সমস্ত মুসলিম সমবেত হলেও আরাফাতের বক্ষে অভাব হবে না স্থানের। আল্লাহ পাক কর্তৃক অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় আহুত এ বিশ্ব-মুসলিম সম্মেলনের মাধ্যমে মুসলিম জাতির ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হতে পারে। মুসলিম জাহানের যাবতীয় বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত হতে পারে এ মহা সম্মেলনের মাধ্যমে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল যুগে, সারা পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ যখন মুসলমানদের করতলগত ছিল, হযরত ওমরের (রাঃ) ন্যায় মহা মনীষীগণ যখন মুসলিম জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তখন এই আরাফাতের ময়দানেই সমগ্র মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করা হতো।

কিন্তু ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! মুসলিম জাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটেছে, তারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মহান শিক্ষাকে বিস্মৃত করেছে, আত্ম-বিস্মৃত হয়েছে, সুদিনের স্থলে তাই দুর্দিন এসেছে। আজও আরাফাতের ময়দানে সারা দুনিয়ার মুসলমান একত্রিত হয় কিন্তু একে অন্যের সাথে মনের কপাট খুলে মেশে না, তদুপরি যারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান পেশ করতে পারে, তারা বড় বেশী এ ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত হয় না। ফলে মুসলিম জাহানের ঐক্য স্থাপিত হয় না। হজ্জের একটা বিরাট উদ্দেশ্য এভাবে ব্যাহত হয়।

ঈমানের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণতা

হজ্জের কারণে ঈমানের দৃঢ়তা ও পরিপূর্ণতা সাধিত হয়। আরবের বুকে ইসলামের সত্যতার অগণিত জীবন্ত নিদর্শন আজও বিদ্যমান। এই সমস্ত নিদর্শন স্বচক্ষে দেখলে অতি স্বাভাবিক ভাবেই দৃঢ়তা অর্জিত হয়, ঈমান পরিপূর্ণ হয়।

পরকালের স্মরণ

হজ্জের মাধ্যমে মানুষ তার পরকালীন জিন্দেগীর স্মরণ করতে সক্ষম হয়। গাফলতের আবর্তে নিপতিত আত্ম-বিস্মৃত, লক্ষ্যচ্যুত মানুষ পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা স্মরণ করে এ পর্যায়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। কেননা আরাফাতের ময়দান হাশরের ময়দানেরই অনুরূপ। এহরামের পোশাক কাফনের অনুরূপ। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনের সূরায়ে হজ্জকে কেয়ামতের বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করেছেন, এতেও একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, পরকালের স্মরণ এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণই হজ্জের পরম উদ্দেশ্য ও চরম লক্ষ্য।

ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

এছাড়া হজ্জের মাধ্যমে অর্জিত হয় ভ্রমণের অভিজ্ঞতা। ইসলামের অন্যতম শিক্ষা সাম্য মৈত্রীর পরিপূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় হজ্জের সময়। বিভিন্ন অবস্থা ও বিভিন্ন ভাষা-ভাষী লোক একই পোশাক-পরিচ্ছেদে একই উদ্দেশে এবং একই অবস্থায়

সমবেত হয়। এখানে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা বলতে কেউ থাকে না, সকলেই আল্লাহ্‌র আশেক, তাঁর ভক্ত প্রেমিক, এক আল্লাহ্‌র বন্দা, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত, সকলেই এখানে ভাই ভাই। সাম্য-মৈত্রী, একতা-মমতার এক অভাবনীয় দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় হজ্জের সময়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে বিশেষ কোন প্রয়োজন বা অত্যাচারী শাসক অথবা মারাত্মক রোগ হজ্জ করতে বাধা দেয়নি, অথচ এ কর্তব্য পালন না করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাকে মৃত্যুবরণ করতে দাও, সে ইহুদী হোক বা খৃষ্টান। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের এ নির্দেশটি পালন করতে অবহেলা করেছে, ইসলামের এ রোকনটি পালন করে ঈমানের প্রমাণ দেয়নি, তার মুসলমান হবার কোন প্রয়োজন নেই এবং শেষ বিচারের দিনে পরিত্রাণ লাভেরও কোন অধিকার নেই।

বস্তুত ঃ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান ও আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতে হয় কালেমার মাধ্যমে, তাঁর প্রতি প্রেম ও ভক্তির কারণে দৈনিক কমপক্ষে পাঁচবার তাঁর মহান দরবারে হাযির হতে হয়, করজোড়ে, নতজানু হতে হয়, সেজদায় রত হতে হয়। এমনিভাবে তাঁর প্রেমে মুগ্ধ মাতোয়ারা হয়ে রোজা ব্রত পালন করতে হয়। অর্থ-সম্পদের যাকাত আদায় করতে হয়। এরপর তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আশায়, তাঁর পবিত্র কা'বা গৃহে হাযির হবার ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায়ে মুবারক জেয়ারতের উদ্দেশে হজ্জের সফর করতে হয়।

এভাবে মোমেন বন্দা তার ঈমানের প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলঃ কোন্ আমল উত্তম? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনয়ন করা। প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ অতঃপর কোন্ আমল উত্তম? তার জবাবে এরশাদ করলেন ঃ আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। পুনরায় প্রশ্নকারী আরজ করলেন ঃ অতঃপর কোন্ আমল? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ মবরুর হজ্জ।

হাদীস শরীফে আছে ঃ এক ওমরা থেকে পরবর্তী ওমরা পর্যন্ত এই মধ্যবর্তী সময়ের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। মবরুর হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়। হাদীসের ভাষায় ঃ

اَلْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةَ

আর একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ হজ্জ যাত্রীর প্রতিটি পদক্ষেপের কারণে গুনাহ দূরীভূত হয়, মর্যাদার একটি ধাপ উন্নীত হয় এবং প্রতি পদক্ষেপেই একটি করে নেকী লিপিবদ্ধ করা হয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাজীদের জন্যে দোয়া করেছেন ঃ

'হে আল্লাহ! হজ্জ আদায়কারীর গুনাহ মাফ করে দাও এবং হাজী যার জন্যে মাগফেরাত কামনা করে তাকেও মাফ করে দাও'।

এহ্‌রাম বাধার নিয়ম

মিকাতের কিছু পূর্ব থেকেই মোচ, চুল, নখ, নাক, বগল, নাভীর নীচ ইত্যাদির হাজামত বানিয়ে গোছল করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সুগন্ধি ব্যবহার করে সেলাই বিহীন পবিত্র-পরিচ্ছন্ন সাদা কাপড় পরা এবং একখানা চাদরও গায়ে দেয়া, অন্যান্য আর কোন প্রকার কাপড়ই শরীরে রাখা যাবে না। এখান থেকে একই সঙ্গে আরম্ভ হয় সৈনিক জীবন এবং আল্লাহ পাকের আশেকানা জীবন। পরে দু' রাকাআত নামায পড়তে হবে। প্রথম রাকাআতে সূরা কাফেরুন এবং দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা এখলাস পড়তে হবে। এ নামায আদায়ের সময় টুপি মাথায় রাখা যায় কিন্তু পরে সঙ্গে সঙ্গে টুপি খুলে রাখতে হবে। নামায শেষ করে সে স্থানে বসেই এহরামের নিয়ত করতে হবে। যদি হজ্জে কেরাণ করতে হয় তাহলে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ

যদি হজ্জে এফরাদ অর্থাৎ শুধু হজ্জ করতে হয় তবে পড়বে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِىْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّىْ

আর যদি হজ্জে তামাত্তো বা ওমরা করতে হয় তাহলে পড়তে হবে ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِى وَتَقَبَّلْهَا مِنِّىْ

আর যদি হজ্জে বদল হয় তাহলে من বলে সে ব্যক্তির নাম বলতে হবে ঃ

এ দোয়া পড়া মাত্রই এহ্‌রাম হয়ে যাবে। এহরাম বাঁধার পর সব সময় উচ্চ কণ্ঠে তলবিয়া পড়তে হবে। বিশেষ করে কোন কাফেলার সাথে দেখা হলে বা উঁচু নীচু স্থান দিয়ে যেতে হলে তলবিয়া পড়তে হবে।

এখতেবা ও রমল কাকে বলে?

"এখতেরা" অর্থাৎ যে তওয়াফের পর সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয় সেই তওয়াফের পূর্বে গায়ের চাদরটি এভাবে পরতে হবে যে, ডান কাঁধ খোলা রেখে চাদরটি ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় মুখ ফেলে রাখতে হবে। একেই 'এখতেবা' বলা হয়।

'রমল' অর্থাৎ তওয়াফ করার সময় কাঁধকে হেলিয়ে সজোরে বীর পুরুষের ন্যায় তাড়াতাড়ি পা ফেলে শারীরিক শক্তি প্রকাশ করে চলার নাম 'রমল'।

কি কারণে হজ্জ বাতিল হয়

হজ্জের তিনটি ফরজ ঃ

(১) এহরাম

(২) অকুফে আরফা,

(৩) তওয়াফে জেয়ারত,

এ তিনটি ফরজের একটি না করলেই হজ্জ বাতিল হয়ে যায়।

কি কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়?

ওজর ব্যতীত হজ্জের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দিলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় ঃ

(১) সাফা মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী রাস্তায় দৌড়ান,

(২) মিনায় তিনটি পাথরের কংকর নিক্ষেপ,

(৩) ময়দানে আরফা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে মোজদালেফায় অবস্থান,

(৪) তওয়াফে বেদা বা বিদায়ের সময় তওয়াফ করা,

(৫) কংকর নিক্ষেপ করে এসে জবেহ্ করার পর মাথা মুণ্ডন বা চুল ছেঁটে ফেলা। হজ্জে তামাত্তো বা কেরাণের এহ্রামকারীদের কোরবানী করা। এছাড়া এহরামের অবস্থায় কোন নিষিদ্ধ কাজ করলেও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

এবারে আসুন আমরা হজ্জের পাঁচটি দিনের করণীয় কাজ সম্পর্কে আলোচনা করি।

হজ্জের পাঁচদিন

প্রত্যেককে বিশেষভাবে হজ্জের পাঁচটি দিন সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে। নিজের কর্তব্য সমূহের ব্যাপারে জ্ঞাত হতে হবে এবং অত্যন্ত যত্ন সহকারে অতি সতর্কতার সঙ্গে হজ্জের আরকান-আহকাম সু-সম্পন্ন করতে হবে।

৮ জিলহজ্জ হজ্জের প্রথম দিন

এদিন সূর্যোদয়ের পর মিনা গমন করতে হবে। যিনি হজ্জে এফরাদের নিয়ত করেছেন তার তো হজ্জের এহরাম রয়েছে। আর যিনি হজ্জে কেরাণ করছেন হজ্জ এবং ওমরাহ দুটিরই এক সঙ্গে তিনি এহরাম বেঁধে রেখেছেন, আর যারা হজ্জে তামাত্তো করছেন তারা আজকে হজ্জের এহরাম বাঁধবেন। সুন্নত মোতাবেক এহরামের চাদর পরিধান করবেন এবং মসজিদে হারামে আসবেন। মোস্তাহাব হলো কা'বা শরীফের তওয়াফ করা এবং দু' রাকাআত তওয়াফ সমাপ্তির নামায আদায় করা। এরপর এহরামের জন্যে দু' রাকাআত নামায আদায় করবেন। এরপর হজ্জের নিয়ত এভাবে করতে হবে, 'হে আল্লাহ্! আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হজ্জ করার

ইচ্ছা করছি, আমার জন্যে তা সহজ করে দাও আর কবুল করো'। এ নিয়তের পর তলবিয়া পড়তে হবে, 'লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নে'মাতা লাকা ওয়ালা মূলক, লা-শারীকা লাকা'। তলবিয়া পাঠের সঙ্গে সঙ্গে এহরাম শুরু হয়ে গেল। এরপর মিনার দিকে রওনা হয়ে যেতে হবে। মিনা মক্কা শরীফ থেকে তিন মাইল দূরে দুটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি বিরাট ময়দান। মিনায় ৮ তারিখে যোহরের নামায থেকে ৯ তারিখ সকাল পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা এবং ঐ রাত্রে মিনাতে অবস্থান করা সুন্নত। যদি কেউ রাত্রে মক্কা শরীফে অবস্থান করে অথবা সময়ের পূর্বে আরাফাতের ময়দানে পৌঁছে যায় তবে মকরূহ হবে।

দ্বিতীয় দিন

৯ই জিলহজ্জ আজ আরফার ঐতিহাসিক ময়দানে হজ্জের সবচেয়ে বড় রোকন আদায় করতে হয়। প্রকৃতপক্ষে আজকের দিনকে হজ্জের দিন বলা হয়। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সূর্যের আলোকরশ্মি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে তখন মিনা থেকে আরফার দিকে রওনা দিতে হয়। আরাফাত মক্কা শরীফ থেকে নয় মাইল দূরে অবস্থিত। এই সেই ঐতিহাসিক ময়দান যেখানে হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়ার (আঃ) বেহেশ্‌ত থেকে বিদায়ের পর প্রথম দেখা এবং পরিচয় হয়। এ কারণেই এ ময়দানের নাম হয় আরাফাত। এ ময়দানের চারপার্শ নির্দিষ্ট রয়েছে। এ ময়দানে অবস্থান করা বিশেষতঃ যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা হজ্জের সবচেয়ে বড় রোকন। মোস্তাহাব হলো দ্বিপ্রহরের পূর্বে গোসল করে নেয়া যদি তার সুযোগ না থাকে তবে অজু যথেষ্ট। এভাবে তৈরী হয়ে মসজিদের নামিরাতে গমন করা। সেখানে ইমাম খোৎবা দেবেন। এরপর ইমামের পেছনে যোহর এবং আসর এক সাথে আদায় করা।

উত্তম হলো ময়দানে আরাফাতে যে 'জবল রহমত' রয়েছে তার নিকটবর্তী কোন স্থানে অবস্থান করা। কিন্তু ভীড়ের কারণে যদি সেখানে যাওয়া না যায় তবে নিজের তাঁবুতে অবস্থান করাই উত্তম। এমনিভাবে মসজিদে নামিরায় যাওয়ার কারণে যদি তাঁবু হারিয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে তবে স্ব-স্ব তাঁবুতে অবস্থান করাই উত্তম। এ অবস্থায় যোহর, আছর তাঁবুতেই জামাআতের সাথে আদায় করতে হবে। আরফায় অবস্থানের সময় অধিক পরিমাণে তলবিয়া পাঠ করা, আল্লাহর জিকরে মশগুল থাকা, কোরআনে করীমের তেলাওয়াত, দরূদ শরীফ পাঠ এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে এস্তেগফার করা ও নিজের জন্যে এবং আত্মীয়-স্বজন প্রিয়জনের জন্যে দোয়া করা কর্তব্য। কেননা এ সময়ে এবং এই স্থানটিতে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সুবর্ণ সুযোগ আসে। অতএব, এ সুযোগর সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। পরস্পরের নিষ্প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বর্জন করে দরবারে এলাহীতে কান্নাকাটি করা অত্যন্ত জরুরী। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরফার দিনে পড়ার জন্যে যে দোয়াটিকে উত্তম বলে ঘোষণা করেছেন তা হলো-

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ- لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

এ দোয়া অধিক পরিমাণে পড়া উচিত।

আরাফাত থেকে মোজদালেফা গমন

মোজদালেফা মিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। আরফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে হবে মোজদালেফার উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে আদায় করতে হবে। রাস্তায় আল্লাহর জিকর এবং তলবিয়া পাঠ চলতে থাকবে। ঐ দিনের মাগরিবের নামায আরফার ময়দানে এবং রাস্তায় হাজীদের জন্যে জায়েয নেই। যত বিলম্বেই হোক মোজদালেফায় পৌঁছে মাগরিবের ফরজ এবং সঙ্গে সঙ্গে এশার ফরজ আদায় করে মাগরিব এবং এশার সুন্নত ও বেতের পড়তে হবে। এ পর্যায়ে হাজী সাহেবদেরকে কয়েকটি মাছআলা জেনে নিতে হবে–

(১) মোজদালেফায় মাগরিব ও এশার নামাযের জন্যে এক আজান এবং এক একামত যথেষ্ট।

(২) মোজদালেফায় মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করা ওয়াজিব, এর জন্যে জামাআতও শর্ত নয়।

(৩) যদি কোন হাজী সাহেব মাগরিবের নামায আরফার ময়দানে বা রাস্তায় পড়ে নিয়েছেন তবে তাকে মোজদালেফায় পৌঁছে পুনরায় মাগরিবের নামায আদায় করতে হবে।

(৪) যদি এশার নামাযের সময় হওয়ার পূর্বে মোজদালেফায় পৌঁছা সম্ভব হয় তবে তখনই মাগরিবের নামায না পড়ে অপেক্ষা করতে হবে। এশার নামাযের সময় হলে উভয় নামায একসাথে পড়তে হবে।

(৫) মোজদালেফায় রাত্রি জাগরণ করে এবাদতে মশগুল থাকা মোস্তাহাব। কোন কোন আলেমের মতে এ রাত শবে কদরের চেয়ে উত্তম।

তৃতীয় দিন

আজ জিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখ। ঈদুল-আযহার দিন। এ দিন হজ্জের বহু দায়িত্বপূর্ণ কাজ আদায় করতে হয়। এ কারণে হাজীদের জন্যে ঈদের নামায মাফ করা হয়েছে। এদিন প্রথম ওয়াজিব হলো মোজদালেফায় অবস্থান। আর এ অবস্থানের সময় হলো সুবহে সাদেক থেকে নিয়ে সূর্যোদয় পর্যন্ত। যদি কোন হাজী সাহেব সুবহে সাদেকের পর কিছুক্ষণ অবস্থান করে তথা মোজদালেফায় ফজরের নামায আদায় করে

মিনায় রওয়ানা হয়ে যান তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু সুন্নত হচ্ছে সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করা। মোজদালেফায় অবস্থানের সময় যে বিষয়টির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো মোজদালেফা থেকে মিনার পথে যে ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছার রয়েছে সেখান থেকে দূরে থাকতে হবে কেননা, ঐ স্থানটিতে আসহাবে ফীলের উপর আল্লাহ্‌র আযাব নাযিল হয়েছিল। তাই মোজদালেফার নামে কেউ যেন ওয়াদিয়ে মোহাচ্ছারে অবস্থান না করে। যাহোক মোজদালেফা থেকে ফজরের নামাযের পর মিনার দিকে রওনা হতে হবে এবং মোজদালেফা থেকে কংকর নিয়ে নিতে হবে। মিনায় পৌঁছে সর্ব প্রথম 'জ মরায়ে ওকবায়' ৭টি কংকর মারতে হবে। এ কংকর মারার সময় সূর্যোদয় থেকে নিয়ে সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েয রয়েছে। অবশ্য সূর্যাস্তের পর মহরুহ। কিন্তু দুর্বল, বৃদ্ধ ও মহিলাদের জন্যে সূর্যাস্তের পরও জায়েয আছে। বর্তমানে জমরায় কংকর নিক্ষেপের সময় প্রচন্ড ভীড় হয়, এ কারণে বিকেলের দিকে নিক্ষেপই ভাল। 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে ডান হাতে কংকর নিক্ষেপ করতে হয়। প্রত্যেক বারই 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। আর এ দোয়াও পাঠ করা উচিত ঃ

رَغْمًا لِّلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِّلرَّحْمٰنِ

এখানেও কয়েকটি কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে–

(১) ৭টি কংকর এক সঙ্গে নিক্ষেপ করে দিলে তা একই কংকর বলে গণ্য হবে। অতঃপর ৭ এর সংখ্যা পূর্ণ করতে হবে।

(২) জমরায়ে ওকবায় কংকর নিক্ষেপের সময় থেকে তলবিয়া পাঠ বন্ধ করতে হবে।

(৩) এ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর নিজের স্থানে চলে যেতে হবে। অন্য জ মরায় আজ কংকর মারবেন না।

(৪) যদি ১০ তারিখের রাত হয়ে গেল অথচ কংকর মারা হয়নি, এমন অবস্থায় কাযা করা ওয়াজিব হবে এবং বিলম্বের কারণে দম নিতে হবে।

(৫) কোন হাজী পুরুষ হোক কি মহিলা অসুস্থ হয়ে পড়লে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তার মাধ্যমে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। যদি অসুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রতিনিধি মনোনয়ন ব্যতীতই কংকর নিক্ষেপ করা হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৬) যে কোন রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রস্তর নিক্ষেপ করবে, তার কর্তব্য হবে নিজের পক্ষ থেকে আগে কংকর নিক্ষেপ করা, পরে অন্যের পক্ষ থেকে।

১০ তারিখের তৃতীয় ওয়াজিব

যিনি হজ্জে 'কেরাণ' করছেন অথবা হজ্জে 'তামাত্তো' তার উপর ওয়াজিব হলো মাথার চুল ফেলার আগে কোরবানী করা। যদি কেউ ভুল-ক্রমে কোরবানীর আগেই চুল ফেলে দেয় তবে দম ওয়াজিব হবে। কিন্তু যিনি হজ্জে এফরাদ করছেন, অর্থাৎ

যিনি শুধু হজ্জের এহরাম বেঁধেছেন তার জন্যে কোরবানী ওয়াজিব নয় মোস্তাহাব। অতএব, তিনি কোরবানী না করেও হলক বা কসর করতে পারেন। যদি হজ্জে কেরাণ বা তামাত্তোকারীর কাছে এই পরিমান অর্থ-সম্পদ না থাকে যা দ্বারা কোরবানী দিতে পারেন তবে কোরবানীর বদলে ১০টি রোজা রাখতে হবে। কিন্তু শর্ত হলো এ ১০টি রোজার মধ্যে ৩টি অবশ্যই হজ্জের দিনের মধ্যে রাখতে হবে। বাকি ৭টি যে কোন সময় রাখা যাবে। কিন্তু যদি হজ্জের দিন পর্যন্ত ৩টি রোজা রাখা সম্ভব না হয় তবে কোরবানী অবশ্য করণীয়। পক্ষান্তরে যদি সে ব্যক্তি অর্থাভাবে কোরবানী না করল আর মাথার চুল কেটে হালাল হয়ে গেল এমন অবস্থায় তাকে দুটি দম নিতে হবে।

১০ তারিখের চতুর্থ ওয়াজিব

কোরবানীর পর মাথার চুল কামিয়ে ফেলা অথবা ছোট করা ওয়াজিব। এ ওয়াজিব আদায়ের পরই হাজীগণ হালাল হতে পারেন অর্থাৎ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেন। এখানেও কয়েকটি মাসআলা জেনে রাখা জরুরী।

(১) মহিলাদের জন্যে শুধু সামান্য চুল কেটে ফেলার নিয়ম রয়েছে।

(২) মাথার চুল কেটে ফেলার আগে নখ কাটা জায়েয নয়।

(৩) হজ্জের এহরামে মিনাতে মাথার চুল কামান সুন্নত। যদি কেউ হরমের সীমানা থেকে বাইরে গিয়ে চুল কাটে তবে দম দিতে হবে।

(৪) এখানে আরও উল্লেখ্য, জমরায়ে ওকবায় কংকর নিক্ষেপের পর ভীড়ের কারণে বা অন্য কোন অসুবিধায় যদি কোরবানী করা সম্ভব না হয় তবে তার পরের দুদিন অর্থাৎ ১২ তারিখ পর্যন্ত কোরবানী করা যাবে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হজ্জে কেরাণ এবং তামাত্তোকারী কোরবানী না করে হালাল হতে পারবেন না।

দশ তারিখের সবচেয়ে বড় কাজ তওয়াফে জেয়ারত

এহরামের পর হজ্জের দু'টি রুকন অবশিষ্ট থাকে। একটি আরাফাতে অবস্থান বা ওকুফে আরফা আর দ্বিতীয়টি তওয়াফে জেয়ারত যা ১০ তারিখে করণীয়। সুন্নত হলো কোরবানী এবং হলক থেকে অবসর হয়ে ফরজ তওয়াফের জন্যে রওনা হওয়া কেননা, তওয়াফে জেয়ারতের উত্তম সময় হলো ১০ তারিখ। অবশ্য ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত তওয়াফে জেয়ারতের অনুমতি রয়েছে। যদি ১২ তারিখ অতিবাহিত হলো আর তওয়াফ আদায় করা গেল না তবুও দম দিতে হবে এবং তওয়াফে জেয়ারত বাকী থাকবে। এ তওয়াফ কখনোও বাতিল হবে না; বরং এ ফরজ আদায় অবশ্যই করতে হবে। এর কোন বিকল্প নেই।

সাফা-মারওয়ার মধ্যে হজ্জের সায়ী

তওয়াফে জেয়ারতের পরে সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে হবে। কিন্তু যে তওয়াফে কুদুমের সঙ্গে হজ্জের সায়ী করেছে তার জন্যে এখন সায়ী জরুরী নয়।

তওয়াফে জেয়ারত এবং সায়ীর পর হাজীকে মক্কা শরীফ থেকে মিনায় চলে যেতে হবে।

১১ই জিলহজ্জ হজ্জের চতুর্থ দিন

এখন হজ্জের সংক্ষিপ্ত কিছু কাজ রয়ে গেছে। দু' বা তিনদিন মিনাতে অবস্থান করে তিনটি জমরাতে কংকর নিক্ষেপ। এ সময় রাতগুলো মিনাতে অতিবাহিত করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। মিনার বাইরে অন্য কোথাও রাতে অবস্থান করা নিষিদ্ধ। কোরবানী অথবা তওয়াফে জেয়ারত যদি ১০ তারিখ করা সম্ভব না হয় তবে আজকের দিনে এ কাজগুলো সেরে নিতে হবে এবং যোহর থেকে মাগরিবের মধ্যে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। মিনায় অবস্থানের কালে আল্লাহ্‌র জিকর, এস্তেগফার এবং দরূদ শরীফে মশগুল থাকা কর্তব্য। নিজের জন্যে এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্যে দোয়া করাও জ রুরী। কেননা এ স্থান এবং এ সময়ে দোয়া কবুল হওয়ার খোশখবরী রয়েছে।

হজ্জের পঞ্চম দিন ১২ জিলহজ্জ

যদি কোরবানী বা তওয়াফে জেয়ারত ১১ তারিখেও করা সম্ভব না হয় তবে ১২ তারিখে করা অবশ্য কর্তব্য এবং সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যাওয়ার পর থেকে তিন জ মরায় কংকর নিক্ষেপ হবে আজকের মূল কাজ। ১২ তারিখের পর মিনায় অবস্থান করা ইচ্ছাধীন। ১২ তারিখে কংকর নিক্ষেপের পর মক্কা মোয়াজ্জমায় প্রত্যাবর্তন করা যেতে পারে কিন্তু শর্ত হলো ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনা ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু সূর্যাস্তের পর মিনা থেকে বের হওয়া মকরূহ। এমন অবস্থায় মিনায় রাত্রি যাপন করে ১৩ তারিখ জমরায় কংকর নিক্ষেপ শেষে মক্কায় যেতে হবে।

মীনা থেকে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন

মিনা থেকে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তনের পর হজ্জের একটি মাত্র ওয়াজিব অবশিষ্ট থাকে আর তা হলো বিদায়ী তওয়াফ বা 'তওয়াফুল বেদা'। প্রত্যেক হাজীর উপর মক্কা শরীফ থেকে বিদায় হওয়ার এ তওয়াফ ওয়াজিব। আর যত দিন মক্কা শরীফে অবস্থান করার সুযোগ হয় তখনকার প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগানো কর্তব্য। বায়তুল্লাহ শরীফের তওয়াফ করা, বায়তুল্লাহ শরীফের দিকে তা'যীমের সঙ্গে দেখা, হেরেম শরীফে সকল নামায জামাআতের সঙ্গে আদায় করা, আল্লাহ্‌র জিকরে মশগুল থাকা, কোরআনে করীম তেলাওয়াত করা এবং সদকা-খয়রাত করা একান্ত জরুরী কাজ। এ সময়টাকে আল্লাহ্‌র নেয়ামত এবং গণীমত মনে করে তার সদ্ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য।

প্রাণের মদীনায়

হজ্জের যাবতীয় কাজ শেষ হওয়ার পর রসূল প্রেমিকের মন ছোটে প্রাণের মদীনা মোনাওয়্যারার দিকে। কেননা, সেখানে রয়েছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ, বিশ্ব-সভার

সভাপতি ও নবী-রসূলগণের দলপতি, আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজায়ে পাক।

হাদীসে শরীফে আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ করলো এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজা জেয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করলো না সে তাঁর প্রতি জুলুম করলো।

আর একখানি হাদীসে রয়েছে, যে ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তিরোধাণের পর তাঁর রওজায়ে পাক জেয়ারত করলো সে যেন জীবিত অবস্থায় তাঁর জেয়ারত করলো।

একখানি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার মসজিদে ৪০ ওয়াক্ত নামায আদায় করলো আর কোন ওয়াক্ত নামায কাযা করলো না সে মুনাফেকী এবং দোযখের আযাব থেকে রক্ষা পেল।

আর একখানি হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মসজিদে নববীতে এক রাকাআত নামাযের সওয়াব অন্য মসজিদের ৫০ হাজার নামাযের সমান।

মদীনা তৈয়্যেবায় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে হাযির হতে হবে। মদীনা শরীফের দিকে সফরের সময় ও সেখানে অবস্থান-কালে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করতে হবে।

মদীনা মোনাওয়্যারায় অবস্থান কালে অত্যন্ত আদব রক্ষা করে চলতে হবে। আর একথা মনে রাখতে হবে, এই সেই পবিত্র ভূমি যেখানে আমাদের প্রিয়নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীবনের দশটি বছর অতিবাহিত করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে তাঁর কদম মোবারক পড়েছে এবং তিনি এখন এ যমীনেই শায়িত আছেন। অতএব অত্যন্ত আদব, মহব্বত এবং অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে তাঁর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে হবে।

মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় প্রথমে ডান পা রাখতে হবে এবং এ দোয়া পড়ার নিয়ম রয়েছে ঃ "আল্লাহুম্মাফ তাহলী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিক"। এরপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে হয়। বাবে জিবরাঈল দিয়ে প্রবেশ করা উত্তম। সর্ব প্রথম রওজাতুল জান্নাতে হাযিরা দিতে হয়। কারণ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রওজা পাক এবং মিম্বর শরীফের মধ্যবর্তী স্থান সম্পর্কে হাদীস শরীফে এ ঘোষণা করা হয়েছে যে, এটি হলো জান্নাতের একটি টুকরা। এখানে এসে দু' রাকাআত তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করতে হবে। অতঃপর রওজায়ে পাকের সম্মুখে হাযির হয়ে অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সঙ্গে দরবারে নববীতে সালাম পেশ করতে হয়। এভাবে সালাম পেশ করতে হবে ঃ খুব উচ্চস্বরে নয় এবং খুব নিম্নস্বরেও নয়, বরং মাঝারি ধরনের। অত্যন্ত আদব, মহব্বত, তা'যীমের সাথে এ ভাষায় সালাম পেশ

করতে হবে ঃ আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রসূলাল্লাহ আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ, আস্‌সালাতু আস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খালকিল্লাহ।

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ يَارَسُوْلَ اللهِ اِنِّىْ اَشْهَدُ اَنْ لَااِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّكَ عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ اَشْهَدُ اَنَّكَ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاَدَّيْتَ الْاَمَانَةَ وَنَصَحْتَ الْاُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُمَّةَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا جَزَاءً اللهِ عَنَّا اَفْضَلَ مَاجَازَى نَبِيًّا عَنْ اُمَّتِهٖ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ سَيِّدَنَا عَبْدَكَ وَرَسُوْلَكَ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهٗ اِنَّكَ لَاتُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَاَنْزِلْهُ اَلْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ اِنَّكَ سُبْحَانَكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ

এরপর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লামের উছিলায় আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করবেন এবং তাঁর শাফাআতের জন্যে এভাবে দরখাস্ত করতে হবে ঃ

يَارَسُوْلَ اللهِ اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَاَتَوَسَّلُ بِكَ اِلَى اللهِ فِىْ اَنْ اَمُوْتَ مُسْلِمًا عَلٰى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ

এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর উপর সালাম পেশ করতে হবে এবং হযরত ওমর (রাঃ)-কে সালাম দিতে হবে।

মদীনা শরীফে অবস্থানকালে যে বিষয়টির উপর বিশেষ নজর রাখতে হবে, তা হলো ৮ দিনে ৪০ ওয়াক্ত নামায যেন মসজিদে নববীতে বেলা নাগাহ ত্রুটি ছাড়া আদায় করা যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ যত বেশী সম্ভব প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাম আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে সালাম পেশ করা। রওজাতুম মিন্ রিয়াজিল জান্নায় নামায পড়া। ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত এবাদত সমূহের পর অধিক পরিমাণে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি দরূদ শরীফ পেশ

করতে থাকা। জান্নাতুল বাকীর জেয়ারত করা। এছাড়া মস্‌জিদে কোবায় নামায আদায়, শহীদানে ওহুদের জেয়ারত, বি'রে ওসমান, খন্দকের রণাঙ্গণ সহ অন্যান্য ঐতিহাসিক বরকতময় স্থান সমূহের জেয়ারত।

তৃতীয়তঃ মদীনা শরীফের অধিবাসীদের সাথে যেন কোন প্রকার বেআদবী না হয়। মদীনা শরীফের কোন জিনিসকে যেন মন্দ বলা না হয়। এদিকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কেননা, এর পরিণাম হয় অত্যন্ত শোচনীয়।

দেশে ফিরে

পবিত্র হজ্জ ও জেয়ারত সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইনশাআল্লাহ দেশে ফিরে আসলে যেন প্রত্যেকের জীবনেই হজ্জের শুভ পরিণতি পরিলক্ষিত হয়, হজ্জের মহান আদর্শ এবং শিক্ষার বাস্তবায়ন হয়, সেদিকে বিশেষভাবে নজর রাখতে হবে (আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন)।

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ ۗ وَ
تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ۚ وَإِن كُنتُم
مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ
وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

তরজমা

(১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস সকলেরই সুবিদিত, যে ব্যক্তি এ মাসগুলোতে হজ্জ করার দৃঢ় ইচ্ছা করে তার জন্যে হজ্জের সময় স্ত্রী সহবাস, পাপ কার্য, কলহ-দ্বন্দ্ব বৈধ নয়। তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর আল্লাহ পাক সে-সম্পর্কে অবগত এবং তোমরা পথের পাথেয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় পরহেযগারী-ই উত্তম পাথেয় এবং হে বুদ্ধিমান লোক সকল! আমাকে ভয় করতে থাক।

(১৯৮) তোমরা তোমাদের পালনকর্তার নিকট তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ করলে এতে কোন পাপ নেই। অবশেষে যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে

তখন তোমরা মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর এবং আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর যেমন তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যদিও তোমরা ইতোপূর্বে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।

(১৯৯) অতঃপর যে-স্থান থেকে অন্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে-স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

তফসীরুল কোরআন

হজ্জের কয়েকটি মাস সুবিদিত। তাই পবিত্র কোরআনে এ মাসগুলোর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়নি, হজ্জের মাস হলো শাওয়াল, জিলক্বদ এবং জিলহজ্জের প্রথম দশ দিন। যদিও হজ্জের আরকান জিলহজ্জ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই শুরু হয় তবু হজ্জের জন্যে এহরাম শাওয়াল থেকেই বাঁধার অনুমতি রয়েছে। সেলাই বিহীন দুটি সাদা চাদর নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশের পূর্বে হজ্জ যাত্রীর পরিধান করতে হয়। এরই নাম এহরাম। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে এহরাম যে কোন সময় বাঁধা যায় যদিও এহরাম শাওয়াল মাসের পূর্বে মকরূহ তবে বৈধ আর বৈধতার দলিল হলো, এহরাম ইমাম সাহেবের মতে হজ্জের রোকন নয়; বরং শর্ত যেমন নামাযের জন্যে অজু রোকন নয়; বরং শুধু শর্ত।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্জের জন্যে এহরাম বাধা নাজায়েয বা অবৈধ, কেননা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে এহ্রাম হজ্জের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বা রোকন। আর হজ্জের মওসুম আসার পূর্বে হজ্জের কোন রোকন আদায় করা বৈধ নয়।

হজ্জ ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম। যেভাবে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়, বছরে একবার এক মাস রোজা রাখতে হয় এবং শতকরা ২.৫০ টাকা হারে সম্পদের যাকাত আদায় করতে হয়, এমনিভাবে জীবনে একবার হজ্জও করতে হয়, পবিত্র মক্কা নগরীতে অবস্থিত কা'বা শরীফ প্রাঙ্গনে হাযির হয়ে কা'বা শরীফের তওয়াফ করতে হয়।

হজ্জের মাধ্যমে জীবনের এক বিরাট সাফল্য অর্জিত হয় এবং জীবনের যাবতীয় গুনাহ মাফের ব্যবস্থা করা হয়। মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে হজ্জের যে গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে তা শুধু মুসলমানগণই নয়; বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক হজ্জকে বিশ্ব মুসলিমের বার্ষিক মহা সম্মেলন বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১]

---

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৮

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ

অর্থাৎ যে নিজের জন্যে হজ্জকে অবশ্য কর্তব্য করে নিয়েছে তথা এহ্রাম বেঁধেছে তার জন্যে কয়েকটি কাজ বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। যথা স্বামী-স্ত্রীর মিলন এবং এ সম্পর্কীয় যাবতীয় কাজ এবং মহিলাদের সামনে এমনি কার্যাবলীর আলোচনা। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ "রফস" এর সর্ব নিম্ন পর্যায় হলো স্বামী-স্ত্রীর গোপন সম্পর্কের আলোচনা, এমন কাজের প্রতি ইশারা-ইঙ্গিত করা, এমনকি স্ত্রীর সঙ্গে একথা বলা যে, এহ্রাম খোলার পর আমরা এ কাজ করবো– এহ্রামের অবস্থায় এসবই নিষিদ্ধ। ولا فسوق এমনিভাবে আরও নিষিদ্ধ করা হয়েছে যাবতীয় পাপকার্য অর্থাৎ পাপাচার তো সর্বদাই নিষিদ্ধ; কিন্তু হজ্জের সময় এহ্রাম অবস্থায় এমন কাজ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকার তাগিদ বিশেষভাবে করা হয়েছে এ আয়াতে। কেননা পবিত্র ভূমিতে এবং পবিত্র মূহূর্তে সৎ কাজের যেমন সওয়াব অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় তেমনি মন্দ কাজের শাস্তিও অধিক এবং কঠোরতর হয়। فسق হলো আল্লাহ্র অবাধ্য হওয়া। এহ্রামের অবস্থায় শিকার করা এবং মানুষকে গাল-মন্দ দেয়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাদীস শরীফে আছে,

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

অর্থাৎ মুসলমানকে গালি দেয়া 'ফিসক' আর 'ক্বতল' করা কুফর। আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্যের সম্মানে পশু জবেহ্ করাও ফিসক। যেমন কোরআন পাকে আছে ঃ

أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ (সূরা আনআম)

অর্থাৎ–"অথবা এমন ফিসক করা যে সেক্ষেত্রে (পশুর) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নাম উচ্চারিত হয়"।

বিদ্রুপাত্মক উপাধি দ্বারা কাউকে ডাকাও 'ফিসক'। কোরআন মজীদে (সূরা হুজুরাত) আছে ঃ

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

অর্থাৎ "তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না"।

সংক্ষেপে বলা চলে, আল্লাহ্ পাকের সব নাফরমানীই 'ফিসক' হিসাবে গণ্য হয়ে থাকে। এ 'ফিসক' যদিও হারাম কিন্তু পবিত্র মাসে এর হারামের পরিণাম আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেনঃ

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ

অর্থাৎ "এ পবিত্র মাসগুলোতে নিজেদের নফ্সের উপর জুলুম করোনা"।

এভাবেই এহ্‌রামের সময় এসব হারামের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَمَنْ يُّرِدْ فِيْهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ

অর্থাৎ "হরমে যে কুফর এবং ধর্মদ্রোহিতার ইচ্ছা করবে তাকে আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেব"।

ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'ফিসক' অর্থ সে সব কাজ যা এহ্‌রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ যেমন শিকার করা, চুল, নখ কাটা প্রভৃতি।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ যে ব্যক্তি হজ্জ সুসম্পন্ন করে এবং তাতে 'রফস' না করে সে গুনাহ্ থেকে এমনভাবে পবিত্র হয় যেন আজই তার জন্ম হয়েছে।

وَلَا جِدَالَ

হজ্জের সময় আরও যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো পরস্পরের কলহ-দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ হজ্জের সময় হজ্জের 'আরকান' সম্পর্কে ঝগড়া করোনা যেমন একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ

অর্থাৎ প্রকৃত মুসলমান সে যার জিহবা এবং হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে। অতএব হজ্জের এহরাম যিনি বেঁধেছেন তার এ সমস্ত নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য।[১]

বর্বরতার যুগে লোকেরা আরফার ময়দানে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করতো, মনে করতো যে আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্থানেই অবস্থান করছি। আর এ বিষয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো। এজন্যে এহ্‌রাম অবস্থায় পরস্পরের দ্বন্দ্বকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।[২]

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ

অর্থাৎ আর তোমরা যা কিছু সৎ কাজ করবে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে অবগত। তিনি তোমাদের সৎ কাজের সওয়াব বা শুভ পরিণতি অবশ্যই দান করবেন। যেহেতু পূর্বের আয়াতে হজ্জের সফরে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, তাই এ আয়াতে নেক কাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়েছে এবং একথা

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৫
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৪

বলে আশান্বিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সৎ কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। তাই তিনি কেয়ামতের দিন তোমাদের যাবতীয় সৎ কাজের পূর্ণ সওয়াব দান করবেন।[১]

হজ্জের সফরে পাথেয় সংগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য

وَتَزَوَّدُوْا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى

অর্থাৎ তোমরা হজ্জের সফরে পাথেয় অবশ্যই সঙ্গে নেবে আর একথা নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বন করা।

শানে নুজুল

বোখারী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ এবং নাসায়ী শরীফ সহ হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থেও হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইয়েমেনবাসী হজ্জ করতো কিন্তু পাথেয় বলতে কোন কিছুই সঙ্গে আনতো না, পরে ভিক্ষা করত। ক্ষেত্র বিশেষে লুটতরাজও করত। অথচ তারা বলত আমরা এক আল্লাহ্র প্রতি ভরসা করে এসেছি, তাদের সম্পর্ক এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে– হজ্জযাত্রী মাত্রকে তার প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র এবং পানাহারের জন্যে অর্থ-সম্পদ অবশ্যই সঙ্গে নিতে হবে। আর মনে রাখতে হবে যে, সর্বোত্তম পাথেয় হলো পরহেযগারী তথা আল্লাহ্র ভয়। যে ভয় মানুষকে ভিক্ষা বৃত্তি থেকে এবং অপরের সম্পদ অপহরণ ও লুটতরাজ থেকে বিরত রাখে। অতএব, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক তথা আল্লাহ্র হুকুমের বিরোধিতা করোনা। আর এতেই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।[২]

এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন ইয়েমেনের অধিবাসীগণ যখন এহ্রাম বাঁধতো তখন নিজের যা মালপত্র থাকতো সব ফেলে দিতো এবং নতুন করে পাথেয় সংগ্রহ করতো। এর উপরে নির্দেশ হয়েছে তোমরা এমন কাজ করোনা; বরং নিজেদের প্রয়োজনের আয়োজন কর। এজন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বলেছেন, মানুষের ইজ্জত এতেই রয়েছে যে সে সফরের জন্যে উত্তম পাথেয় গ্রহণ করবে, তিনি তাঁর সাথীদের প্রতি এ শর্ত দিতেন যে, সফরে মুক্ত হস্তে ব্যয় করবে।[৩]

---

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৬
(২) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২. পৃষ্ঠা ৮৬
(৩) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫
তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৬৯

যেহেতু এ আয়াতে দুনিয়ার সফর-সামগ্রী সংগ্রহের তাগিদ করা হয়েছে তাই পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের সফরের সম্বল সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আখেরাতের সম্বল হলো আল্লাহ্‌র ভয় তথা তাকওয়া পরহেযগারী অর্থাৎ কবরের সফরে আল্লাহ্‌র ভয় সঙ্গে নিয়ে যাও যেমন অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ

অর্থাৎঃ পরহেযগারীর লেবাসই হলো উত্তম ও উপকারী, একখানি হাদীসে রয়েছে, যদি দুনিয়াতে সৎ কাজ কর তবে আখেরাতের অবশ্যই তার ফল ভোগ করবে। এখানকার আসবাব পত্র সেখানে উপকারী হবে। (তেবরানী)

এ আদেশ শ্রবণ করার পর একজন মিসকীন সাহাবী প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট তো কিছুই নেই। তিনি এরশাদ করলেন, এমন সম্পদ থাকা প্রয়োজন যার ফলে মানুষকে অন্যের নিকট সাহায্য কামনা না করতে হয়। আর উত্তম সম্পদ হলো আল্লাহ্‌র ভয় (এবনে আবি হাতেম) এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ হে বুদ্ধিমানগণ! আমাকে ভয় কর তথা আমার নির্দেশ মেনে চল।[১]

হজ্জের সফরে ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ নয়

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

শানে নুজুল

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন তাতে রয়েছে ঃ জাহেলিয়াতের যুগে তিনটি বাজার ছিল। ওকাজ, মুজান্নাহ, জুলমাজাজ। ইসলামের আবির্ভাবের পর সাহাবায়ে কেরাম হজ্জের মওসুমে এসব বাজারে ব্যবসা করা গুনাহর কাজ মনে করতেন। অথচ হজ্জ করাই যার মূল লক্ষ্য তার জন্যে এ সফরে কোন প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য করা অবৈধ নয়। তাই এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ হজ্জের সফরে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে কোন দোষ নেই।

ইমাম আহমদ, এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর এবং হাকেম বর্ণনা করেছেন ঃ আবু উমামা তাইমী নামক এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আমরা মুসাফিরদের আরোহণের জন্যেই ভাড়ায় সওয়ারী দিয়ে থাকি, লোকেরা বলে আমাদের হজ্জ হবে না। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি অন্যদের ন্যায় এহ্‌রাম বাঁধ না? তোমরা কি তওয়াফ কর না? তোমরা কি জমরাতে প্রস্তর নিক্ষেপ কর না? আমি বললাম ঃ আমরা এসব আরকান

(১) তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬

আদায় করি। তখন হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ তাহলে তোমাদের হজ্জ হয়েছে। অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বললেন ঃ এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে এ প্রশ্নই করেছিল, যা তুমি করেছ। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার কোন জবাব প্রদান করেননি।

এমন সময় তাঁর নিকট হাযির হলেন জিব্রাঈল (আঃ) এবং এ আয়াত নাজিল হলো।

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ- الايه

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে বলেছেন ঃ হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যকে সাহাবায়ে কেরাম অবৈধ মনে করতেন, এর কারণ এই ঃ

(১) পূর্ববর্তী আয়াতে হজ্জের সময় কলহ-দ্বন্দ্বকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে অথচ ব্যবস্যা-বাণিজ্যে লাভ-ক্ষতির সূক্ষ্ম বিচার যেখানে হয়, সেখানে ঝগড়া-ফাসাদের সম্ভাবনা সমধিক, তাই তাঁরা মনে করেছেন যখন ঝগড়া-ফাসাদ নিষিদ্ধ হয়েছে তখন ব্যবসা-বাণিজ্যও নিষিদ্ধ হবে।

(২) মূর্খতার যুগেও ব্যবসা-বাণিজ্যেকে হজ্জের মওসুমে অবৈধ মনে করা হতো, তাই স্বাভাবিক কারণেই মনে করা হয়েছে ইসলামের আলোকময় যুগেও হজ্জের সময় ব্যবসা নিষিদ্ধ থাকবে কেননা, হজ্জ হলো আল্লাহ্ পাকের স্মরণে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালনে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করে দেয়া, এমন অবস্থায় দুনিয়ার লাভ-লোভের চিন্তা তথা ব্যবসা-বাণিজ্য একান্ত অযৌক্তিক।

(৩) মুসলমানগণ যখন দেখলেন, হজ্জের কারণে অনেক মোবাহ কাজও অবৈধ বা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে যেমন সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছেদের ব্যবহার, সুগন্ধি জাতীয় বস্তুর ব্যবহার, জীব-জন্তু শিকার প্রভৃতি। তখন তাঁরা ধারণা করলেন, হয়তো এমনিভাবে ব্যবসা–বাণিজ্যও অবৈধ হবে।

(৪) এতদ্ব্যতীত, নামাযের সময় যেমন যাবতীয় কর্মকাণ্ড হারাম হয়ে যায় তেমনি হয়তো হজ্জের সময়ও যাবতীয় কার্যাবলী অবৈধ হবে, তাই আল্লাহ্ পাক তাদের এ ভুল ধারণার নিরসন-কল্পে ঘোষণা করেন ঃ "হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন দোষ নেই"।[১]

বস্তুতঃ ইসলাম হলো স্বভাব ধর্ম। মানুষের কল্যাণের জন্যেই ইসলামের যাবতীয় বিধান। মানুষের সকল প্রয়োজন পূরণের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা দেয় ইসলাম। লক্ষ লক্ষ মানুষ হজ্জের মওসুমে একত্রিত হয়। এই বিরাট সমাবেশে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন অবস্থার মানুষের অনেক প্রয়োজনই হতে পারে। অনেক সমস্যাই দেখা

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৫
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৬
তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭১

দিতে পারে। পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। তাই স্বভাব ধর্ম ইসলাম হজ্জের সময় ব্যবসা-বাণিজ্যকে অবৈধ ঘোষণা করেনি কেননা, ধর্ম জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়, বরং জীবনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এতদ্ব্যতীত, ইসলাম মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অগ্রগতির পথ প্রদর্শন করে। ইসলাম আল্লাহর নৈকট্য লাভের পন্থা শিক্ষা দেয় কিন্তু সেজন্যে নির্লিপ্ত জীবন-যাপনের তা'লীম দেয় না। ইসলাম ভোগবাদের মরফিয়া পান করে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীকে বিস্মৃত করার বিপদজনক পথ থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেয়। এর পাশাপাশি দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রেখেছেন তা বৈধ পন্থায় উপভোগ করে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে শোকর গুজারীর শিক্ষা দেয়। তাই হজ্জের মওসুমে ব্যবসা-বাণিজ্যে কোন দোষ নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

فَاِذَآ اَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ -الايه

অর্থাৎ "অবশেষে যখন তোমরা আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করবে তখন মাশআরে হারামের নিকট আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর"।

হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা। কোন কোন হাদীসে এমনও রয়েছে, "হজ্জ হলো আরাফাতের অবস্থান"। বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক দিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জোহর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করেছেন তখন একথাও এরশাদ করেছেন যে, "আমার নিকট থেকে তোমরা হজ্জের নিয়ম কানুন শেখ"। আরাফাত শব্দটি আরফার বহুবচন। যেহেতু এ ময়দানের প্রতিটি অংশকেই আরফা বলা হয় তাই তার বহুবচন হলো আরাফাত। এ শব্দটির আভিধাণিক অর্থ হলো পরিচয় পাওয়া।

আরাফাত নামকরণের কারণ

হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহ্ পাক হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-কে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলেন এবং তিনি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে হজ্জ করালেন। যখন তাঁরা আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হলেন তখন জিব্রাঈল (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ عَرَفْتَ অর্থাৎ ঃ আপনি কি পরিচয় পেয়েছেন? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, হ্যাঁ, পরিচয় পেয়েছি। তখন থেকে এ ময়দানের নাম আরাফাত হয়ে গেল।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আতা (রঃ) এবং আবু মুজলেয (রঃ) থেকেও একথাটি বর্ণিত আছে।[১]

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৭
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৬

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন ঃ আরাফাতের নামকরণের অন্য একটি কারণ বর্ণনা করেছেন যাহ্যাক (রঃ)। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক যখন হযরত আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ)-কে বেহেশত থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন তখন আদম (আঃ) অবতরণ করলেন শ্রীলংকার একটি পাহাড়ের ওপর (যেখানে এখনও তাঁর পদচিহ্ন সংরক্ষিত রয়েছে) আর হযরত হাওয়া (আঃ) অবতরণ করলেন বর্তমান সৌদী আরবের জেদ্দায়, তাঁদের সঙ্গে অনেকদিন পরস্পরের দেখা হয়নি। মাটির পৃথিবীতে সর্ব প্রথম তাঁরা আরাফাতের ময়দানে একত্রিত হন। আদম (আঃ) হাওয়া (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে'? তখন তিনি জবাব দেন, 'আমি হাওয়া, আমাকে একজন জীবিত মানুষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাই আমার নাম হয়েছে হাওয়া'। তিনি আদম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনি কে? তিনি বললেন, "আমি আদম, যমীনের মাটি থেকেই আমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আমার নাম রাখা হয়েছে আদম"। এভাবে তাঁরা একে অন্যের পরিচয় লাভ করেন আরাফাতের ময়দানে, আর এজন্যেই এ স্থানের নামকরণ করা হয়েছে আরাফাত।

অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে যখন হজ্জের নির্দেশ প্রদান করা হয় তখন তিনি হজ্জের ঘোষণা করলেন, আল্লাহ্ পাক যাদেরকে তওফিক দান করলেন তারা তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন। তখন আল্লাহ্ পাক তাঁকে নির্দেশ দিলেন আরাফাতে গমন করার জন্যে এবং তাঁকে আরাফাতের চিহ্ন সমূহ জানিয়ে দিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক যথাস্থানে পৌঁছে আরাফাতের ময়দানের পরিচয় পেলেন। তখন থেকেই এ স্থানটিকে 'আরাফাত' বলা হয়।

আবু সালেহ থেকে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি তাঁর পুত্র ইসমাঈলকে (আঃ) জবেহ করছেন। পরের দিন এ চিন্তায় কেটে গেল। সেদিন ছিল আরফার দিন। আরাফাতের রাত্রে পুনরায় একই স্বপ্ন দেখলেন ঃ তখন তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, এ স্বপ্ন অবশ্যই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে। তখন থেকে এ দিনকে আরাফাতের দিন বলা হয়।[১]

মাশআরে হারাম

মোজদালেফার দুটি পাহাড়ের মধ্যস্থলের নাম মাশআরে হারাম অর্থাৎ আরাফাত থেকে মোজদালেফায় এসে হাজী মাত্রকে রাত্রি যাপন করতে হয় এবং এখানে আল্লাহ পাককে বিশেষ ভাবে স্মরণ করার নির্দেশ রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, এ বিশেষ জিকরের তাৎপর্য হলো, মোজদালেফায় মাগরিব এবং এশার নামায একত্রে আদায় করতে হয়। আর নামাযের উদ্দেশ্যই তো হলো আল্লাহ্র জিকর। যেমন কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৬

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

অর্থাৎ "আমার জিকরের জন্যে তোমরা নামায কায়েম কর"।

এতে একথাও প্রমাণিত হয়, মোজদালেফাতে আল্লাহ্‌র জিকরই মুখ্য বিষয়। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

অর্থাৎ "মাশআরে হারাম বা মোজদালেফায় আল্লাহ্‌র জিকর কর"।

অতএব, এখানে আল্লাহ্‌র জিকরের আদেশ হয়েছে। [১]

وَاذْكُرُوْهُ كَمَا هَدٰكُمْ

আর তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন অর্থাৎ যেভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে তৌহীদের শিক্ষা দিয়েছেন সেভাবে তোমরা তাঁকে স্মরণ কর। আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে হজ্জের আরকান-আহকাম শিক্ষা দিয়েছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর তরীকাকে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন অথচ তোমরা এ সম্পর্কে অবগত ছিলে না, তথা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেদায়েত লাভের পূর্বে অথবা পবিত্র কোরআন নাজিল হওয়ার পূর্বে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে তোমরা ছিলে গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। এখন তোমরা আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর যেভাবে তিনি পবিত্র কোরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন।[২]

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

প্রশ্ন হতে পারে, পূর্বের আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তোমরা মাশআরে হারামে আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর, আর এ আয়াতেও একই কথার পুনরাবৃত্তি করে এরশাদ হয়েছে ঃ

"তোমরা আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন"।

অতএব, পরপর দুটি আয়াতে একই কথা বলার তাৎপর্য কি?

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এর জবাবে বলেছেন–

(১) প্রথমবারের জিকর হলো আল্লাহ্ পাকের আসমায়ে হুসনা দ্বারা তাঁকে স্মরণ করা।

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৮
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৮

(২) আর দ্বিতীয়বার জিকরের তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত বিধি-নিষেধ পালন করা, এজন্যে এরশাদ হয়েছে, "তোমরা আল্লাহ্কে স্মরণ কর যেভাবে তিনি তোমাদেরকে হেদায়েত করেছেন"। আর আল্লাহ্ পাকের এই হেদায়েতের জন্যে তোমরা তাঁর শোকর গুজার হও।

(৩) আল্লাহ্র জিকর দু' ভাবে হতে পারে- রসনা দ্বারা এবং অন্তর দ্বারা। প্রথম আয়াতে রসনা দ্বারা জিকরের কথা বলা হয়েছে, দ্বিতীয় আয়াতে অন্তর দ্বারা জিকরের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(৪) পরপর দুটি আয়াতে আল্লাহ্র জিকরের তাৎপর্য হলো, জিকরের পর জিকর কর অর্থাৎ অধিক পরিমাণে জিকর কর। যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

অর্থাৎ ঃ আল্লাহ্ পাকের জিকর কর অধিক পরিমাণে হয়তো তোমরা সফলকাম হবে।

(৫) প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ পাক মোজদালেফায় আল্লাহ্কে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, এতদ্বারা শরীয়তের বিধান সমূহ পালনের ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরবর্তী আয়াতে পুনরায় আল্লাহ্র জিকরের হুকুমের তাৎপর্য হলো, হে আল্লাহর পথের সাধক, শুধু যে তুমি আল্লাহ্র জিকর করবে তোমার রসনা দ্বারা এবং শুধু যে তুমি তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করবে তাই নয়; বরং তোমার অন্তর থেকে আল্লাহ্ ব্যতীত আর সবকিছুকে দূরে সরিয়ে দেবে। অন্তরকে সংরক্ষণ করবে শুধু এক আল্লাহ্ পাকের স্মরণের জন্যে, কেননা তিনি অন্তর্যামী।[১]

মূলত ঃ এভাবে মানুষ আল্লাহর জিকরের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভ করে। এ নৈকট্যের বহু স্তর রয়েছে, আল্লাহর পথের সাধনা দ্বারা তথা সর্বদা আল্লাহ্র জিকর দ্বারা এ স্তর সমূহ অতিক্রম করতে হয়। যে আল্লাহ্র যতবেশী জিকর করে সে তাঁর ততবেশী নৈকট্য লাভ করে। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উম্মুল উমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ তিনি সর্বদা আল্লাহ্র জিকর করতেন তথা সর্বাধিক আল্লাহ্র জিকর করতেন। এজন্যে আল্লাহ্ পাকের সর্বাধিক নৈকট্যও তিনিই লাভ করেছেন। অতএব, আল্লাহ্ পাকের জিকরের বিভিন্ন স্তরের প্রতি লক্ষ্য করলে পরপর জিকরের তাগিদ অতি সুন্দর এবং অত্যন্ত আর্কষণীয় মনে হয়।

ثُمَّ اَفِيْضُوْا مِنْ حَيْثُ اَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৭৯

"অতঃপর যে স্থান থেকে অন্য লোক প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও সে স্থান থেকে প্রত্যাবর্তন কর এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়"।

বোখারী শরীফে রয়েছে, কোরায়েশ গোত্রের লোকেরা আরাফাতের ময়দানে হাযির হতো না, তারা মুজদালেফায়ই ওকুফ করতো, তারা মনে করতো তারা অভিজাত বংশের লোক, তারা পবিত্র কা'বা শরীফের খেদমতে নিয়োজিত তাদের মর্যাদা উচ্চতর। তাই সাধারণ মানুষের ন্যায় তারা আরাফাতে হাযির হতো না; বরং মুজ্জালেফায় থাকতো। সেখান থেকে তারা প্রত্যাবর্তন করতো।

এ অন্যায় প্রথা বাতিল ঘোষণা করে আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে- অন্য মানুষ যেভাবে আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন করে তোমরাও তেমনি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন কর। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহেদ (রঃ), হযরত আতা (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।[১]

এতদ্বারা আল্লাহ্ পাক একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, আরাফাতে অবস্থান করা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর তরীকা। যারা বলেছেন ঃ আয়াতে 'আন্ নাস' শব্দটি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর উদ্দেশে উচ্চারিত হয়েছে (যেমন কোরআনে করীমের অন্যত্র- أَمْ يَحْسُدُوْنَ النَّاسَ আয়াতে 'আন্ নাস' শব্দটি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে উল্লেখিত হয়েছে)। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো, যেভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং অন্যান্য সমস্ত মানুষ আরাফাতে ওকুফ করে তোমরাও সেভাবে আরাফাতে হাযিরা দাও। মোজদালেফায় রাত্রি যাপন করে পরদিন সেভাবে নিয়মিতভাবে মিনায় প্রত্যাবর্তন কর।

এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর কেননা, হজ্জের আরকান আদায়ের ব্যাপারে যে সব ভুল-ত্রুটি হয়েছে, তিনি যেন তা ক্ষমা করে দেন। সাধারণত ঃ সকল এবাদতের পরেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম রয়েছে। কেননা, আল্লাহ্ পাকের শান মোতাবেক যেভাবে এবাদত করা উচিত তার শক্তি আমাদের নেই। দ্বিতীয়ত ঃ বন্দেগীর যে হক্ব আদায় করা আমাদের কর্তব্য রয়েছে তা পালনেও আমাদের গাফলত অপরিসীম। এতদ্ব্যতীত ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় এবাদতে ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে, এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া গত্যন্তর নেই। স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক ফরজ নামাযের পরে তিনবার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করে আমাদেরকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন। বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরফার দিন সন্ধ্যায় উম্মতের জন্যে এস্তেগফার করেছেন। (এবনে জরীর)

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯৭

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বশ্রেষ্ঠ এস্তেগফার হলো ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَاَنَا عَبْدُكَ وَاَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ اَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَاِنَّهٗ لَايَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে এ দোয়া পাঠ করবে যদি সে রাত্রেই তার মৃত্যু হয় তবে অবশ্যই সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি দিনে এ দোয়াটি পড়বে আর সেদিনই যদি তার মৃত্যু হয়, তবে সেও জান্নাতী হবে। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবু বকর (রাঃ) একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন দোয়া শিক্ষা দিন যা আমি নামাযে পাঠ করবো। তখন তিনি এরশাদ করলেন, এ দোয়া পাঠ কর ঃ

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (বোখারী শরীফ)[১]

فَاِذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَذِكْرِكُمْ اٰبَآءَكُمْ اَوْ اَشَدَّ ذِكْرًا ؕ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ
رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ
يَّقُوْلُ رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ نَصِيْبٌ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ۝

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৫৯

তরজমা

(২০০) অতপর যখন হজ্জের কার্যাবলী সমাপ্ত কর তখন আল্লাহ্ পাকে স্মরণ কর, ঠিক যেভাবে তোমাদের পিতা, পিতামহকে স্মরণ করতে এবং তা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে স্মরণ কর। কোন কোন লোক এমনও আছে যারা বলে থাকে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান কর। তার জন্যে পরকালে কিন্তু কিছুই নাই।

(২০১) তাদের মধ্যে কোন কোন লোক বলে থাকে– হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালের এবং পরকালের কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর।

(২০২) এ ধরনের লোক তাদেরই আমলের কারণে বড় অংশ প্রাপ্ত হবে। আর আল্লাহ্ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন আইয়ামে জাহেলিয়াতে লোকেরা হজ্জের পরে একত্রিত হতো এবং নিজেদের পূর্ব পুরুষদের গৌরবের কথাবার্তা এবং বংশীয় মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনায় রত হতো। এ প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

হজ্জের পর আল্লাহ্র জিকর থেকে গাফলত না করার নির্দেশ

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন ঃ হজ্জের আরকান-আহ্কাম সুসম্পন্ন করার পর অধিক পরিমাণে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। যেভাবে সন্তান-সন্ততি তাদের পিতা-মাতাকে স্মরণ করে তোমরা সেভাবে আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এর আরেকটি অর্থ হলো, যেভাবে বর্বরতার যুগে লোকেরা এখানে একত্রিত হয়ে নিজেদের বংশীয় মর্যাদার কথা উল্লেখ করতো এবং তাদের পূর্ব পুরুষদের কাহিনী বর্ণনা করতো তাই আল্লাহ্ পাক আদেশ দিয়েছেন এ সমস্ত অহেতুক কথা পরিত্যাগ কর এবং আল্লাহ্ পাককে স্মরণ কর অধিক পরিমাণে। আল্লাহ্ পাকের মাহাত্ম, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাঁর অসীম নেয়ামতের কথা স্মরণ কর। অধিকাংশ তফসীরকারগণ এ ব্যাখ্যাই করেছেন আলোচ্য আয়াতের।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে, আল্লাহর জিকর অধিক পরিমাণে করার পর তাঁর মহান দরবারে দোয়া কর, কেননা এটি দোয়া কবুল হওয়ার এক সুবর্ণ সুযোগ।

فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ رَبَّنَا

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড (২) পৃষ্ঠা ৮৯-৯০

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন ঃ বর্বরতার যুগে আরবরা এখানে এসে এ দোয়া করতো, হে আল্লাহ! এ বছর বৃষ্টি দান করেছ, অধিক পরিমাণে ফসল দান কর, অধিক পরিমাণে সন্তান-সন্ততি দান কর। অর্থাৎ তারা শুধু এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সুখ-শান্তির জন্যেই দোয়া করতো এবং তাদের সকল সাধনা দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনকে কেন্দ্র করেই অব্যাহত থাকতো।[১] এজন্যেই আয়াতের শেষার্ধে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَمَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ

অর্থাৎ যেহেতু তারা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে বিশ্বাস করতো না ফলে তজ্জন্যে কোন সৎ কাজও করতো না তাই তাদের জন্যে আখেরাতে কোন অংশ নেই তথা আখেরাতের নেয়ামত থেকে তারা হবে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কেননা তারা নিজেরাই বলেছে ঃ "হে আল্লাহ! আমাদেরকে যা কিছু দেয়ার দুনিয়াতেই দাও"।

পক্ষান্তরে যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করে এবং এজন্যে সাধনায় রত হয়, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তারা এভাবে আরাধনা করে ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়ার জিন্দেগীতে কল্যাণ দান কর, তোমার বন্দেগীর তওফিক দান কর, তোমার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সুবর্ণ সুযোগ দান কর এবং আখেরাতের কল্যাণও দান কর তথা নেক আমলের সওয়াব আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত এবং চিরকালীন শান্তির প্রাণকেন্দ্র জান্নাত দান কর এবং দোযখের কঠোর শাস্তি থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

যারা এভাবে দোয়া করে নিঃসন্দেহে তারা আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে সর্ব প্রকার কল্যাণ লাভে ধন্য হবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন ঃ দুনিয়ার জীবনের কল্যাণ হলো স্বাস্থ্য, আরাম, বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার, এলম ও আমল, উত্তম যানবাহন, চাকর-চাকরানী, মান-সম্মান প্রভৃতি। আর আখেরাতের জিন্দেগীর কল্যাণ হলো কেয়ামতের দিবসের হিসাব সহজ হওয়া, কেয়ামতের কঠিন দিনের ভয়-ভীতি থেকে নাজাত পাওয়া, ডান হাতে আমলনামা পাওয়া, আল্লাহ্র নেয়ামত লাভে আনন্দিত হওয়া এবং জান্নাতে প্রবেশ করা। অতঃপর দোযখ থেকে পানাহ্ চাওয়ার অর্থ হলো আল্লাহ্ পাক এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেবেন যদ্বারা যাবতীয় অন্যায়-অবৈধ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। হযরত কাসেম (রঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিকে শোকর আদায়কারী ও আল্লাহ্র জিকরকারী রসনা প্রদান করা হয়েছে তাকে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে।[২]

---

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৮৭
তফসীর এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০

মূলতঃ এজন্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا

অর্থাৎ তারা যা উপার্জন করেছে তার প্রাপ্য অংশ তাদেরই।

অতএব, দুনিয়ার এ জীবনেই অর্জন করতে হবে প্রতিটি মানুষকে তার আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সম্বল। কেননা এ দুনিয়াই হলো প্রতিটি মানুষের কর্মস্থল। আখেরাতে কর্ম নেই শুধু এ জীবনের কর্মের ফল আছে। আর আখেরাত অনেক দূরেও নয় আর অনিশ্চিতও নয়; বরং সুনিশ্চিত, অবশ্যম্ভাবী এবং অনিবার্য। তাই এরশাদ হয়েছে পরবর্তী আয়াতে ঃ

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ইমাম বোখারী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপরোল্লিখিত দোয়াটি অধিক পরিমাণে পাঠ করতেন। এই হাদীসে ربنا শব্দটির পূর্বে اللهم শব্দটি সংযোজিত হয়েছে। ইমাম কাতাদা হযরত আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে কোন্ দোয়াটি পাঠ করতেন? তখন তিনি এ দোয়ারই উল্লেখ করেন। হযরত আনাস (রাঃ) যখন নিজে দোয়া করতেন তখন এ দোয়া পাঠ করতে ভুলতেন না।[১]

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দেখলেন, একজন রুগ্ন ব্যক্তি অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় রয়েছেন। তাঁর দেহে শুধু হাড়গুলোই রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কোন দোয়া করেছিলে"? তিনি জবাব দিলেন, "জ্বী" হ্যাঁ। আমি এই বলে দোয়া করেছিলাম– "হে আল্লাহ্! তুমি আখেরাতে আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও তা দুনিয়াতেই দিয়ে দাও"। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "সুবহানাল্লাহ্! আল্লাহ্র আযাব বরদাশ্ত করবার মত শক্তি কার আছে? তুমি رَبَّنَا آتِنَا এ দোয়াটি কেন পাঠ করলে না"? তখন সে রুগ্ন ব্যক্তি এ দোয়াটি পাঠ করলেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাকে স্বাস্থ্য-সুখ দান করলেন।[২]

وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক অতি সত্ত্বর হিসাব গ্রহণকারী।

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬০
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৩
তফসীরে রূহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯১

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন ঃ চোখের পলক ফেলতে যত সময় লাগে তার চাইতেও অল্প সময়ের মধ্যে হিসাব নেয়া হবে। আবার কোন কোন তফসীরকার বলেন, যেহেতু কেয়ামত সমাগত প্রায় তাই এ সম্পর্কে সতর্ক থাকা এবং আখেরাতের জন্যে নেক আমল সঞ্চয়ে মশগুল থাকা সকলেরই একান্ত কর্তব্য।[১]

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْدُوْدٰتٍ ۭ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِيْ يَوْمَيْنِ فَلَآ اِثْمَ
عَلَيْهِ ۚ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۙ لِمَنِ اتَّقٰى ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا
اَنَّكُمْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰي مَا فِيْ قَلْبِهٖ ۙ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ ۝ وَاِذَا
تَوَلّٰى سَعٰى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۭ
وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ ۝ وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ
بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ ۭ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ ۝

তরজমা

(২০৩) আর আল্লাহ্ পাককে নির্ধারিত সময়ে স্মরণ কর। অতঃপর যে ব্যক্তি দুই দিনের মধ্যেই তাড়াতাড়ি চলে যায় তার কোন দোষ নেই। আর যে থেকে যায় তারও কোন গুনাহ্ নেই যে আল্লাহ্কে ভয় করে। আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং জেনে রাখ তোমাদের সকলেই তাঁর মহান দরবারে অবশ্য অবশ্য একত্রিত হবে।

(২০৪) আর এমনও লোক আছে যার কথা-বার্তা ক্ষণস্থায়ী জীবন সম্বন্ধে আপনাকে (হে রসূল!) আশ্চর্যন্বিত করছে এবং সে তার অন্তরের পবিত্রতার উপর আল্লাহ্ পাককে সাক্ষী করছে, অথচ সে ভয়ানক বিরুদ্ধাচারী।

(২০৫) আর (হে রসূল!) যখন সে আপনার নিকট থেকে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়। আর শস্য ও জীব-জন্তু ধ্বংস করে দেয়। আর আল্লাহ পাক আদৌ অশান্তিকে পছন্দ করেন না।

(২০৬) এবং যখন তাকে বলা হয় আল্লাহ্ পাককে ভয় কর তখন তার অহংকার ও ঔদ্ধত্য তাকে পাপাচারে লিপ্ত করে। অতএব, তার জন্যে জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয় তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৪

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ আর আল্লাহ্ পাককে তোমরা স্মরণ কর নির্দিষ্ট সময়ে। এ নির্দিষ্ট সময় হলো আইয়ামে তাশ্‌রীক তথা জিলহজ্জ মাসের নয় তারিখ থেকে তেরো তারিখ পর্যন্ত। আর আয়াতে জিকরের তাৎপর্য হলো জিলহজ্জের ৯ তারিখ ফজর থেকে ১৩ তারিখ আছর পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করা (অর্থাৎ আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর ওয়াল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

অথবা জিকরের অর্থ সেই তাকবীর যা শয়তানকে কংকর নিক্ষেপের সময় পাঠ করা হয়।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আরফার দিন, কোরবানীর দিন এবং তাশরীকের দিন সমূহ আমাদের জন্যে ঈদের দিন। আর এ দিন সমূহ পানাহারের জন্যে (আহ্‌মদ)। অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ আইয়ামে তাশরীকের দিন সমূহ (আহমদ)। এমনিভাবে আরও একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ তাশরীকের দিন সমূহ পানাহার এবং আল্লাহ্‌র জিকরের জন্যে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে হুজায়ফা (রাঃ)-কে প্রেরণ করলেন যেন তিনি মীনায় একথা প্রচার করেন যে, এ দিন সমূহে যেন কেউ রোজা না রাখে। কেননা এ দিনগুলো পানাহার ও আল্লাহর জিকরের জন্যে। আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে– হযরত আলী (রাঃ) এ আদেশ সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ দিন সমূহ রোজা রাখার জন্যে নয়; বরং পানাহার ও আল্লাহ্‌র জিকরের জন্যে।[২]

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ

যেহেতু বর্বরতার যুগে যারা মীনায় শুধু দু' দিন অবস্থান করতো তাদেরকে মন্দ বলা হতো এবং গুনাহ্‌গার মনে করা হতো এবং যারা তৃতীয় দিনও থাকতো কোন কোন লোক তাদেরকেও পাপী মনে করতো। তাদের ভুল ধারণা নিরসন-কল্পে এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিন দিন বা দু' দিন মীনায় অবস্থানে কোন দোষ নেই। অতএব, দু' দিন বা তিন দিন অবস্থান করা জায়েয বা বৈধ তবে তিন দিন অবস্থান করা উত্তম।

এখানে উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে-ব্যক্তি দ্বিতীয় দিন মীনা থেকে বিদায় হলো না এবং তাশরীকের সময় তৃতীয় দিন এসে গেল তখন সে দিনের কংকর নিক্ষেপ করা তার প্রতি ওয়াজিব হবে। অবশ্য ইমাম আবু হানিফা (রঃ) বলেছেন, ঐ ব্যক্তির প্রতি কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব নয় তবে যদি কেউ মীনায়

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৩৯
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬১

তৃতীয় দিন সকাল পর্যন্ত থাকে তার প্রতি ঐ দিনের কংকর নিক্ষেপ করা অবশ্য কর্তব্য হবে। কিন্তু যদি কেউ সোবহে ছাদেকের পূর্বেই মীনা থেকে রওনা হয়ে যায় তবে তাও তার জন্যে বৈধ। কেননা ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে কংকর নিক্ষেপের সময় হলো দিবাভাগ। যে রাত্রেই রওনা হয়ে যায় তার দৃষ্টান্ত হলো এমন যে কোন ব্যক্তি জুমআর দিন নামাযের সময় হওয়ার পূর্বেই ভ্রমণ আরম্ভ করে তার প্রতি জুমআ ওয়াজিব নয়। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম একথা বলেন যে, যদিও কংকর নিক্ষেপ করার সময় রাত নয় কিন্তু অবস্থানের সময় তো অবশ্যই। আর রাত্রির আগমন ঘটলে মীনাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব। সেখানে থেকে বিদায় গ্রহণ বৈধ নয়।

فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মীনায় দু' দিন অবস্থানের পর মক্কা শরীফ প্রত্যাবর্তন করলো তার কোন গুনাহ নেই। কেননা সে শরীয়ত প্রদত্ত বিধানের উপর আমল করেছে।

وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقٰى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিলম্ব করলো তথা মীনায় অবস্থান করলো তারও কোন গুনাহ্ নেই। কেননা এটিই উত্তম পন্থা সে পরহেযগারী অবলম্বন করে। এর আরেকটি তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে, যে বা যারা হজ্জের সময় অবৈধ কর্মকাণ্ড থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হয় তাকে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমা করা হয়। সে মীনাতে দু' দিন অবস্থান করুক বা তিন দিন। আল্লামা বগভী (রঃ) বলেছেন, হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) উপরোক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আরেকখানি হাদীস এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হজ্জ করে এবং কামাচার ও যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত থাকে সে এমন নিঃষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে যেন এখনই সে জন্ম গ্রহণ করেছে"। এই হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। তিনি এ মর্মে আরও একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ "হজ্জে মাব্রূর (অর্থাৎ যে হজ্জে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না হয়) এর বিনিময় জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই নয়"।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ হজ্জ এবং ওমরাহ্ উভয়ে অভাব এবং গুনাহকে এভাবে দূর করে যেরূপ আগুনের ভাটা লোহার মরিচাকে দূর করে।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৫

এখানে উল্লেখ্য, আইয়ামে তাশরীকে মীনায় অবস্থান, রাত্রি যাপন এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করা হজ্জের রোকনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

فَاذَا قَضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ

এ আয়াতে হজ্জের আরকান আদায়ের পর মীনায় আল্লাহ্র জিকরের নির্দেশ রয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মীনায় অবস্থান কালের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আরকানে

হজ্জের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে এসব কাজ ওয়াজিব কিনা এ সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আহমদ (রঃ) বলেছেন ঃ মীনাতে রাত্রি যাপন ও পাথর নিক্ষেপ উভয়ই ওয়াজিব। আর ইমাম মালেক (রঃ)-এর মতে মীনাতে রাত্রি যাপন করা ওয়াজিব তবে কংকর নিক্ষেপ করা সুন্নতে মোয়াক্কাদা। পক্ষান্তরে, ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে কঙ্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব এবং মীনাতে অবস্থান করা সুন্নত। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) থেকে দু'টি অভিমত বর্ণিত আছে। একটি ইমাম আহ্মদ (রঃ) এবং অপরটি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতের অনুরূপ।[১]

وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوْا .....

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর কেননা, পরহেযগারী অবলম্বনের মধ্যেই জীবন-সাধনার সার্থকতা নিহিত রয়েছে। আর একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ, তোমরা অবশ্যই আল্লাহ পাকের মহান দরবারে একত্রিত হবে। মূলতঃ একথাটি জানা এবং মানার মাধ্যমেই পরহেযগারী অবলম্বন করা সম্ভব হয়। আর পরহেযগারী অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ করা যায়। আর আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এজন্যে হাযির করা হবে যেন প্রত্যেককে তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বিনিময় প্রদান করা যায়। নেক আমল হলে পুরস্কার এবং বদ আমল হলে শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এজন্যেই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

অর্থাৎ সেদিনকে ভয় কর যেদিন তোমরা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যেককে তার যাবতীয় কার্যাবলীর পূর্ণ বিনিময় প্রদান করা হবে এবং কারো প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবেনা।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪০৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهٗ.....

ইতোপূর্বে হজ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর এ প্রসঙ্গে মোমেন ও কাফেরদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে ঃ মুনাফেকরা প্রকাশ্যে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে অথচ অন্তরে ইসলাম এবং মুসলমানদের ব্যাপারে শত্রুতা পোষণ করে। প্রকাশ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খোশামোদ করে এবং তাদের আন্তরিকতার উপর আল্লাহ্ পাককে সাক্ষী রাখে এবং বলে আমরা খাঁটি মুসলমান, আমরা প্রাণ দিয়ে ইসলামকে ভালবাসি অথচ তারা ছিল মুনাফেক, তারা ছিল কলহ-প্রিয়, তারা ছিল সুযোগ সন্ধানী, সুযোগ পেলেই তারা লুটতরাজ করতো, ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে আদৌ কুণ্ঠিত হতো না।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আখনাস এবনে শুরাইখ মগ্রফী সম্পর্কে। সে প্রকৃত অবস্থায় মুনাফেক ছিল। প্রকাশ্যে ইসলামের কথা বলতো অথচ অন্তরে ইসলামের দুশমন ছিল। এ লোকটি ছিল অত্যন্ত সুবক্তা, সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে ইসলামের প্রতি তার আন্তরিক ভালবাসার কথা বলে বেড়াতো। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ আলোচ্য আয়াত মুনাফেকদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে।[১]

وَاِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ

যারা কোন প্রকার সুযোগ পেলেই দুনিয়াতে অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষের ক্ষতি সাধন করে তাদের ফসল বিনষ্ট করে। আর আল্লাহ্ পাক ফেৎনা-ফাসাদ বা অশান্তিকে পছন্দ করেন না, তাই যারা ফেৎনা-ফাসাদ বা অশান্তি সৃষ্টি করে তাদেরকেও পছন্দ করেন না। আর এ মুনাফেকদের অবস্থা এই, যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর কেননা, আল্লাহ্ পাক অন্যায়কারীদেরকে অবশ্যই শাস্তি দেবেন তখন তাদের অহংকার তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত করে। বস্তুতঃ এমন অন্যায় কারীদের জন্যে দোযখ যথেষ্ট আর তা অত্যন্ত মন্দ স্থান।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, মুনাফেকরা শুধু যে সর্বদা আল্লাহ্র নাফরমানীতে এবং ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুতায় লিপ্ত থাকতো তাই নয়; বরং তাদেরকে কেউ নসিহত করলে তারা আরও বেশী অহংকার এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো। পরিণামে তারা আরও বেশী পাপাচারে লিপ্ত হতো। কারও নসিহত কবুল করার মত ভাগ্য তাদের

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ) খণ্ড-৩, পৃষ্ঠা ৬২
তফসীরে হক্কানী পারা-২ পৃষ্ঠা ৭২
খোলাসাতুত্ত্যাফাসীর, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা ১৪০
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড-২, পৃষ্ঠা ৯৫

হতো না। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেনঃ অত্যন্ত বড় অপরাধ হলো এই যে, যদি কেউ কোন মানুষকে বলে তুমি "আল্লাহকে ভয় কর" তখন সে আল্লাহ্কে ভয় করার স্থলে প্রতি-উত্তরে বলে তুমি নিজের চিন্তা কর, অপরকে উপদেশ দিওনা। মূলতঃ এটিই হলো অহংকারীদের পন্থা।

একবার এক ব্যক্তি হযরত ওমর (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আল্লাহ্ কে ভয় করুন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্র ভয়ে দরবারে এলাহীতে সেজদারত হলেন। অতঃপর বললেন, যদি আমাদেরকে কেউ নসিহত না করে তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে কোন কল্যাণই থাকে না।

এক ব্যক্তি হযরত মালেক এবনে মাকউলকে বলেছিলেন اتق الله অর্থাৎ আল্লাহ্কে ভয় কর। বাক্যটি শ্রবণ করা মাত্র তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে সেজদারত হলেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, যে কেউ নসিহত করলে তা বিনীতভাবে গ্রহণ করাই মুসলমানের কর্তব্য। আর বিশেষ করে যদি আল্লাহ্ পাকের ভয়ের কথা কেউ বলে তখন দরবারে এলাহীর শ্রেষ্ঠত্বের উপলব্ধি নিয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়া এবং তাঁর মহান দরবারে মাথা নত করে গোলামী পেশ করা কল্যাণকামী মানুষের জন্য একান্ত করণীয় এবং এটিই মর্দে মোমেনের কাজ।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ
يَّشْرِيْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾ يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً ۪ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ
الشَّيْطٰنِ ؕ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾ فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ
الْبَيِّنٰتُ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٠٩﴾ هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ
يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِيْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ؕ
وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ﴿٢١٠﴾

তরজমা

(২০৭) আর মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা একমাত্র আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে স্বীয় জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করে দেয় আর আল্লাহ্ পাক এমন বন্দাদের উপর অত্যন্ত দয়াবান।

(২০৮) হে মোমেনগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, সে সত্যিই তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(২০৯) অতঃপর তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রমাণ সমূহ আসা সত্ত্বেও যদি তোমরা পথভ্রষ্ট হও তবে জেনে রাখো, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ক্ষমতাবান এবং বিজ্ঞানময়।

(২১০) তারা কি শুধু এরই অপেক্ষা করছে যে, আল্লাহ্ পাক এবং ফেরেশতাগণ মেঘের ছায়াতলে আগমন করেন এবং সমস্ত বিষয় মীমাংসা হয়ে যাবে আর আল্লাহ্ পাকের দরবারেই সমস্ত বিষয় প্রত্যাবর্তিত হবে।

তফসীরুল কোরআন

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ

(এবং মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে এক আল্লাহ্ পাকের জন্যে।)

শানে নুযুল

হযরত সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, বিখ্যাত সাহাবী হযরত সোহায়েব এবনে সেনান রুমী (রাঃ) যখন মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে গমন করছিলেন তখন মক্কার কোরায়েশরা তাঁর পিছু ধাওয়া করে। হযরত সোহায়েব (রাঃ) তীর-ধনুক হাতে নিয়ে হামলায় উদ্যত লোকদের সম্বোধন করে বললেন ঃ হে কোরায়েশ! তোমরা অবশ্যই অবগত আছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে তীর নিক্ষেপে সবচেয়ে বেশী পারদর্শী। আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত একটি তীরও আমার হাতে থাকবে ততক্ষণ তোমরা আমাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর তীর শেষ হয়ে গেলে তরবারি হাতে নিয়ে নেবো এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আমার তরবারি ব্যবহৃত হবে। তবে যদি তোমরা চাও আমি মক্কা শরীফে আমার পরিত্যক্ত ধন-সম্পদের ঠিকানা তোমাদের দিয়ে দেই, তোমরা তা এখনই দখল করতে পারো এবং আমাকে ছেড়ে দিতে পারো। হামলাকারীরা তার এ প্রস্তাব গ্রহণ করলো এবং তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদীনা তৈয়্যবায় হাযির হলেন এবং এ ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে এরশাদ করলেন, আবু ইয়াহইয়া! তোমার এ ব্যবসা বড়ই লাভজনক হয়েছে। বাক্যটি তিনি দু' বার উচ্চারণ করলেন, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। হারেস এ ঘটনাকে হাম্মদ এবনে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি হযরত সাবেত (রাঃ) থেকে এবং তিনি হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন এবং তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছেন যে, এ আয়াত হযরত সোহায়েব (রাঃ) সম্পর্কেই নাযিল

হয়েছে।[১] আল্লামা এবনে কাসীর (রাঃ) এ ঘটনার উদ্ধৃতি দেয়ার পর বলেছেনঃ অনেক তফসীরকারের মতে এই যে খোশ-খবরী রয়েছে তা সেই সময়ের সত্য-সাধক মুজাহেদ্বীনের জন্যে, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদের উদ্দেশে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেন। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক মোমেনদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করেছেন **জান্নাতের** বিনিময়ে।[২]

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন ঃ এ আয়াত আজল এবং কারা গোত্রের লোকদের হাতে শহীদানের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ আজল এবং কারা গোত্রের কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে সালাম করে এবং আরজ করেঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের এখানে মুসলমান রয়েছে। আপনি কয়েকজন সাহাবায়ে কেরাম আমাদের সঙ্গে দেন যারা আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের শিক্ষা দান করবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খোবাইব এবনে আব্দী আনসার, মারসাদ এবনে আবী মারসাদ গানাবী, খালেদ এবনে বকর, আবদুল্লাহ এবনে তারেক এবং যায়েদ এবনে দাসনা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামকে প্রেরণ করলেন এবং আসেম এবনে সাবেত আনসারী (রাঃ)-কে তাঁদের নেতা নির্বাচন করে দিলেন।

কিন্তু কাফেররা বিশ্বাসঘাতকতা করলো এবং চারদিক থেকে প্রায় দু'শত লোক তীর-ধনুক দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে তাদের ঘেরাও করে ফেলল। সাহাবায়ে কেরাম এ অবস্থায় পাহাড়ের একটি উঁচু টিলায় আরোহণ করলেন। এরপর কাফেররা বললো, আমরা তোমাদের হত্যা করতে চাই না তবে মক্কবাসীর হাতে তোমাদের সোপর্দ করে কিছু অর্থ-সম্পদ অর্জন করতে চাই। অতএব, তোমরা পাহাড়ের উপর থেকে অবতরণ কর। হযরত আসেম (রাঃ) বললেন ঃ 'কাফেরদের কথার উপর আমার কোন আস্থা নেই। হে আল্লাহ্! আমি তোমার দ্বীনের সাহায্যের জন্যে এখানে এসেছি, তুমি আমার দেহের হেফাজত কর। হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয় রসূলকে আমাদের খবর দিও'। আল্লাহ্ পাক হযরত আসেম (রাঃ)-এর এ দোয়া কবুল করেন। যেদিন তিনি শহীদ হয়েছেন সেদিনই আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনার সংবাদ দিয়ে দিলেন। যাহোক যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, কাফেররা মুসলমানদের উপর তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো। হযরত আসেম (রাঃ) সহ সাত জন সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করলেন। হযরত খোবায়েব, হযরত আবদুল্লাহ এবনে তারেক এবং হযরত যায়েদ (রাঃ) জীবিত রইলেন। হযরত আসেমের (রাঃ) শাহাদাতের পর তাঁর

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৪
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৩

মস্তক মোবারক নিয়ে যেতে চাইল ফুজায়েল নামক এক কাফের। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের কুদরতে সে তাতে সক্ষম হলো না। ক্ষণিকের মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো এবং মুষলধারে বৃষ্টি হলো। প্রবল পানির সঙ্গে তার মস্তক মোবারকও প্রবাহিত হয়ে গায়েব হয়ে গেল, কেননা হযরত আসেম (রাঃ) আল্লাহ্র নামে শপথ করেছিলেন, আমি কোন মুশরেককে স্পর্শ করবো না এবং আমাকেও কোন মুশরেক স্পর্শ করবে না। আল্লাহ্ পাক তাঁর এ শপথকে পূর্ণ করে দিলেন। জীবিত তিনজন সাহাবীকে কাফেররা বন্দী করলো এবং মক্কাবাসীর নিকট তাদেরকে বিক্রির জন্যে রওয়ানা হলো। জহরান নামক স্থানে পৌছার পর হযরত আবদুল্লাহ এবনে তারেক.(রাঃ) তাঁর হাতের বন্ধনকে ছিড়ে ফেললেন এবং হাতে তলোয়ার নিয়ে নিলেন। অবস্থা বেগতিক দেখে কাফেররা তাঁর প্রতি প্রস্তর নিক্ষেপ করে তাঁকে শহীদ করলো এবং জহরানেই তিনি সমাধিস্থ হলেন। হযরত খোবায়েব (রাঃ) এবং হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে তারা মক্কা শরীফ এনে বিক্রয় করে দিলো। হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে সাফওয়ান এবনে উমাইয়াহ ক্রয় করলো। এই সাফওয়ান তাকে ক্রয়ের পর স্বীয় গোলামের হাতে অর্পণ করলো যেন তাকে 'তানয়ীম' নামক স্থানে হত্যা করা হয়। কোরায়েশের একটি বিরাট দল সেখানে একত্রিত হলো। এদের মধ্যে আবু সুফিয়ানও ছিলো। আবু সুফিয়ান হযরত যায়েদকে (রাঃ) সম্বোধন করে বললো ঃ আমি তোমাকে আল্লাহ্র শপথ দিচ্ছি। তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তুমি কি পছন্দ করবে যে তোমার স্থলে এখানে হযরত মোহামদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকবেন (নাউজুবিল্লাহ) এবং তাঁকে হত্যা করা হবে আর তুমি শান্তিতে বাড়ী ফিরে যাবে। হযরত যায়েদ (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, আমি আল্লাহ্র শপথ করে বলছি, "আমি কোন অবস্থাতেই বরদাশত করব না যে আমার স্থলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থাকবেন আর তাঁর দেহ মোবারকে কোন কাটা বিদ্ধ হবে। আর আমি নিজের ঘরে বসে থাকবো"। একথা শ্রবণ করে আবু সুফিয়ান বললো ঃ "আমি জানিনা যে পৃথিবীতে একজন আরেকজন মানুষকে এতখানি ভালবাসে কিনা, যতখানি মোহাম্মদকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ভালবাসেন"। এরপর সাফওয়ানের গোলাম হযরত যায়েদকে (রাঃ) শহীদ করে ফেললো। এখন শুধু হযরত খোবায়েব (রাঃ) রয়ে গেলেন। তাঁকে হারেসের সন্তানরা ক্রয় করলো। কেননা, তিনি বদরের যুদ্ধের দিন হারেসকে হত্যা করেছিলেন, হযরত খোবায়েব (রাঃ) তাদের নিকট বন্দী রইলেন। ঘটনাক্রমে হযরত খোবায়েবের (রাঃ) নিকট তাদের একটি শিশু গিয়েছিল, তাঁর হাতে তখন একটি ক্ষুর ছিল, এ দৃশ্য দেখে শিশুর মাতা চিৎকার আরম্ভ করে দিলো। হযরত খোবায়েব (রাঃ) বলেন ঃ "তুমি কি ভয় কর যে আমি তাকে হত্যা করবো? তা কোন অবস্থাতেই হবে না, বিশ্বাসঘাতকতা আমাদের কাজ নয়"। সে স্ত্রীলোকটির বিবরণ হলো, "আমি এমন আশ্চর্যজনক বন্দী আর কোন দিন দেখিনি। আমি দেখেছি তার কাছে তাজা আঙ্গুর অথচ তখন মক্কা শরীফে আঙ্গুর ছিল না আল্লাহ্ পাক তাঁর জন্যে এমনি ব্যবস্থা করতেন"। অতঃপর কাফেররা তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছায় হারাম

শরীফের এলাকা থেকে বের করে নিয়ে আসলো। তারা তাঁকে শূলে চড়াতে চাইলে তিনি বললেন ঃ "আমাকে একটু সুযোগ দাও, আমি দু' রাকাআত নামায আদায় করবো"। তিনি দু' রাকাআত নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ "তোমরা এ ধারণা করবে যে মৃত্যুর ভয়ে আমি নামাযে দাড়িয়ে গেছি যদি এ অবস্থা না হতো তবে আমি আরো বেশী নামায আদায় করতাম"। এরপর তিনি মুনাজাত করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তুমি এ কাফেরদেরকে ধ্বংস কর। এরপর তিনি একটি কবিতার দুটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন ঃ

ولست ابالى حين اقتل مسلما

على اى شوق كان فى الله مصرعى

وذلك منى للاله وان يشاء

يبارك فى اوصال شلو ممزع

অর্থাৎ "যখন আমি মুসলমান অবস্থায় শাহাদাত বরণ করছি তখন কিভাবে শাহাদাত বরণ করছি তা বড় কথা নয়, বরং আল্লাহ্র রাহে শাহাদাত বরণ করছি এটিই বড় কথা"। এরপর কাফেররা তাঁকে শুলে চড়িয়ে শহীদ করলো। তাঁর শেষ কথা ছিল ঃ "হে আল্লাহ্! তোমার প্রিয়নবীকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার সালাম দিও"।

হযরত ওসামা এবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ আমরা শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন "এই মাত্র জিব্রাইল (আঃ) এসে আমাকে খোবায়েবের সালাম পৌঁছিয়েছে এবং ঘটনা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ যে খোবায়েবের লাশ নিয়ে আসবে তার জন্যে রয়েছে জান্নাত। সঙ্গে সঙ্গে হযরত যোবায়ের (রাঃ) ও হযরত মেকদাদ এবনে আসওয়াদ (রাঃ) এ উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, ৪০ দিন পর তারা শুল থেকে লাশ অবতারণ করলেন। তাঁর দেহ থেকে কস্তুরীর সুগন্ধ আসছিলো। দেহ ছিল সম্পূর্ণ অবিকৃত, তাজা। হযরত যোবায়ের (রাঃ) তাঁকে ঘোড়ার পিঠে রেখে যখন রওয়ানা হলেন তখন কাফেররা জানতে পেরে তাঁদের পিছু ধাওয়া করলো। যখন শত্রু একেবারে নিকটবর্তী হলো তখন হযরত যোবায়ের (রাঃ) তার লাশ ঘোড়ার পৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিলেন যা সঙ্গে সঙ্গে যমীন গ্রাস করলো। এজন্যে তাঁকে "বলিয়ুল আরদ" বলা হয়। কোন প্রকারে হযরত যোবায়ের এবং মেকদাদ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলেন। ঠিক এমন সময় জিব্রাঈল (আঃ)ও উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্র রসূল! এ দু'জনের প্রতি ফেরেশতারা গৌরব করে তখন আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪১২-১৫

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে আরো একটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ আয়াত নাজিল হয়েছে হযরত আলী (রাঃ) সম্পর্কে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা তৈয়্যেবায় হিজরত করেছিলেন তখন তাঁর বিছানায় শায়িত অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন হযরত আলী (রাঃ)-কে। অথচ সে মুহূর্তে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ী ঘেরাও করে রেখেছিল এবং তাঁর প্রাণ নাশের অপচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এমনি একটি বিপদজনক মুহূর্তে তাঁর চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকার ন্যায় অপূর্ব সাহসিকতাপূর্ণ কাজ করেছিলেন হযরত আলী (রাঃ)। বর্ণিত আছে যে, সে মুহূর্তে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁর মাথার পাশে এবং মিকাঈল (আঃ) তাঁর পায়ের কাছে দণ্ডায়মান ছিলেন এবং হযরত আলীকে এই বলে মোবারকবাদ দিচ্ছিলেন যে, আবু তালেবের পুত্র আল্লাহ্ পাক ফেরেশতাদের নিকট তোমার ন্যায় বন্দাদের জন্যে গৌরব করেন।

দ্বীন ইসলামের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার শুভ পরিণতি

তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ যদিও আয়াতের শানে নুযুল নির্দিষ্ট কিন্তু এর মর্ম ব্যাপক। এ পৃথিবীতে যে কেউ দ্বীন ইসলামের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেবে, আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করবে, ধন-সম্পদ বা জীবনের বিনিময়ে ইসলামের পতাকাকে উড্ডীন করবে তার জন্যেও রয়েছে আয়াতে উল্লেখিত খোশখবরী। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে, যিনি আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছেন এবং দেহের তাজা রক্ত দিয়ে ইসলামের খেদমত করেছেন অথবা যাদের প্রতি কাফেররা জুলুম করেছে এবং তাদেরকে শহীদ করেছে যেমন মক্কার কোরায়েশরা হযরত আবু আম্মার এবং তাঁর মাতাকে শহীদ করেছিলো। এমনিভাবে যাঁরা মক্কা শরীফ থেকে হিজরত করে মদীনা তৈয়্যেবায় চলে গিয়েছিলেন এবং যাঁরা নিজেদের যথাসর্বস্ব কাফেরদেরকে দিয়ে হিজরত করেছেন যেমন হযরত সোহায়েব (রাঃ) করেছিলেন। সকলেই আলোচ্য আয়াতে প্রদত্ত খোশখবরীর উপযুক্ত।

বর্ণিত আছে, হযরত ওমর (রাঃ) একবার সাহাবায়ে কেরামের একটি দলকে জেহাদের জন্যে প্রেরণ করলেন, তাঁরা দুশমনের দুর্গ ঘেরাও করলেন। একজন একা অগ্রসর হলেন এবং দুশমনদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের সঙ্গে লড়াই করলেন, অবশেষে শহীদ হলে তাঁর সম্পর্ক কেউ এ মন্তব্য করলো– "এ ব্যক্তি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে"। হযরত ওমর (রাঃ) এ মন্তব্য শ্রবণ করে বললেন ঃ "তোমরা মিথ্যা বলেছো, আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি রহমত করুন তিনি নিজেকে আল্লাহ্র রাহে বিলীন করে দিয়েছেন"। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।

ত্যাগ-তিতিক্ষা হতে হবে শরীয়ত মোতাবেক

এ পর্যায়ে একথা মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্যে যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেয়া হয় তা যেন শরীয়ত মোতাবেক হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে পন্থা অবৈধ তা গ্রহণ করা হলে আল্লাহ্ পাকের দরবারে তা কবুল হয় না। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্ রাহে জেহাদ করেছেন, নিজেকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে বিলীন করে দিয়েছিলেন। এতে তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ এবং আল্লাহ্ র গজব থেকে নাজাত পাওয়া। এই মহান উদ্দেশে যে বা যারা যে কোন যুগে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেবে আল্লাহ্ পাক তাঁকে আলোচ্য আয়াতে ঘোষিত উচ্চ মর্তবা দান করবেন।[১]

وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ

"এবং আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম দান

বস্তুত ঃ আল্লাহ্ পাকের দান আমাদের প্রতি অনন্ত অসীম। তাঁর একটি দান হলো আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের সামান্য কয়েক দিনের আমলের বিনিময়ে তিনি চিরস্থায়ী নেয়ামত জান্নাত দান করবেন। আল্লাহ্ পাকের আরেকটি নেয়ামত হলো তিনি মানুষকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কষ্ট দেন না। আল্লাহ্ পাকের আরো একটি নেয়ামত হলো কোন ব্যক্তি যদি একশত বছর জীবন অতিবাহিত করে পরে তওবা করে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি আন্তরিক ভাবে ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করে তখন আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দেন। তার সকল শাস্তি রহিত হয়ে যায়। আল্লাহ্ পাকের আরেকটি নেয়ামত হলো আমাদের জীবন ও জীবনের যথা সর্বস্ব একমাত্র আল্লাহ পাকেরই দান। এ জীবনের কিছু অংশ অথবা ধন-সম্পদের কিছু যদি আমরা আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করি তার জন্যেও তিনি আমাদেরকে সওয়াব দান করেন। এটি বন্দার প্রতি আল্লাহ্ পাকের দয়া, মায়া, রহমত এবং এহসান ব্যতীত আর কিছুই নয়।[২]

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

অর্থাৎ ঃ "হে মোমেনগণ! তোমরা প্রবেশ কর ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে যারা প্রাণ উৎসর্গ করে এমন পূণ্যাত্মা ত্যাগী ব্যক্তিদের কথা রয়েছে। এ আয়াতে এমন লোকদের সম্পর্কে

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৪–০৫
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৫-২০৬
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৭

আলোচনা রয়েছে যারা ইসলাম কবুল করার পরও ভুলবশতঃ অন্যান্য ধর্মের কিছু কিছু বিধান মেনে চলতো।

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) সহ অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন যে, এ আয়াত নাজিল হয়েছে আবদুল্লাহ এবনে সালাম, আসাদ এবনে ওবায়েদ সা'লাবা প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্পর্কে। তাঁরা ইসলাম গ্রহণের পরও ইহুদীদের ন্যায় শনিবারের পবিত্রতায় বিশ্বাস করতেন। আর উটের গোশ্ত ইহুদীদের জন্যে হারাম ছিল ইসলাম কবুল করার পরও উটের গোশ্তকে হারাম মনে করতেন। তাঁদের মতে ইসলামী শরীয়তে উটের গোশত ভক্ষণ করা অবশ্য কর্তব্য বা ফরজ নয়। অতএব, আমরা যদি শনিবারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি এবং উটের গোশ্ত হালাল মনে করে তা বর্জন করি, তাহলে উভয় দিকই রক্ষা পায় অর্থাৎ দ্বীন ইসলামও ঠিক রইল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর শরীয়তের প্রতিও শ্রদ্ধাবোধ রইল। রাত্রি বেলা তৌরাতও পাঠ করা সম্ভব হল তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

তাঁদের এ ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, অবাস্তব, অযৌক্তিক একথা ঘোষণা করে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ হে মোমেনগণ! তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করো, ইসলামের কোন আদেশ মানব আর কোন আদেশ মানব না এমন নীতি সর্বনাশা, এমন কথা অচল, অসুন্দর, অযৌক্তিক, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, তাঁর নিকট অবতীর্ণ হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন। বিশ্ব মানবের নামে আল্লাহ পাকের সর্বশেষ পয়গাম। অতএব বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা এ পর্যায়ে সর্বশেষ কথা, অন্য নবীদের নবুওয়্যতের পরিসমাপ্তি ঘটেছে তাঁর আবির্ভাবের মাধ্যমে কিন্তু তাঁর নবুওয়্যত চিরন্তন, কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষের পদচারণা হবে সকলের জন্যেই তিনি নবী। অতএব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার পর তাঁকে মেনে চলতে হবে মনে প্রাণে, আচার আচরণে এক কথায় সর্বতোভাবে তাঁর অনুসারী হতে হবে। যারা সম্পূর্ণ ভাবে তাঁকে মানবে না, অথবা কথা ও কাজে তাঁকে কষ্ট দেবে, তাঁর দুশমনদের সাথে আঁতাত করবে, যারা তাঁকে মানে না এমন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে আল্লাহ্ পাক এমন লোকদের সম্পর্কে কঠোর ও কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.....الاية (সূরা আহযাব)

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৭
তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৭

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ্ পাক দুনিয়া ও আখেরাতে তাদেরকে লা'নত দেন, আর তিনি তাদের জন্যে তৈরী করে রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি"।

বর্তমানে যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও বাতিল ফেরকা কাদিয়ানী এবং শিয়াদের সঙ্গে আঁতাত করে তাদের ভ্রান্ত মতবাদের প্রতি সমর্থন জানায়, তাদের সাথে কোন প্রকার সহযোগিতা করে বা তাদের সাথে ওঠা-বসা করে তাদের প্রতি নৈতিক সর্মথন জানায়, তাদের হাদীয়া তোহ্ফা গ্রহণ করে, তাদের দাওয়াত কবুল করে, তাদের তথাকথিত নামাযে শরীক হয়, তাদের ইমামতিতে নামায আদায় করে, এমন লোকদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী।

মূলতঃ এসব যে শুধু শয়তানী কাজ এবং নিন্দনীয় ও বর্জনীয় কাজ তার ইঙ্গিত রয়েছে আয়াতের পরবর্তী বাক্যে।

وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

আর তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করোনা, নিশ্চয় সে তোমাদের জন্যে সুস্পষ্ট শত্রু। এ শয়তানই সেদিন হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে এ প্ররোচনা দিয়েছে শনিবার দিনকে পবিত্র দিন বলে মনে করতে, উটের গোশ্তকে বর্জন করতে, রাত্রি কালে তৌরাত পাঠ করতে। যেমন এ যুগের কতিপয় আলেমকে এ ইবলিস শয়তানই প্ররোচনা দিয়েছে বাতিল ফেরকার বন্ধু হতে, তাদের আন্দোলনে শরীক হতে এবং তাদের মদদপুষ্ট হয়ে ইসলামের নামে কাজ করতে। পবিত্র কোরআনের এ আয়াত গাফলতের আবর্তে নিপতিত মানুষদের গোমরাহীর অন্ধকার দূর করার জন্যে যথেষ্ট।

বেদআতের দুর্গ বিনষ্ট করাই হলো এ আয়াতের উদ্দেশ্য

আল্লামা শিব্বির আহমদ ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতের উদ্দেশ্যে হলো বেদআতের দুর্গকে বিনষ্ট করা কেননা, বেদআত হলো কোন কাজকে আপন মনে উত্তম ভেবে ধর্মের অঙ্গ স্বরূপ গ্রহণ করা। এমন কাজকে পূণ্যের কাজ বা ধর্মীয় কাজ মনে করে তার প্রচলন করা।[১]

মূলত ঃ শয়তান মানুষের সর্বনাশ করার জন্যে সর্বদা ওঁৎ পেতে থাকে, তাই যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসারী, তাদেরকে তাঁর দুশমনদের অনুসরণে বাধ্য করে আর প্রকাশ্যে দ্বীন ইসলামের আন্দোলনের নামেই তা করে।

পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম প্রবেশ কর

আল্লামা ওসমানী (রঃ) লিখেছেন ঃ পরিপূর্ণ ভাবে ঈমান অর্জন এবং বেদআতকে বর্জনের নির্দেশই রয়েছে এ আয়াতে। তাই এরশাদে হয়েছে ঃ "হে মোমেনগণ!

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী পৃষ্ঠা ৪১

তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর"। এর একটি ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, তোমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তোমার মন-মস্তিষ্ক এক কথায় সবকিছু ইসলামের অনুগত হতে হবে। শুধু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ইসলামের বিধানের প্রতি আমল করা হলো অথচ আকীদা ও বিশ্বাসে ইসলামের ব্যাপারে ইসলাম বিরোধী মনোভাব বজায় থাকলে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করা হলোনা। অনুরূপ ভাবে আকীদা ও বিশ্বাসে সঠিক তথা মন-মস্তিষ্কে ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সে বিশ্বাসের প্রতি কোন সমর্থন পাওয়া যায় না; বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেই বিশ্বাসের বিরোধী কাজই করে, এ ক্ষেত্রেও পবিত্র কোরআনের এ আয়াতে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী।

এর আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ কর অর্থাৎ জীবনের প্রতি ক্ষেত্র, প্রতি স্তরে ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলো, ব্যক্তিগত. সামাজিক ও জাতীয় জীবন তথা রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল পর্যায়ে ইসলামের বিধান পরিপূর্ণ ভাবে মেনে চলো। মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামের বিধান নেই অতএব, পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করার তাৎপর্য হচ্ছে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শের সঠিক ও পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন।

বেদআতের প্রতি ভর্ৎসনা

হাকীমুল উম্মত হযরত মওলানা থানভী (রঃ) তাঁর তফসীরে বয়ানুল কোরআনে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, এতে বেদআতের প্রতি ভর্ৎসনা ও তিরষ্কার করা হয়েছে। বেদআত হলো যা ধর্মীয় অনুশাসন নয় তাকে ধমীয় অনুশাসন মনে করা। ধর্মীয় বিধান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাঁর নবীর মাধ্যমে এসেছে। যারা অধর্মকে ধর্ম বলে মনে করে তারা আল্লাহ্র প্রতি মিথ্যা আরোপ করে এবং তারা যেন নবুওয়্যতেরও দাবী করে তাই এর চেয়ে ভয়াবহ কাজ আর কি হতে পারে? তিনি আরও বলেছেন, বেদআতের ভয়ানক দিক হলো, এ গুনাহ থেকে তওবা করার সৌভাগ্য খুব কমই হয়, কেননা যে এমন অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় সেতো নিজের ধারণায় সৎ কাজই করে, তার তওবার কি প্রয়োজন, তবে যদি আল্লাহ্ পাক তওফিক দান করেন শুধু এ অবস্থায় তওবা নসীব হয়। অতএব, শুধু ইসলামের বিধানকে পরিপূর্ণভাবে পালন করাই হলো কল্যাণকামী মানুষের একান্ত কর্তব্য। ইহুদীদের অনুসরণ অথবা কাদিয়ানী বা শিয়াদের প্রতি সমর্থন বা জীবনের কোনদিককে ইসলামের আওতা থেকে মুক্ত বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ সবই সুন্নতে রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বরকত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়।

ইসলাম শুধু এবাদত বন্দেগীতে সীমিত নয়

হযরত মুফতী শফী সাহেব (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে মাআরেফুল কোরআনে লিখেছেন ঃ যারা ইসলামকে শুধু মসজিদে এবাদত বন্দেগীর মধ্যেই সীমিত মনে করে জীবনের অন্যান্য দিককে ইসলামী সংবিধানের আওতাভুক্ত মনে করে না তাদের জন্যে রয়েছে এ আয়াতে বিশেষ সতর্কবাণী, কেননা এরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইসলামের যে বিধান রয়েছে তাতে বিশ্বাস করে না।

মূর্খতা ও আধুনিকতার ব্যাপারে সতর্কবাণী

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাঁর তফসীরে এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ এ আয়াতে সতর্কবাণী রয়েছে একদিকে সেসব লোকদের জন্যে যারা মূর্খ সূফী বেদআতী কাজে লিপ্ত, আর অন্যদিকে যারা নিজেদের আধুনিক মনে করে এবং আকীদা বিশ্বাসে, কথায় ও কাজে ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবন বিধান রূপে মেনে নেয় না কেননা, শয়তান তাদেরকে ইসলাম-বিরোধী কাজে মুগ্ধ করে রাখে।[১]

একবার হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তৌরাতের কয়েকটি পুরাতন পৃষ্টা নিয়ে হাযির হলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এরশাদ করলেন ঃ

لوكان موسى حيا ما وسعه الا اتباعى

অর্থাৎ যদি মূসা আজ জীবিত থাকতেন তবে আমার অনুসরণ ব্যতীত তাঁর গত্যন্তর থাকত না।[২]

অতএব, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের পর অন্য কারো অনুসরণ করার প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর প্রদত্ত বিধানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের পর অন্য কোন মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া নিতান্ত অন্যায় ব্যতীত আর কিছুই নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামরে প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি রাখার পর তাঁর দুশমনদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা অমার্জনীয় অপরাধ ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর পরিণাম কতো ভয়াবহ তা বর্ণনাতীত।

এ আয়াত সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ)-এর ব্যাখ্যা

বিখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অন্যান্য তফসীরকারদের ন্যায় তিনিও বলেছেন–

(১) এ আয়াত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। এতদ্ব্যতীত তিনি এর আরও ব্যাখ্যা করেছেন ঃ

(২) আয়াতে মুনাফেকদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, হে সেসব লোক, তোমরা যারা আল্লাহ্‌র প্রতি মৌখিক ঈমান এনেছ, তোমরা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের অনুগামী হয়োনা। ইমাম রাজী (রঃ) একথাই বলেছেন এভাবে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بَالْسِنَتِهِمْ اُدْخُلُوْا بِكُلِّيَتِكُمْ فِىْ الْاِسْلَامِ وَلَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ

(১) তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৮২
(২) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪২

অর্থাৎ তোমরা যারা মৌখিক ইসলাম কবুল করেছ, পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর, আর শয়তানের অনুগামী হয়োনা।

(৩) আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে আহলে কেতাবকে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস করেনি। এমনি অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এভাবে। ইমাম রাজীর (রঃ) ভাষায় ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَىْ بِالْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمِ اُدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً اَىْ اَكْمِلُوْا اِطَاعَتُكُمْ فِى الْاِيْمَانِ

অর্থাৎঃ 'হে সে সব লোক, তোমরা যারা পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহের প্রতি বিশ্বাস করেছ, তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর, ঈমানের ব্যাপারে তোমাদের আনুগত্যকে পরিপূর্ণ কর। তথা সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং তাঁর প্রতি অবতীর্ণ সর্বশেষ গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন কর, আর শয়তানের অনুগামী হয়োনা।

(৪) এ আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলমানদেরকে। এমনি অবস্থায় আয়াতের ব্যাখ্যা হবে, 'হে মোমেনগণ! তোমরা সর্বদা ইসলামের উপর কায়েম থাক, কোন অবস্থাতেই ইসলামের সোনালী সূত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়োনা, ইসলামের কোন বিধানকে অমান্য করোনা এবং তোমরা শয়তানের অনুগামী হয়োনা। যারা পথভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত তারা ইসলাম সম্পর্কে যেসব অবান্তর প্রশ্ন উত্থাপন করে তোমরা সেদিকে কর্ণপাতও করোনা, প্রকৃত, পরিপূর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ মোমেন হও।

(৫) ইতোপূর্বে প্রত্যেকটি ব্যাখ্যায় 'সেলমুন' শব্দটির অর্থ ইসলাম করা হয়েছে। এ শব্দটির অন্য একটি অর্থ রয়েছে তা হলো মীমাংসা করা, লড়াই-ঝগড়া, যুদ্ধ পরিত্যাগ করা, সহযোগিতা করা। এ প্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ হবে, হে মোমেনগণ! তোমরা দ্বীন ইসলামের সাহায্যে পরস্পর সহযোগিতা কর, ঐক্যবদ্ধ হও, পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্ব করোনা। ইমাম রাজীর (রঃ) ভাষায় ঃ

اى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين

যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ

অর্থাৎ হে মোমেনগণ! তোমরা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়োনা, এভাবে তোমাদের প্রভাব বিনষ্ট হবে।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্‌র রজ্জুকে একত্রিত হয়ে দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা।

ইমাম রাজী (রঃ) বলেন, এতদ্ব্যতীত এ আয়াতের আরও ব্যাখ্যা আছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

বলে আল্লাহ্ পাক ইঙ্গিত করেছেন আন্তরিক বিশ্বাসের প্রতি অর্থাৎ তোমরা যারা আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিক ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছ তোমরা আল্লাহ্‌র নাফরমানীর কাজ তথা যাবতীয় পাপাচার পরিহার কর। আর এভাবে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ কর তথা সম্পূর্ণ এবং পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হও।[১]

আল্লামা আলুসীর ব্যাখ্যা

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের মমার্থ হচ্ছে, হে মোমেনগণ!

(১) তোমরা ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর, গোপন ও প্রকাশ্যে ইসলামের কোন হুকুমের প্রতি অবহেলা করোনা।

(২) হে মোমেনগণ! তোমরা ইসলামী শরীয়তের প্রতি পূর্ণ অনুগত হও, এর মধ্যে পরস্পর বিভেদ বা দলাদলি সৃষ্টি করনা।

(৩) হে মোমেনগণ! তোমরা যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ কর তাঁর কোন বিধি-নিষেধ বা সুন্নতের অনুসরণ থেকে বঞ্চিত হয়োনা। এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো মুসলমানদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা অর্থাৎ হে মুসলমানগণ! তোমরা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করেছ তার প্রতি অটল অবিচল থাক।[২]

فَاِنْ زَلَلْتُمْ

অর্থাৎ তোমাদের নিকট প্রকাশ্য নির্দেশ আসার পরও যদি তোমরা পথভ্রষ্ট হও তবে জেনে রেখো আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে শরীয়ত বা জীবন-বিধান নিয়ে এসেছেন তা যেমন সম্পূর্ণ, তেমনি যুক্তিপূর্ণ, সুস্পষ্ট, বাস্তবের পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কেউ যদি তা অমান্য করে, এমনকি ঈমান আনার পরও অন্য মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে তার পরিণামে শোচনীয় শাস্তি হবে অবধারিত কেননা, আল্লাহ্ পাক সর্ব শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী। তাঁর শাস্তি থেকে রেহাই

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২০৬–০৮
(২) তফসীরে রুহুল মাআনী, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৯৭

পাওয়ার সাধ্য কারো নেই। তবে তিনি মহাজ্ঞানী। কখন কাকে কিভাবে শাস্তি দেবেন তা তিনিই জানেন। তাই কারও শাস্তি প্রদানে তিনি তাড়াহুড়ো করেন না। কারও প্রতি অবিচারও করেন না।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ- الايه

সত্য সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হবার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে না তাদের সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে এরশাদ হয়েছে, তারা কি কেয়ামতের দিনের অপেক্ষা করছে যেদিন আল্লাহ্ পাক মেঘের ছত্রচ্ছায়ায় আগমন করবেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও। যেদিন সবকিছুর মীমাংসা হয়ে যাবে, যেদিন জ মীন-আসমান সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, যেদিন ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে দণ্ডায়মান থাকবেন, দোযখকে হাযির করা হবে তারা কি সেদিনের অপেক্ষা করেছে? বস্তুত ঃ সেদিন কোন নেক আমলের সুযোগ থাকবেনা। প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি, কোরআনের প্রতি বিশ্বাসই করে না অথচ অবস্থা এই যে, সকলকে তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং সবকিছুর পরিণাম যে শুধু তাঁরই নিকট রয়েছে অতএব, সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণামের কথা মনে করে প্রত্যেকেরই সতর্ক হওয়া উচিত।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম এবনে জরীর (রঃ) একখানি সুদীর্ঘ হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এই হাদীসের বর্ণনাকারী হলেন হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)। এতে রয়েছে– কেয়ামতের দিন যখন মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত এবং অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে তখন তারা আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকল নবীর কাছে যাবে– যেন আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁরা সুপারিশ করেন। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ অপারগতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে তারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে সুপারিশের জন্যে আরজী পেশ করবে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করবেন ঃ

انا لها انا لها

অর্থাৎ ঃ এ কাজটি আমার, আমি এর জন্যে প্রস্তুত। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ পাকের আরশের নীচে সেজদারত হবেন এবং উম্মতের জন্যে সুপারিশ করতে থাকবেন, আর আল্লাহ্ পাক তাঁর সুপারিশ কবুল করবেন। এরপর মেঘমালার চাঁদোয়ায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের আবির্ভাব ঘটবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, এ অবাধ্য কাফেররা কি কেয়ামতের সেই কঠিন দিনের অপেক্ষা করছে? সেদিনতো সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে অর্থাৎ মোমেনগণ তাদের নেক আমলের সওয়াব পাবে এবং কাফেরদের আযাব অবশ্যম্ভাবী হবে।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৫

উল্লেখ্য, তফসীরকারগণ এ ব্যাপারে নীরবতা পালনের পরামর্শ দিয়েছেন যে, আল্লাহ্ পাকের আবির্ভাব কিভাবে হবে? মূলত ঃ বিষয়টি মানুষের জন্যে কল্পনাতীত, তখন তাঁর যা মর্জি হবে তাই হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), সুফিয়ান এবনে উআইনা (রহঃ), ইমাম জুহুরী (রহঃ), আওজায়ী (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), আবদুল্লাহ এবনে মোবারক (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ) প্রমুখ বিশ্বররেণ্য ওলামায়ে কেরাম যে সব আয়াতে আল্লাহ্ পাকের কোন সিফাত বা গুণের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে বলেছেন, এ আয়াত সমূহ পাঠ করতে থাক এবং এর সঠিক বাস্তবায়ন সম্পর্কে নীরবতা পালন কর। আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলই এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

سَلْ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَٰهُم مِّنْ ع ٢٥
ءَايَةٍۭ بَيِّنَةٍ ۗ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ١٥
ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢١١﴾ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَ ع ٢٦
يَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۘ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا۟ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ ۗ
وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٢١٢﴾

তরজমা

(২১১) (হে রসূল!) আপনি বণী ইসরাঈলকে জিজ্ঞাসা করুন যে, আমি কত দলিল প্রমাণ এবং নিদর্শন সমূহ তাদেরকে প্রদান করেছি আর যে ব্যক্তির নিকট আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত আসার পর তাকে পরিবর্তন করে (আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে শাস্তি প্রদান করবেন) নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক কঠিন শাস্তিদাতা।

(২১২) কাফেরদের নিকট ইহকালের ক্ষণস্থায়ী জীবন অত্যন্ত সুন্দর ও সুসজ্জিত মনে হয়, আর যারা খোদাভীরু তারা কেয়ামতের দিন কাফেরদের উপর উচ্চাসনে আসীন হবে এবং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা অগণিত রিয্ক দান করে থাকেন।

তফসীরুল কোরআন

(হে রসূল!) আপনি বণী ইসরাঈলের (জ্ঞানী) লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আমি তাদেরকে তথা তাদের পূর্ব-পুরুষদের কত উজ্জ্বল নিদর্শন সমূহ দান করেছি যেন তারা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করে আমার পরিচয় লাভ করে, আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে, আমার প্রদত্ত জীবন বিধান মেনে চলে কিন্তু তারা সঠিক পথ গ্রহণের পরিবর্তে

পথভ্রষ্ট হলো, আমার আদেশ সমূহ অমান্য করলো, আমার অবাধ্য হলো, আমার অনন্ত অসীম নেয়ামত উপভোগ করেও অকৃতজ্ঞ হলো। তাদের এ অকৃতজ্ঞতার ভয়াবহ পরিণাম তাদেরকে ভোগ করতে হলো, তারা কোপ-গ্রস্ত হলো। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে বণী ইসরাঈল শব্দ দ্বারা বিশেষভাবে মদীনা শরীফের ইহুদী সম্প্রদায়কে সম্বোধন করা হয়েছে এবং তৌরাতে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যে পরিচয় রয়েছে, সে সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা অব্যাহত রেখেছে। তাই এ আয়াতে তাদের প্রতি রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। ইতোপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে যে নিদর্শন সমূহ এসেছে তাসত্ত্বেও তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর গজবে পতিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ একথার উল্লেখ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগের ইহুদীদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।[১]

বণী ইসরাঈল জাতিকে প্রদত্ত জ্বলন্ত নিদর্শন সমূহ

তফসীরকারগণ এ আয়াতের তফসীরে বণী ইসরাঈলকে ইতোপূর্বে যে সমস্ত জ্বলন্ত নিদর্শন প্রদান করা হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। যেমন তাদেরকে আল্লাহ্ পাক তৌরাত দান করেছিলেন– তাদের একান্ত কর্তব্য ছিল তৌরাতকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করা কিন্তু তারা তা করেনি। অবশেষে তূর পাহাড় তাদের উপর তুলে ধরা হয় এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতঃপর সাময়িকভাবে তারা অনুগত হলেও পরে অবাধ্য হয়। এমনিভাবে তাদেরকে আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী শ্রবণের সুযোগ দেয়া হয়, তাদের কর্তব্য ছিল তা বিনা দ্বিধায় বরণ করে নেয়া কিন্তু তারা তাতেও সন্দেহ পোষণ করতে বিলম্ব করেনি। পরিণামে বিদ্যুতের মাধ্যমে ধ্বংস নেমে আসে তাদের জন্যে। এমনিভাবে তারা মিসরে জালেম ফেরআউনের দ্বারা যুগ-যুগ ধরে অত্যাচারিত উৎপীড়িত হয়, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে হত্যা করতো, তাদেরকে বেগার খাটাতে বাধ্য করতো, এমনি অবস্থায় আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ফেরআউনের জুলুম থেকে রক্ষা করেন। সমুদ্রের মধ্যে করে দিয়ে তাদের জন্যে নাজাতের পথ তৈরী করে দেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা স্বরূপ আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হয়ে তারা সমুদ্র পার হয়ে গেল। এর পাশাপাশি জালেম ফেরআউন ও তার সকল সঙ্গী নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হলো। আল্লাহ্র গজবের এ দৃশ্য তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করলো। আল্লাহ্ পাকের এত বড় নেয়ামত তারা লাভ করলো। উচিত ছিল এজন্যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে চির কৃতজ্ঞ থাকা কিন্তু তারা সমুদ্র পার হয়ে সর্ব প্রথম যে অপরাধ করলো তা হচ্ছে স্বহস্তে গো-বৎসের পূজা। শেরক ও কুফরের এ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২০

জঘন্যতম অপরাধের জন্যে তাদেরকে গণ হত্যার শাস্তি দেয়া হয়। এরপরও আল্লাহ্ পাক তাদের পক্ষে হযরত মূসা (আঃ)-এর দোয়া কবুল করে বেহেশতী খাদ্য 'মান্না' ও 'সালওয়া' তাদের জন্যে নাযিল করেন। কিন্তু তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্থলে উপহাস ও বিদ্রুপ করলো। পরিণামে 'মান্না' ও 'সালওয়া'র অবতরণ বন্ধ হলো। তারা বেহেশতী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হলো। এমনিভাবে বণী ইসরাঈল জাতিকে হেদায়েত করার উদ্দেশে আল্লাহ্ পাক দু' হাজার বছরে তাদের মধ্যে চার হাজার নবী প্রেরণ করলেন। কিন্তু নবীগণের আগমনের এ নেয়ামতকে তারা প্রত্যাখ্যান করলো। শুধু যে তারা নবীগণের বিরোধিতা করলো তাই নয়, বরং কয়েকজন নবীকে তারা হত্যাও করলো। তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَنْ يُّبَدِّلْ نِعْمَةَ اللهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ- الايه

চির শাশ্বত নীতি

(অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের বাস্তব ও চির শাশ্বত নীতি হলো, যে বা যারা আল্লাহ্ পাকের এত বড় নেয়ামতকে অস্বীকার করে তথা হেদায়েত গ্রহণের বদলে পথ-ভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হয় তবে আল্লাহ্ পাক অবশ্যই এমন পাপীষ্ঠ লোকদেরকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন এমনি সতর্কবাণী মক্কার পৌত্তলিকদের সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا- الاية

"(হে রসূল!) আপনি কি দেখেননি তাদেরকে যারা আল্লাহ্র নেয়ামতকে কুফর দ্বারা পরিবর্তন করেছে এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের কেন্দ্র দোযখে পৌঁছে দিয়েছে"।

প্রখ্যাত তফসীরকার ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেনঃ এ আয়াতের সম্পর্ক পূর্ববর্তী আয়াতের সঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক পরিপূর্ণ ভাবে ইসলাম কবুল করার আদেশ দিয়েছেন এবং আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এর পরবর্তী আয়াতে এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ الْبَيِّنٰتُ

তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরও যদি তোমরা আল্লাহ্র নাফরমানী থেকে বিরত না হও তবে মনে রেখো নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী,

তিনি সর্ব-শক্তিমান। তিনি যে কোন সময় যে কোন ব্যক্তি, সমাজ, জাতিকে শাস্তি দিতে পারেন। কারো শাস্তি বিধান করতে তাঁকে কেউ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু নাফরমানী করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সকলকে শাস্তি দেন না কেননা, তিনি হাকীম বা মহা বিজ্ঞানময়। তাঁর প্রতিটি কাজ হেকমত পূর্ণ। এর পরবর্তী আয়াতে কাফের, মুশরেক, বে-দ্বীন, মুনাফেকদের উদ্দেশে দ্বিতীয়বার সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيَهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ- الاية

অর্থাৎ তওহীদের চিরন্তন সত্যকে গ্রহণ করার এবং প্রিয়নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাল্লামের মহান আদর্শকে বরণ করে নেয়ার পক্ষে এত সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ উপস্থাপনের পরও তারা হেদায়েতের পথে ফিরে আসছে না। তবে কি তারা এর অপেক্ষা করছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন মেঘের চাঁদোয়ায় আবির্ভূত হবেন এবং সব বিয়ষ নিস্পত্তি করে দেবেন?

এমনি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়ার পরও যখন ইহুদীরা ইসলাম গ্রহণ করতে প্রস্তুত হলো না তখন আল্লাহ্ পাক তৃতীয় বারের মত কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করলেন আলোচ্য আয়াতে–

سَلْ بَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ

অর্থাৎ (হে রসূল!) আপনি ইহুদীদের জিজ্ঞাসা করুন তাদের পুরুষদের নিকট কত সুস্পষ্ট নির্দশন এসেছিল কিন্তু তারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে এবং আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভ করার পর অকৃতজ্ঞ হওয়ার কারণে তারা লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত হয়েছে। ঠিক এভাবে যদি এ ইহুদীরাও (হে রসূল) আপনার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন না করে এবং আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত লাভ করেও নেমক হারামী করে তবে তাদের জন্যে শাস্তি অবধারিত। এ শাস্তি চিরাচরিত নিয়ম মোতাবেকই হবে। অতএব, তাদের পূর্ববর্তীদের শোচনীয় পরিণাম দেখে এদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যেমন পবিত্র কোরআনে অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ

فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِى الْاَبْصَارِ

"উপদেশ গ্রহণ কর হে বুদ্ধিমানগণ"।
এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

لَقَدْ كَانَ فِىْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ

"নিশ্চয় তাদের ঘটনাবলীতে নছীহত রয়েছে বুদ্ধিজীবি মহলের জন্যে"।[১]

زُيِّنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا .....بِغَيْرِ حِسَابٍ

কাফেররা এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের মায়া-মোহে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা এবং আত্মহারা। আর এটিই তাদের সর্বহারা হওয়ার কারণ। দুনিয়ার লোভে-লাভে তারা এত ব্যস্ত এ ক্ষণ-ভঙ্গুর জীবনের প্রতি তারা এত আসক্ত ও পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে তারা শুধু অজ্ঞই নয়; বরং অন্ধও। দুনিয়ার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য লাভে তারা এত বিভোর হয়ে রয়েছে যে, আখেরাতের চির নিশ্চিত সুখ-দুঃখের কথা তারা চিন্তাও করে না, গাফলতের আবর্তে তারা নিপতিত, ভোগবাদের মরফিয়া পান করে তারা বেহুশ, নেশা-গ্রস্ত, প্রকৃত সত্য থেকে অনকে দূরে অবস্থানরত। ফলে জীবনের প্রকৃত মমার্থ উপলব্ধি করতে তারা হয়েছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এ ব্যর্থতা এবং মূর্খতা শুধু যে তাদের ভবিষ্যৎ চিন্তা থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, বরং যারা পরিণামদর্শী, কল্যাণকামী, বাস্তববাদী এবং সত্য-সন্ধানী এমন পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামকে উপহাস করতেও তারা দ্বিধা বোধ করতো না। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াতে যে-সব মোমেনদেরকে উপহাস করার কথা বলা হয়েছে তাঁরা হলেন– হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আম্মার (রাঃ), হযরত খোবায়েব (রাঃ), হযরত বেলাল (রাঃ) এবং হযরত সোহায়েব (রাঃ)। তাঁরা ছিলেন নিঃস্ব, হৃত-সর্বস্ব কিন্তু এতদসত্ত্বেও ইসলামের জন্যে নিবেদিত প্রাণ, সত্য-সাধক, আল্লাহর রসূলের আশেক, দুনিয়া ত্যাগে মহিমান্বিত। তাদের বাহ্যিক দুরবস্থা দেখে কাফেররা উপহাস করে বলতো এদের কি হয়েছে যে, এরা দুনিয়ার সুখ-সম্পদ বর্জন করেছে এবং কষ্টকে বরণ করে নিয়েছে।

মোকাতেল (রঃ) বর্ণনা করেন, এ আয়াত মুনাফেকদের দলপতি আবদুল্লাহ্ এবনে উবাই ও তার সঙ্গীদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা সর্বদা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকতো এবং দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মোহাজের মুসলমানদের প্রতি উপহাস করতো এবং বলতো মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখ তিনি এ নিঃস্ব লোকদেরকে নিয়ে নাকি সারা আরবের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবেন।

আতা (রঃ) বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াত ইহুদী সর্দারদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি উপহাস করতো।[২]

দূরাত্মা কাফের, মুশরেক, মুনাফেক এবং ইহুদীদের এসব আস্ফালনের প্রতি-উত্তরে আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে ঘোষণা করেছেন যে, এরা মুলতঃ গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। আজ যাদেরকে তারা উপহাস করছে কেয়ামতের কঠিন দিনে তারা থাকবে অতি উচ্চ মর্তবায় আসীন। আর উপহাসকারী কাফেররা সেদিন হবে

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২-৩
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২১

অবহেলিত, বিপদগ্রস্ত। ধ্বংস তাদের অনিবার্য। দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনে আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা অগণিত রিয্ক দিয়ে থাকেন কিন্তু অধিক পরিমাণে রিয্ক লাভের কারণে কারো অহংকারী হওয়া উচিত নয় কেননা, আল্লাহ্ পাক ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, ঐশ্বর্য ও তার প্রাচুর্য যখন যাকে ইচ্ছা দান করেন থাকেন। আজ যাকে দান করলেন দানের অযোগ্য বিবেচিত হলে কাল তাকে বঞ্চিতও করতে পারেন। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসের শিক্ষা।

ইতিহাস সাক্ষী! যে মুসলমানদেরকে কাফেররা উপহাস করতো আল্লাহ্ পাক অতি অল্প সময়ের মধ্যে এ উপহাসকারী বনু নযীর ও বনু কোরায়যা গোত্রের অগাধ ধন-সম্পদের মালিকানা তাঁদেরকেই দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বরং রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যও মাত্র এক যুগের মধ্যে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের করতলগত করে দিয়েছিলেন। মুসলমানগণ যখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমানের বলে বলীয়ান হয়েছিল, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তার বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিল তখন আল্লাহ্ পাক তদানীন্তন পৃথিবীর এক চতুর্থাংশকে মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন করে দিয়েছিলেন। এভাবে পবিত্র কোরআনের এ ঘোষণা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল।

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً
وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ
مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ
وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ
بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ
الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾
اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَاْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ ؕ مَسَّتْهُمُ الْبَاْسَآءُ وَالضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُوْا حَتّٰى يَقُوْلَ
الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ مَتٰى نَصْرُ اللّٰهِ ؕ اَلَآ اِنَّ نَصْرَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ ﴿۲۱۴﴾

তরজমা

(২১৩) সমগ্র মানব জাতি একই দলভুক্ত ছিল। তথা সকল মানুষ একই পথের পথিক ছিল। অতঃপর আল্লাহ্ পাক সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে নবীগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সাথে সত্য কিতাব নাজিল করেছেন যেন তারা সে বিষয়ে মীমাংসা করেন যে বিষয়ে লোকেরা মতবিরোধ করেছে এবং যাদেরকে উক্ত কিতাব প্রদান করা হয়েছে তাদের নিকট সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ আসার পর পরস্পর বিদ্বেষের দরুণই তারা মতবিরোধ করেছে। অতঃপর আল্লাহ্ পাক ঈমানদারদেরকে নিজের আদেশক্রমে সে সত্য বিষয়ে হেদায়েত করেন যাতে তারা কলহে লিপ্ত ছিল এবং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকেই সরল পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

(২১৪) তোমরা কি ধারণা করেছ যে, তোমরা বেহেশত প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের সাথে সে সব কিছু ঘটবে না যা ঘটেছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের সাথে, দারিদ্র পীড়া তাদেরকে আক্রমণ করেছিল এবং তাদেরকে প্রকম্পিত করা হয়েছিল, এমনকি রসূল ও তার সাথে মোমেনগণ বলে উঠেছিল, আল্লাহ্ পাকের সাহায্য কবে আসবে? নিশ্চয় আল্লাহ্ পাকের সাহায্য অতি নিকটবর্তী।

তফসীরুল কোরআন

মানব সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে বহু দিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ একই মত ও পথের অনুসারী ছিল। হযরত আদম (আঃ) যখন মা হাওয়া (আঃ) সহ এ মাটির পৃথিবীতে পদচারণা শুরু করেন তখন তিনি তাঁর সন্তানদেরকে সত্য ধর্মের শিক্ষা প্রদান করেন আর তারাও সে শিক্ষাকে গ্রহণ করতে থাকেন। প্রশ্ন হলো কতদিন এ অবস্থা অব্যাহত ছিল? বিখ্যাত তফসীরকার হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত আদম (আঃ) থেকে হযরত নূহ্ (আঃ) পর্যন্ত দুনিয়ার মানুষ একই পথের পথিক ছিল। যুগের আবর্তন-বিবর্তনে মানুষের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আসে। মানুষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।[১] আল্লামা এবনে জরীর (রহঃ) কথাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

كانوا بين ادم ونوح وهم عشرة قرون- كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا بعدذٰلك

অর্থাৎ আদম ও নূহ্ (আঃ)-এর মধ্যকার সময়ে সকলেই এক সত্য সঠিক ধর্মের অনুসারী ছিল। এবনে জরীরের এ বাক্যে দশ 'করণ' উল্লেখিত হয়েছে। 'করণ' সাধারণতঃ শতাব্দীকে বলা হয়। এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে হযরত আদম (আঃ) থেকে

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২২

নিয়ে নূহ্ (আঃ) পর্যন্ত এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়। ইমাম এবনে জরীর (রঃ) তাঁর এ বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ স্বরূপ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।[১]

হযরত নূহ্ (আঃ)-এর যমানায় তাঁর পিতা-মাতা ব্যতীত অপর কোন মুসলমান অবশিষ্ট ছিল না। প্রমাণ স্বরূপ হযরত নূহ্ (আঃ)-এর দোয়া উল্লেখ করা যেতে পারেঃ

رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ

অর্থাৎ "হে আল্লাহ্! আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর"।[২]

আলোচ্য আয়াতের মর্মকথা হচ্ছে, এমন এক সময় ছিল যখন সকল মানুষ একই আদর্শে বিশ্বাসী ছিল এবং একই পথের পথিক ছিল। প্রশ্ন হলো, কবে কখন এ অবস্থা ছিল? এ পর্যায়ে তফসীরকারদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা কোরআনে করীমের তফসীরের ব্যাপারে অত্যন্ত খ্যাতি লাভ করেছেন তন্মধ্যে হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এবং হযরত এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এ বিষয়টি নিতান্ত আত্মার জগতের সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন যখন সমস্ত মানুষের আত্মাকে সৃষ্টি করেছিলেন তখন কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি করা হবে সকলের আত্মাকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ঃ

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ

"আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই"? সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার প্রথম কথা। কে দেবে এর জবাব? সর্ব প্রথম যিনি সেদিন সমগ্র মানব জাতির নেতৃত্ব এবং প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন তিনি আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। অতঃপর তাঁকে অনুসরণ করে এক বাক্যে সকলেই জবাব দিয়েছিল ঃ بَلٰى অর্থাৎ "নিশ্চয় আপনি আমাদের প্রতিপালক"। বস্তুতঃ এ সময় সকলেই একই মত পোষণ করেছিল।[৩]

(২) ইমাম রাজী (রঃ) এ সম্পর্কে আরও বলেছেন, এ সময় হলো হযরত আদম (আঃ)-এর প্রেরণের পর থেকে আদম (আঃ)-এর পুত্র হাবিলকে হত্যা করা পর্যন্ত। ইতোপূর্বে সকলেই ছিল মুসলিম, আল্লাহ্র অনুগত এবং ঐক্যবদ্ধ, সর্বপ্রকার মতবিরোধ থেকে মুক্ত। এ অবস্থা অব্যাহত থাকে সেদিন পর্যন্ত যেদিন হাবিল অন্যায়ভাবে নিহত হয়।

---

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯৪
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২৩
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩।

(৩) এমন এক সময় ছিল যখন সকলেই একই মতের অনুসারী ছিল। এ সময়টি হলো তখন যখন হযরত নূহ্ (আঃ)-এর যুগে প্রলয়ংকরী বন্যার কারণে আল্লাহ্ র অবাধ্য সমস্ত লোক নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল শুধু যারা ঈমানদার ছিল এবং ঈমানের বরকতে তারা নূহ (আঃ)-এর তরীতে আরোহণ করলো, আল্লাহ্ পাক তাদেরকে এভাবে রক্ষা করলেন। তখন সকলেই ছিল আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসী, তওহীদপন্থী, এক আদর্শের অনুসারী।

(৪) এতদ্ব্যতীত এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

كل مولوديولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه-

অর্থাৎ "প্রতিটি নবজাতক স্বভাব ধর্ম (ইসলাম)-এর উপর জন্ম গ্রহণ করে। পরবর্তীতে তার পিতা মাতার কারণে হয় সে ইহুদী হয়, না খৃষ্টান অথবা অগ্নিপূজক হয়"।

এই হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, যদি মানুষকে তার স্বভাব ধর্মের উপর ছেড়ে দেয়া যায় তবে সকলেই এক ইসলাম ধর্মের অনুসারী হবে। কিন্তু যেহেতু পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে স্বভাব-ধর্মের উপর থাকার ব্যবস্থা থাকেনা তাই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়, মানুষ বাতিল মতবাদের অনুসারী হয়। এজন্যে আল্লাহ্ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামকে প্রেরণ করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ- الاية

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক নবীগণকে প্রেরণ করলেন, তাঁরা সত্য ধর্মের অনুসারীদেরকে সুসংবাদ দিলেন চির শান্তি লাভের"।

আর যারা আল্লাহ্র অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদেরকে সতর্ক করেন এবং সত্য ধর্মের সংরক্ষণের জন্যে আল্লাহ্ পাক তাদের নিকট আসমানী কিতাব প্রেরণ করলেন যেন তারা মানুষের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। অতঃপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ

অর্থাৎ "যাদেরকে কিতাব প্রদান করা হয়েছিল তারা নিতান্ত জেদের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ সম্পর্কে মতবিরোধ করলো"।

যেমন মুসলমানদের জন্যে জুমআর দিন হলো বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ দিন। অথচ ইহুদীরা শনিবারকে তাদের সাপ্তাহিক দিন হিসাবে পালন করে। পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা রবিবারকে তাদের সাপ্তাহিক দিন হিসাবে উদযাপন করে। এমনিভাবে কেবলার

ব্যাপারেও মতবিরোধ হয়েছ, আমাদের কেবলা কা'বা শরীফ, খৃষ্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাসের একাদক এবং ইহুদীরা বায়তুল মোকাদ্দাসের অন্য দিককে কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এভাবে রোজার ব্যাপারেও মতবিরোধ হয়েছে। আর এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ব্যাপারেও মতবিরোধ হয়েছে। ইহুদীরা বলেছে তিনি ইহুদী ছিলেন। খৃষ্টানরা দাবী করেছে তিনি ছিলেন খৃষ্টান অথচ তিনি ছিলেন প্রকৃত মুসলমান। এভাবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে সঠিক আকীদার তা'লিম দেয়া হয়েছে। ইহুদীরা হযরত ঈসা (আঃ)-কে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাঁর মাতা হযরত মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে মন্দ কথা বলেছে। পক্ষান্তরে, খৃষ্টানরা তাঁদের ব্যাপারে অত্যন্ত ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক, অন্যায় কথাবার্তা বলেছে।

মূলত ঃ মুসলিম জাতি এমনি বাড়াবাড়ি থেকে অনেক দূরে সরে আছে এবং সরল সঠিক পুণ্য পন্থাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রবী এবনে আনাস (রঃ) বর্ণনা করেন, যেভাবে মানব জাতি সৃষ্টির শুরুতে সকলেই এক আল্লাহ্‌র বন্দেগী করতো, সৎ কাজে মশগুল থাকতো এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতো। কিন্তু পরবর্তীতে পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেলে ভালোর স্থলে মন্দ এসে স্থান করল। এভাবে মানব ইতিহাসের অনেক দিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে সত্য উদ্ভাসিত হলো, অসত্য বিদায় নিল। সর্বশেষ নবীর উম্মত তথা সর্বশেষ উম্মত বিশ্ব-মানবকে সত্য ও ন্যায়ের প্রতি আহ্বান জানালো। কেয়ামতের দিন তারাই হবে সমগ্র বিশ্ব-মানবের জন্যে সাক্ষী যেমন কোরআনে করীমেও এরশাদ হয়েছে ঃ

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

"যেন তোমরা সমগ্র মানব মন্ডলীর জন্যে সাক্ষী হবে"।

وَاللّٰهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

"এবং আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে সরল সঠিক পূণ্য পন্থার দিকে হেদায়েত করেন"।

মূলত ঃ হেদায়েত হলো আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত। তিনি যাকে ইচ্ছা তাকেই নেয়ামত দান করে থাকেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতা, হযরত নূহ (আঃ)-এর পুত্র, হযরত লূত (আঃ)-এর স্ত্রী এবং প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হেদায়েতের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ দূর দুরান্ত থেকে অগণিত লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে তাঁদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করেছেন। এ আয়াতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা, কেননা তিনি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন, তাই আল্লাহ্ পাক তাঁকে সান্ত্বনা

দিয়েছেন, হেদায়েতের চাবি মূলত ঃ আল্লাহ্ পাকের হাতে। আল্লাহ পাক যাকে দান করেন, শুধু সে-ই হেদায়েত লাভ করতে পারে।

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ- الايه

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, যখন মুসলমানগণ আরবের বিভিন্ন এলাকা থেকে হিজরত করে মদীনা মোনাওয়্যারা পৌঁছেন তখন তাঁরা ছিলেন নিস্ব, হৃতসর্বস্ব কেননা, তাঁরা ইসলাম গ্রহণের কারণে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত অবস্থায় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেয়া হয়েছিল, তাঁদেরকে ভিটা-মাটি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল। তাঁরা জীবনের সকল সম্পদ ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানকে একমাত্র সম্বল হিসেবে গ্রহণ করে অত্যন্ত মজলুম অবস্থায় মদীনা শরীফে উপস্থিত হয়েছিলেন, মুসলমানদের সে দিনগুলো ছিল অত্যন্ত কঠিন, খাদ্য-দ্রব্য, বাসস্থান, পোষাক-পরিচ্ছেদ মানুষের এ তিনটি মৌলিক প্রয়োজনের প্রত্যেকটিরই অভাব ছিল। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

তোমরা কি ভেবে রেখেছ, চির শান্তির প্রাণকেন্দ্র জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের কোন কষ্ট হবে না? ইতোপূর্বে যারা ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছিল তারা যেভাবে অত্যাচারিত-উৎপীড়িত হয়েছিল তোমাদের তেমন কোন অত্যাচার-উৎপীড়ন সহ্য করতে হবে না? প্রকৃত অবস্থা এই যে, তোমাদের পূর্বে যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এনেছিল তারা চরম কষ্ট ভোগ করেছিল, অভাব-অনটন, রোগ-তাপ, জুলুম-অত্যাচার সবই তাদেরকে সইতে হয়েছিল। এমনকি তারা সে কষ্টের কারণে ব্যাকুল হয়ে বলেছিল– "আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে"?

মূলত ঃ এ জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকাকীর্ণ। বিশেষত ঃ যারা ঈমানদার ও পরহেযগার হয়ে জীবন যাপন করতে চায়, তাদের জন্যে এ পৃথিবী সত্যিই একটি পরীক্ষাগার।

কবি বলেছেন ঃ

بهر غفلت يه تيرى هستى نهيں
ديكه جنت اس قدر سستى نهيں
ره گزر دنيا هے يه بستى نهيں
يه جائے عيش وغشرت ومستى نهيں

"পৃথিবীতে তোমার অবস্থান গাফলতের জন্যে নয়, আর মনে রেখো বেহেশত এত সস্তাও নয়।

"এ দুনিয়া আসলে একটি রাজপথ, ক্ষণস্থায়ী এ দুনিয়া কারো আবাস নয়, আনন্দ- উল্লাসের জন্যেও নয়"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) বলেছেন ঃ এ আয়াতের অর্থ হলো কোন দুঃখ-কষ্ট বা পরীক্ষার সম্মুখীন না হয়ে বেহেশতের আশা করা ঠিক নয়। পূর্বেকার উম্মতদের পরীক্ষা নেয়া হয়েছে এবং তারাও অনেক বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন। بَأْسَاء শব্দের অর্থ হলো দারিদ্র্য এবং ضَرَّاء অর্থ রোগ। তাদের উপর দুশমনের ভয় এমনভাবে কার্যকর হয়েছিল যে তারা অসহায় হয়ে কাঁপতে শুরু করেছিলেন। এসব পরীক্ষাতেই তারা সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন বলেই জান্নাতের অধিকারী হতে পেরেছেন। সহীহ হাদীসে এমন ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত খাব্বাব বিন আরত্ (রাঃ) আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদের জন্যে দোয়া করেন না? হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "এতটুকুতেই ঘাবড়ে গেছো"? তবে শোন, তোমাদের পূর্বেকার তৌহীদের পতাকা-বাহীদেরকে পাকড়াও করে তাদের মাথার উপর করাত স্থাপন করা হতো এবং সেই করাত দিয়ে চিরে তাদেরকে দ্বিখণ্ডিত করা হতো। কিন্ত তবু তারা তৌহীদ এবং সুন্নতকে ছাড়তো না। লোহার চিরুনী দিয়ে তাদের দেহ থেকে মাংস কুরে নেয়া হতো কিন্তু তবু তারা আল্লাহ্ পাকের দ্বীন থেকে হঠতো না। আল্লাহর কসম করে বলছি- আল্লাহ্ পাক আমার এ দ্বীনকে এত পূর্ণতা দান করবেন যে, মানুষ ছানআ থেকে হাজরামাউত পর্যন্ত একা একা সফর করবে, তাদের অন্তরে এক আল্লাহ্র ভয় ব্যতীত কোন ভয় থাকবে না এবং কোন বিপদ থাকবে না। অবশ্য অন্তরে এ ধারণা থাকা অন্য ব্যাপার যে কোথাও আমার বকরীর পালে বাঘের আক্রমণ ঘটে। কিন্তু আফসোস যে তোমরা অতি শীঘ্র পেতে চাও"।

এ বিষয়টি পবিত্র পাকের অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

الٓمٓ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا- الاية

"লোকেরা কি এই ভেবে রেখেছে যে, শুধু (ঈমানের কথা স্বীকার করে নেয়ার উপরই) তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদের কি কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না? আমি পূর্বেকার লোকদেরও পরীক্ষা নিয়েছি। সত্য এবং মিথ্যাকে নিঃসন্দেহে পরস্পর থেকে পৃথক করে দেখানো হবে"।[১]

ইমাম কাতাদা (রঃ) এবং সাদী (রঃ)-এর মতে এ আয়াত খন্দকের যুদ্ধের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কেননা, এ যুদ্ধে মুসলমানগণ অত্যন্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।[২] ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ শুরু হয়। সমগ্র আরব থেকে বার হাজার লোক একত্রিত হয়ে প্রাণের মদীনা আক্রমণ করেছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তিন হাজার সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদীনার উপকণ্ঠে পরীখা খনন করলেন,

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৬৮
(২) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৬

মাটির বোঝা তিনি নিজেও মাথায় তুলে নিলেন। একদিকে রসদ বলতে কিছুই নেই, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় দুশমনের মোকাবেলা করেছেন স্বয়ং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! তাঁর পেট মুবারকের সাথে দুটি পাথর বেধে রেখেছিলেন এবং হামলায় উদ্যত কাফেরদের মোকাবেলা করেছেন। অবশেষে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরায়ে আহযাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে তৃতীয় হিজরীতে অনুষ্ঠিত ওহোদের যুদ্ধের সময় কেননা, তখনও মুসলিম জাতি বিরাট সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

যাহোক, এ আয়াত যে ঘটনায়ই নাযিল হোক না কেন এর মর্মবাণী সর্বকালের সকল মোমেনের জন্যে। আর তা হলো পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে চির শান্তি লাভের উদ্দেশে আল্লাহ পাকের রাহে কঠোর সাধনার রত হওয়া, ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেয়া, ধৈর্য ও সহনশীলতার গুণ অর্জন করা। আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশায় আশান্বিত হয়ে সৎ সাহসের সঙ্গে সকল বিপদাপদের মোকাবেলা করা কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات

অর্থাৎ "জান্নাত বিপদাপদ ও বালা মুসিবত দ্বারা পরিবেষ্টিত আর দোযখের চারিপার্শ্বে রয়েছে আনন্দ-উল্লাসের উপকরণ, গাফলতের আবর্তে নিপতিত হওয়ার ব্যবস্থা"।

অতএব, জান্নাতের প্রবেশ করতে হলে অবশ্যই বিপদাপদের মোকাবেলা করতে হবে।

এখানে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, কোন পাপীষ্ঠ দূরাচার তো আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দানে ধন্য হয়েই বেহেশতে গমন করবে। সে কোন প্রকার পরিশ্রম বা ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় না দিয়েই বেহেশতে প্রবেশাধিকার কি করে পাবে?

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাব দিয়েছেন ঃ আল্লাহ্ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান ব্যতীত কোন মানুষ বেহেশতে প্রবেশ করতে পারে না, এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের ঘোষণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ

অর্থাৎ "আল্লাহ তাঁর সাথে শেরক করাকে মাফ করেন না, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য গুনাহ তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করতেও পারেন"।

অতএব, যারা বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে তারা অবশ্যই ঈমানদার হবে। আর ঈমানের অধিকারী হওয়া বা ঈমানের হেফাজত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, বিনা ক্লেশে কেউই বেহেশতে প্রবেশাধিকার পাবে না। এ

পর্যায়ে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে যে যতবেশী সাধনা করবে আখেরাতে তার মর্তবা তত উচ্চতর হবে। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

অর্থাৎ "সর্বাধিক বালা মুসিবতে পতিত হয়েছেন আম্বিয়ায়ে কেরাম এরপর তাঁদের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ"।

আর যেহেতু সাহাবায়ে কেরাম উচ্চস্তরের বেহেশতের আকাঙ্ক্ষা করতেন তাই তাঁদেরকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একথাও বলেছেন ঃ "মুসলমান মাত্রেরই উচিত উচ্চতর বেহেশতের আশা করা"। বস্তুতঃ মানুষ কোন বিষয়ে আশা করলে তা অর্জনের জন্যে চেষ্টাও করে। তাই প্রত্যেক মুসলমান আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর উন্নতির জন্যে চেষ্টা করবে, এটিই স্বাভাবিক।

يَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ قُلْ مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ
فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۗ وَ
مَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ ﴿٢١٥﴾ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ
وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَ
عَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾ ع

তরজমা

(২১৫) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছে যে, তারা কি ব্যয় করবে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন তোমরা ধন-সম্পদ থেকে যা কিছু ব্যয় কর না কেন, তা তোমাদের পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম এবং পথিক মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করবে। আর তোমরা যে উত্তম কাজই কর না কেন আল্লাহ পাক তা খুব ভালভাবেই জানেন।

(২১৬) তোমাদের উপর জেহাদ ফরজ করা হলো অথচ তা তোমাদের অপছন্দনীয় এবং হয়তো তোমরা কোন বস্তুকে অপছন্দ করবে তা হবে তোমাদের জন্যে উত্তম। পক্ষান্তরে তোমরা কোন জিনিসকে ভালোবাস তা হবে তোমাদের জন্যে ক্ষতিকর এবং আল্লাহ্ পাক জানেন, তোমরা জান না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ এ আয়াতের শানে নুযুল হলো এই, বিখ্যাত সাহাবী আম্র এবনে জমুহ (রাঃ) যিনি ওহোদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছেন, তিনি একজন বয়োবৃদ্ধ এবং সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার অর্থ-সম্পদ থেকে আমি কি দান করবো? এবং কাকে দান করবো? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ অর্থ-সম্পদ দ্বারা সাহায্য করার প্রধানতম কর্তব্য হলো পিতা-মাতার খেদমত। অতঃপর আত্মীয়-স্বজন,এতীম-মিসকীন, পথিক-মুসাফির- পর্যায়ক্রমে এদের সকলকে সাহায্য করাই কর্তব্য।[১]

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি হাযির হয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার নিকট একটি দীনার আছে"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "তা তোমার নিজের জন্যে ব্যয় কর"। লোকটি বললো, "আমার নিকট দুটি দীনার আছে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তাহলে তা তোমার পরিবারবর্গের জন্যে ব্যয় কর"। লোকটি বললো, "আমার নিকট তিনটি দীনার আছে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তাহলে তুমি তোমার খাদেমের জন্যে ব্যয় কর"। লোকটি বললো, "আমার নিকট চারটি দীনার আছে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি তোমার পিতা-মাতার জন্যে ব্যয় কর"। লোকটি বললো, "আমার নিকট পাঁচটি দীনার আছে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তবে তোমার আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ব্যয় কর"। লোকটি বললো, "আমার নিকট ছয়টি দিনার আছে"। তিনি এরশাদ করলেন, "তাহলে তুমি আল্লাহ্র রাহে ব্যয় কর। আর তাই উত্তম"।[২]

এখানে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আল্লাহ্র রাহে কি ব্যয় করবে এবং পরিমাণে কত ব্যয় করবে? আল্লাহ্ পাক এ প্রশ্নের সংশোধন করেছেন এভাবে যে, কত পরিমাণ ব্যয় করবে তা তোমাদের ইচ্ছা এবং সৎ সাহসের ব্যাপার। তবে কাকে দান করা হবে তা এখানে বর্ণিত হয়েছে।[৩]

---

(১) তফসীরে হাক্কানী ২য় পারা, পৃষ্ঠা ৭৬
তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৩
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪২৬
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫
(৩) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৪৬

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, এ আয়াতে নফল ছদকার কথাই বলা হয়েছে কেননা, যাকাত এবং অন্যান্য ওয়াজিব ছদকা পিতা-মাতাকে দান করা বৈধ নয়।

আল্লামা আলুসী (রঃ) এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে কয়েকজন মোমেন এ প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমরা অর্থ-সম্পদ কোথায় ব্যয় করবো? তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

পিতা-মাতার হক্ব সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় কর না কেন এর প্রথম হক্বদার হলো তোমাদের পিতা-মাতা। এতে পিতা-মাতার হক্বের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেননা, মানুষের জীবনে পিতা-মাতার অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। পিতা-মাতার মাধ্যমেই আল্লাহ্ পাক মানুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। দ্বিতীয়তঃ মানুষ যখন অত্যন্ত অসহায়, নিরূপায় এবং নিতান্ত দুর্বল থাকে তখন পিতা-মাতাই মানুষের লালন-পালনের সেবা-যত্নের দায়িত্ব পালন করেন। এজ ন্যেই পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে পিতা-মাতার প্রতি এহসানের তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

"আর তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারও বন্দেগী করোনা এবং পিতা-মাতার প্রতি এহ্সান কর"।

মানুষের মধ্যে সর্ব প্রথম হক্ব

এ আয়াতে একথার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ পাকের হক্ব আদায়ের পর সর্ব প্রথম হক্ব হলো পিতা-মাতার। তাদের হক্ব সর্বাধিক ও সর্বশ্রেষ্ঠ। পিতা-মাতার পর হক্ব হলো আত্মীয়-স্বজনের। এর কারণ এই, দুনিয়ার সমস্ত ফকীর-মিসকীনকে সাহায্য করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই কিছু লোককে তো অবশ্যই প্রাধান্য দিতে হবে। আর আত্মীয়তার বন্ধন এ পর্যায়ে প্রাধান্যের একটি বিশেষ উপকরণ, কেননা আত্মীয়তার কারণে পরস্পর মেলা-মেশা অবশ্যই করতে হবে। আর এ মেলা-মেশার কারণেই একে অপরের সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হয়। এমন অবস্থায় আত্মীয়-স্বজ নকে সাহায্য করা জরুরী হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেউ যদি দারিদ্র-প্রপীড়িত থাকে এবং তাকে যদি সাহায্য না করা হয় তবে সে অবশ্যই অন্যের নিকট সাহায্য প্রার্থী হবে। আর তা হবে তার সকল আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অবমাননাকর। এমনিভাবে এরপর এতীম-মিসকীন, পথিক-মুসাফির তথা পর্যায়ক্রমে সমাজের সকল প্রকার দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণের তাগিদ করা হয়েছে। এরপর এরশাদ হয়েছে ঃ

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১০৫

وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ- الاية

অর্থাৎ "যা কিছু সৎ কাজ কর আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত" এবং তিনি যথা-সময়ে এই সৎ কাজের বিনিময় অবশ্যই দান করবেন"।

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন ঃ এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিয়ত সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল। অতএব, প্রত্যেকের নিয়ত অনুসারেই তাকে প্রতিদান দেয়া হবে।

মাসায়েলুল কোরআন

যাকাত সহ সকল অবশ্য কর্তব্য বা ওয়াজিব সদকা পিতা-মাতাকে দান করা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ নয়, এ আয়াতে নফল সদকার কথাই বলা হয়েছে।

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

"তোমাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলো অথচ তা তোমাদের নিকট কষ্টদায়ক মনে হয়"।

ইসলাম শান্তির ধর্ম। বিশ্ব-মানবের শান্তি ও কল্যাণ সাধনের এক নিখুঁত পরিকল্পনা পেশ করেছে ইসলাম। মানবতার উৎকর্ষ সাধনের, মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনের প্রত্যয় নিয়েই আবির্ভাব হয়েছে ইসলামের। কিন্তু যারা ইসলামের শত্রু, যারা মানবতার শত্রু তথা শান্তির শত্রু, তারা যখন মানবতা বিরোধী কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হয়, এমন অবস্থায় ইসলাম ও মুসলমানদের রক্ষা-কল্পে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের তাগিদে ইসলাম জেহাদ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যতদিন মক্কা মোয়াজ্জমায় ছিলেন ততদিন কাফেরদের দ্বারা চরমভাবে অত্যাচারিত উৎপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়নি। তিনি যখন মদীনা মুনাওয়্যারায় হিজরত করেন তখন শুধু সে জালেমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণের অনুমতি দেয়া হয়, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাধায়। অবশ্য পরবর্তীতে সাধারণ ভাবে মুশরেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ফরজ করা হয়। এ আয়াত সম্পর্কে মত বিরোধ রয়েছে। কারো কারো মতে, এ আয়াত দ্বারা সকলের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হয়েছে। সাঈদ এবনে মুছাইয়্যেব (রঃ) বলেন, কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি জেহাদ ফরজে আইন। দলিল স্বরূপ তিনি এ আয়াত পেশ করেছেন ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

আর মক্হুল (রঃ) কাবা শরীফ প্রাঙ্গনে দণ্ডায়মান হয়ে শপথ করে বলতেন, এ আয়াত দ্বারা প্রতিটি মুসলমানের উপর জেহাদ ফরজ হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) এবং আতা (রঃ) এ আয়াত দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের প্রতি জেহাদ ফরজ হয়েছে বলে ব্যাখ্যা করতেন অর্থাৎ এই আদেশটি সাহাবায়ে কেরামের বৈশিষ্ট্য বলে

বর্ণনা করতেন। এরপর জেহাদের ফরজিয়ত সকলের জন্যে নয় বলে তাঁরা মনে করতেন। ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে মন্তব্য করেছেন যে, এ আয়াতখানি ঠিক ঐ আয়াতের অনুরূপ যাতে রোজা ফরজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

অর্থাৎ "তোমাদের সকলের প্রতি রমজানের রোজা ফরজ করা হয়েছে"।

এমনিভাবে এরশাদ হয়েছে ঃ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ

"তোমাদের প্রতি কেসাস ফরজ করা হয়েছে"।[১]

আর অনুরূপভাবে এ আয়াতে জেহাদ ফরজের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কোরআনে করীমে জেহাদ সম্পর্কে বহু আয়াতে বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَضَّلَ اللهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً

অর্থাৎ "আল্লাহ্ পাক জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদকারীদেরকে ফজিলত দিয়েছেন জেহাদ বর্জনকারীদের উপর"।

আর এরশাদ হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ! তোমাদের কি হলো যে যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে তোমরা আল্লাহ্র রাহে জেহাদের উদ্দেশে বেরিয়ে পড় তখন তোমরা যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়"।

এতদ্ব্যতীত হাদীস শরীফেও জেহাদের বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।

জেহাদের ফজিলত

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ

"জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে"।

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৬

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম? তিনি এরশাদ করলেন ঃ

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِنَفْسِهٖ وَمَالِهٖ

"যে মোমেন তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করে দুশমনের মোকাবেলা করে, সত্য ও ন্যায়ের জন্যে অভিযানে অংশগ্রহণ করে"।

হযরত এবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, আমি আরজ করলাম, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! সবচেয়ে উত্তম আমল কোন্টি'? তিনি এরশাদ করলেন ঃ 'নামাযকে সঠিক সময়ে আদায় করা'। আমি আরজ করলাম, 'অতঃপর কোন্টি'? তিনি এরশাদ করলেনঃ 'পিতা-মাতার খেদমত করা'। আমি আরজ করলাম, 'এরপর কোন্ আমলটি'? তিনি এরশাদ করলেন ঃ 'আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করা'। –বোখারী শরীফ

হযরত এমরান এবনে হোসায়েন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ কোন ব্যক্তির (একটি দিন) জেহাদের কাতারে দাড়িয়ে থাকা আল্লাহ্ পাকের কাছে ষাট বছর এবাদতের চেয়েও উত্তম।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্যে থেকে কারো জেহাদে আল্লাহ্ র রাহে (একবার) দাঁড়িয়ে থাকা নিজ গৃহে সত্তর বছর নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এক ব্যক্তি আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! জেহাদের সম পর্যায়ের আর কোন আমল আছে কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ 'সেই আমল করার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে নেই'। সে ব্যক্তি দু' অথবা তিনবার এ ব্যাপারে আরজ করলেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্রতি বারই জবাবে একই কথা এরশাদ করতে লাগলেন যে, 'তোমাদের মধ্যে সে আমল করার ক্ষমতা নেই'। এরপর এরশাদ করলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাহে জেহাদে করে তার উদাহারণ সে ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি (সর্বদা) দাঁড়ানো অবস্থায় কোরআনে পাক তেলাওয়াত করছে এবং নামাযে কখনও সামান্য ত্রুটি হতে দেয় না'।

হযরত ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, "আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক অভিযানে শরীক ছিলাম। পথে একটি মনোরম স্থান দেখা গেল। সেখানে ছিল পানি। স্থানটি ছিল শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ। এ মনোরম দৃশ্য দেখে একজন সাহাবী স্থানটিকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং দুনিয়া ত্যাগী হয়ে এ স্থানে বসবাস করার ইচ্ছা করলেন। এ উদ্দেশে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি এরশাদ করলেন, "আমি ইহুদী বা খৃষ্টান তৈরী করার জন্যে প্রেরিত হইনি; বরং এক সরল, সঠিক, সুস্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন দ্বীন নিয়ে প্রেরিত

হয়েছি। আর আমি সেই আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি যাঁর হাতে মোহাম্মদের (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রাণ, শুধু সকাল বা সন্ধ্যায় জেহাদে গমন করা সারা পৃথিবী ও পৃথিবীতে যা-কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম। আর শুধু একবার জেহাদের উদ্দেশে দণ্ডায়মান হওয়া ষাট বছরের নামায থেকে উত্তম। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম আহ্‌মদ (রাঃ)।

হযরত আব হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক জান্নাতে আল্লাহ্‌র রাহে প্রাণ উৎসর্গকারীদের জন্যে একশত স্তর রেখেছেন। প্রত্যেক দু' স্তরের মধ্যে তফাত হলো এতখানি যতখানি তফাত আসমান ও যমিনের মধ্যে রয়েছে। অতএব, যখন তোমরা আল্লাহ্ পাকের নিকট মোনাজাত কর তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের আরজী পেশ কর কেননা, ফেরদাউস সব জান্নাতের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সর্বোচ্চ স্তরের জান্নাত। আর তার উপরই রয়েছে আল্লাহ্ পাকের আরশ। আর ফেরদাউস থেকেই অন্যান্য জান্নাতে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। এই হাদীস সংকলন করেছেন ইমাম বোখারী (রাঃ) ।

বস্তুত ঃ জেহাদের ফজিলত বর্ণনাতীত। আলোচ্য আয়াতে একথাও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ

অর্থাৎ এতদসত্ত্বেও তা তোমাদের নিকট অপ্রিয় তথা তোমরা তাকে কষ্টদায়ক মনে কর। প্রকৃত অবস্থা এই, প্রাণ প্রাণী মাত্রেরই প্রিয়। প্রাণের মায়া সকলের কাছে সবচেয়ে বেশী, আর এটি মানুষের স্বভাবগত দুর্বলতা। এজন্যেই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

অর্থাৎ "তোমরা যা কিছু নিজের জন্যে অকল্যাণকর মনে কর তা-ই হয়তো তোমাদের জন্যে হবে কল্যাণকর"।

পক্ষান্তরে যা কিছু তোমরা নিজের জন্যে পছন্দনীয় ও উপকারী মনে কর তা-ও হয়তো তোমাদের জন্যে হবে ক্ষতিকর। বস্তুতঃ মানুষের কল্যাণ কোন্ কাজে আর অকল্যাণ কিসে তা মানুষ জানে না, জানতে পারে না, এ কারণে মানুষ অনেক সময়ই ভুল করে। শুধু তাই নয়, বরং ভুলের মাশুলও আদায় করতে বাধ্য হয়। মানুষের কল্যাণ বা অকল্যাণ কি কাজে হয় আর কিভাবে হয়, তা জানেন শুধুমাত্র এক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

"আর আল্লাহ্ পাক জানেন তোমরা জান না"। তাই মানুষের প্রধানতম কর্তব্য হলো এক আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য

প্রকাশ করা। জান-মালের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকায় হয়তো জেহাদ তোমাদের নিকট অপ্রিয়, অপছন্দনীয় এবং মন্দ মনে হচ্ছে, অথচ এ জেহাদের মাধ্যমেই অর্জিত হবে তোমাদের জান-মালের নিরাপত্তা, সূচিত হবে তোমাদের বিজয়, প্রতিষ্ঠিত হবে তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, বৃদ্ধি পাবে ইসলামের শান-শওকত। পক্ষান্তরে জেহাদ পরিহারে রয়েছে তোমাদের জন্যে অশান্তি, অবমাননা তথা সমূহ অকল্যাণ। অতএব, বিনা দ্বিধায়, নির্ভিক চিত্তে, নিঃশঙ্ক মনে জেহাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হও, আল্লাহ পাকের হুকুম পালন কর। আল্লাহ্ পাকের রহমত লাভে ধন্য হও। এটিই সরল সঠিক পথ, এটিই শান্তি, কল্যাণ এবং পরম সাফল্য লাভের পথ।

জেহাদের তাৎপর্য

মানব দেহে কোন দুষ্ট-ক্ষত হলে তার যন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার্থে যেমন দেহে অস্ত্রোপচার করতে হবে তেমনি মানবতার কোন দুশমন যখন জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারে মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তোলে তখন ইসলাম অস্ত্রোপচারের তথা- জালেমের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের নির্দেশ দেয়। এভাবে ইসলাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে। জেহাদের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমেই ইসলাম বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধন করেছে। জালেমদের অত্যাচার বন্ধ করার এবং মজলুমের হক্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করেছে। অতএব, জেহাদের নাম শ্রবণ করে এ যুগে যারা আঁতকে ওঠেন তাদের একটু চিন্তা করা উচিত এবং জেহাদের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা উচিত। শুধু তাই নয়; বরং জেহাদের বিধান প্রবর্তনের যে ইতিহাস রয়েছে এবং যে পরিস্থিতি ও পরিবেশে জেহাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তার প্রতিও দৃষ্টিপাত করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য। একথা সর্বজনবিদিত যে, ইসলাম শান্তির পতাকাবাহী, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্ব-বন্ধুত্ব কায়েম করা ইসলামেরই বৈশিষ্ট্য। ইসলাম বিশ্ব-মানবকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট। বিশ্ব-শান্তি অক্ষুন্ন রাখতে দৃঢ়সংকল্প। কেননা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের তথা-বিশ্ব মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধানের মূল লক্ষ্য। শুধু এ কারণেই যদি সমাজ বা জাতীয় জীবনে অথবা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেউ অশান্তি সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়, মানবতার অবমাননায় উদ্যত হয়, ইসলামের প্রচার-প্রসারে বাধা দেয় অথবা মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত-আবরুর প্রতি হামলা চালায় এমন জালেমদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে ইসলাম, যাতে করে জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচারের মূলোৎপাটন সম্ভব হয় এবং জেহাদের মাধ্যমে যেন মানবতার শত্রুদের পরাভূত করা যায়। এখানে একথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য যে, যখন মুসলমানদের উপর কেউ আক্রমণ করে তখন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা ফরজ করা হয়েছে। আর যখন কোন মুসলমান দেশের উপর শত্রুর আক্রমণ হয় অথবা সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতি আক্রান্ত হয় তখন সকল মুসলমানের উপর জেহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। প্রতিটি মুসলমানকে তখন তার জীবন ও সম্পদ এক কথায় সব কিছু ত্যাগের মাধ্যমে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে হয়। এজন্যে পবিত্র কোরআনে জেহাদের লক্ষ্যে যথাসাধ্য সময়োচিত প্রস্তুতি গ্রহণের তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ (সূরায়ে আন্‌ফাল)

(আর তোমরা শত্রু দমনের উদ্দেশে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। অশ্ব পোষণ ও অন্যান্য সময়োচিত এবং যুগোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা কর, যাতে তোমরা তা দ্বারা আল্লাহ্‌র শত্রু ও তোমাদের শত্রুর প্রতি আঘাত হানতে পার, তাদেরকে পর্যুদস্ত ও প্রভাবিত করতে পার।)

এমনিভাবে জেহাদের নির্দেশ দিয়ে কোরআনে করীমে আরও এরশাদ হয়েছেঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (সূরায়ে তওবা)

"হে মোমেনগণ! তোমরা শত্রুর প্রতি চরম আঘাত হানতে বেরিয়ে পড়ো, হালকা এবং ভারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এবং তোমাদের শত্রুদের মূলোৎপাটন কর, আর আল্লাহ্‌র রাহে জান-মাল দ্বারা জেহাদ কর, এটি তোমাদের জন্যে উত্তম পন্থা যদি তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার"।

আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ কর আর নিশ্চিতভাবে একথা জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

জেহাদ মুসলমানের বৈশিষ্ট্য

এ পৃথিবীতে যারা অত্যাচার-অনাচার, উপদ্রব-উৎপাত তথা অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের উপর এবং মানবতার দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ও আল্লাহ্‌র রাহে জেহাদ করে আত্মত্যাগের মহান আদর্শ পেশ করা এবং মানবতার উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করা মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ الطَّاغُوْتِ فَقَاتِلُوْٓا اَوْلِيَآءَ الشَّيْطٰنِ

"যারা প্রকৃত ঈমানদার, তারা আল্লাহ্‌র রাহে মুসলমানদের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়ে যায়, অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হয়, পক্ষান্তরে যারা কাফের, আল্লাহ্‌র নাফরমান মুসলমানদের শত্রু তারা লড়ে শয়তানের পথে। অতএব হে মোমেনগণ! তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, তাদের ষড়যন্ত্রকে বানচাল কর"।

জেহাদের জন্যে প্রিয়নবী (সঃ)-এর প্রতি বিশেষ নির্দেশ

জেহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমরা এভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে, জেহাদের জন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষ ভাবে সম্বোধন করে তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ

"হে নবী! কাফের ও মুনাফেকদের বিরুদ্ধে জেহাদ করুন এবং তাদের সম্পর্কে কঠোরতা অবলম্বন করুন এবং তাদের আশ্রয়-স্থল হলো দোযখ"।

বস্তুত ঃ অন্যায়-অনাচারের মূলোৎপাটনের একমাত্র পথ জেহাদ, মানবতার বৃহত্তর কল্যাণের জন্যেই জেহাদ এবং এ অশান্ত পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই জেহাদ।

যিনি বিশ্ব প্রতিপালক, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা, যিনি দ্বীন দুনিয়ার মালিক জেহাদের আদেশ তাঁর। অতএব, জেহাদের আদেশ পালনেই রয়েছে শান্তি আর শান্তি রক্ষার বৃহত্তর প্রয়োজনেই জেহাদের বিধান কেননা, পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اَلْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থাৎ "অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যাকাণ্ড থেকেও মারাত্মক এবং জঘন্য কাজ"। অতএব, এমন জঘন্য কাজের অনুমতি দেয়া যায় না। এজন্যেই ইসলামে জেহাদের বিধান পেশ করা হয়েছে আর যতদিন না ফেৎনা-ফ্যাসাদ এবং অশান্তি নিরসন না হয় ততদিন জেহাদ অব্যাহত রাখার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ

(সূরায়ে আনফাল)

"এবং শত্রুদের হত্যা কর তাদের সাথে লড়াই কর যতক্ষণ না অশান্তি, উৎপাত এবং উপদ্রব বন্ধ হয়"।

কেননা ইসলাম আল্লাহ্ পাকের একমাত্র মনোনীত ধর্ম। মুসলিম জাতি আল্লাহ্‌র একমাত্র অনুগত জাতি। তাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে মুসলমানদের উপর। আল্লাহ্ পাক মোমেন মাত্রের প্রতিই এ মহান দায়িত্ব অর্পণ

করেছেন যেন তারা মানবতার দুশমনদের মোকাবেলা করে, জান মালের কোরবানী পেশ করে এবং এ সুন্দর বসুন্ধরাকে যারা অসুন্দর করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পবিত্র কোরআন মোমেনদেরকে বিশেষ ভাবে সম্বোধন করে কিভাবে জেহাদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানিয়েছে তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এরশাদ হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً (সূরায়ে তওবা)

"হে মুসলিম জাতি! তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। তাদের প্রতি চরম আঘাত হান, তারা যেন তোমাদের আঘাতে কঠোরতা দেখতে পায়"।

এ আয়াতে মুসলমানদের প্রতি সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তোমরা মানবতার দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়, শান্তির দুশমনদেরকে নির্মূল কর, আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমানকে সুদৃঢ় কর। ঈমানের বলে বলীয়ান হও, আল্লাহ্ পাক তোমাদের দ্বারাই মানবতার দুশমনদের শাস্তি বিধান করতে চান। অতএব, তোমরা তোমাদের প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনের জন্যে প্রস্তুত হও। সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত কর এবং অসত্যকে রুখে দাড়াও। অসত্যের বিরুদ্ধে জেহাদ কর। অন্যায়-অনাচার, জুলুম-অত্যাচার, যাবতীয় উৎপাত-অশান্তি এবং অকল্যাণের পথ রুদ্ধ কর। দুশমনের মোকাবেলার বীর বিক্রমে লড়াই কর। এর মোকাবেলায় হয়তো শত্রুকে ধ্বংস করে তোমরা গাজী হবে অথবা নিজে প্রাণ দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হবে। উভয় অবস্থাতেই তোমাদের বিজয় সুনিশ্চত। তোমাদের সাফল্য অবধারিত। জেহাদের মহান লক্ষ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে হয়। জান-মাল তথা সবকিছুর ত্যাগ স্বীকার করতে হয় আর আল্লাহ্র রাহে জেহাদের জন্যে যা কিছু কোরবানী দেয়া হয় তা আদৌ ক্ষুদ্র নয়; বরং তার বিনিময় অত্যন্ত মূল্যবান। আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে এর গুরুত্ব সমধিক। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَىْءٍ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ (সূরায়ে আনফাল)

"তোমরা যা কিছু আল্লাহ্র রাহে জেহাদের উদ্দেশে ব্যয় করবে তার পূর্ণ-বিনিময় তোমাদেরকে দান করা হবে, তাতে তোমাদের প্রতি এতটুকু জুলুম করা হবে না"।

একটি প্রশ্ন

ইসলামের দুশমনদের পক্ষ থেকে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়, ইসলাম তরবারির জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ইসলাম জেহাদের বিধান প্রবর্তন করে পৃথিবীর মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে। এ প্রশ্নটি ইতিপূর্বেও করা হয়েছে এবং বর্তমান যুগেও করা হয় অথচ প্রশ্নটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্রও নেই কেননা, ইসলাম আদৌ তরবারি নয়; বরং উদারতায়, মহানুভবতায় তথা তার মহান শিক্ষায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ইসলামের শান্তি-নীতি, ইসলামের সাম্য, ন্যায় বিচার, আমানতদারী, ঈমানদারী, সততা, ন্যায় পরায়ণতা, এতীম-মিসকীন ও আর্তের প্রতি সেবা, আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য, আল্লাহ্ পাকের প্রিয় রসূলের পরিপূর্ণ অনুসরণ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কোরবানী, মজলুমের প্রতি সহানুভূতি, পরস্পরের প্রতি মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ব ভাব, বীরত্ব ও সৎসাহস, ধৈর্য ও সহনশীলতা, দানশীলতা, দুঃখ-দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সেবা, দুর্গত মানবতার প্রতি দায়িত্ব পালন, মূল্যবোধ, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, মানবতার উৎকর্ষ সাধন, পবিত্র কোরআনের অলৌকিক সত্যতা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান চরিত্র মাধুর্য, তাঁর মহান ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনিন্দ্য-সুন্দর আদর্শ সর্বদা বিশ্ব-বাসীকে বিস্ময়াভিভূত করেছে। সর্বকালের কল্যাণকামী মানুষকে আকৃষ্ট করেছে এবং ইসলাম কবুল করার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে। অতএব, তরবারির মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, একথার মত অসত্য বা মিথ্যা কথা নিশ্চয় আর একটি নেই। ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি ঘটনা আমাদের এ বক্তব্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ জ্বলন্ত নিদর্শন।

দ্বিতীয়তঃ ইসলাম জেহাদের ঘোষণা কখন করেছে তা-ও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কায়ে মোয়াজ্জামায় ইসলাম প্রচার আরম্ভ করার পর সুদীর্ঘ ১৩টি বছর অতিবাহিত করেছেন উৎপীড়িত-নির্যাতীত অবস্থায়, তখনকার জুলুম-অত্যাচারের দৃষ্টান্ত বিরল। এ পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি বা সমাজকে এত কষ্ট সহ্য করতে হয়নি– প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে যত নিদারুণ কষ্ট সইতে হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সকল দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে সত্য ও ন্যায়ের খাতিরে, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে। মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় একাধারে তিনটি বছর যাবত তাঁর ও তাঁর সঙ্গীদের সাথে সামাজিক বয়কট করা হয়েছিল। হযরত সুমাইয়া (রাঃ)-কে শহীদ করা হয়েছিলো। হযরত বেলাল (রাঃ) সহ অন্যান্য সাহাবায়ে কেরামের প্রতি অমানুসিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মক্কার পৌত্তলিকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে তায়েফ গমন করেছিলেন তখন তায়েফেবাসী তাঁর প্রতি যে জুলুম করেছিলো, জুলুম-অত্যাচারের ইতিহাসে তার কি কোন দৃষ্টান্ত আছে? এরপর তিনি যখন মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন তাঁকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক তিনি রাতের অন্ধকারে হিজরত করলেন, মানবতার দুশমনরা তাঁর বাড়ী ঘেরাও করেছিলো, তাঁর পিছু ধাওয়া করেছিলো, তিনি সওর নামক গুহায় মানবরূপি দানবদের অত্যাচার থেকে

আত্মরক্ষার নিমিত্তে বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুর আখড়ায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এরপর তিনি মদীনা মোনাওয়্যারায় হিজরত করলেন, তাঁর আগে পরে পূণ্যাত্মা সাহাবায়ে কেরামও প্রিয় মাতৃভূমি থেকে হিজরত করলেন, ভিটা-মাটি সহ নিজেদের সর্বস্ব পৌত্তলিকদেরকে দিয়ে। শুধুমাত্র এক আল্লাহ্ পাকের নাম নিয়ে তারা চলে গেলেন মদীনায়ে তৈয়্যেবায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কি শান্তির দুশমনদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল? তারা জুলুম থেকে নিবৃত্ত হলো না কখনও। দূরাত্মা পাষণ্ডদের জিঘাংসা যেন আরও বৃদ্ধি পেল। তারা প্রাণের মদীনাা আক্রমণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলো। এমনি অবস্থায় সুদীর্ঘ ১৪টি বছরের নজিরবিহীন জুলুম-অত্যাচার নীরবে সহ্য করার পর সর্ব প্রথম জেহাদের বিধান প্রবর্তন করা হয়। পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হয়। এরশাদ হয়েছে ঃ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ
الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط

(সূরায়ে হজ্জ)

"যারা আক্রান্ত হয়েছে, যারা অত্যাচারিত, উৎপীড়িত-তাদেরকে জেহাদের অনুমতি প্রদান করা হচ্ছে, কেননা তারা অত্যাচারিত"।

অতএব, অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ করা মোমেন মাত্রেরই একান্ত পবিত্র কর্তব্য। এ পবিত্র কর্তব্য পালনে মুসলমানগণ একা থাকবেন না; বরং সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সাহায্য লাভে তারা হবে ধন্য। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মজলুম মুসলমানদের সাহায্য করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, যাদেরকে ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের অপরাধ রলতে এই ছিল যে, তারা এক আল্লাহ্র প্রতি তাদের ঈমানের কথা ঘোষণা করেছে"। তাদের অপরাধ, তারা মুসলমান। যদি মুসলমান হওয়া অপরাধ হয় তবে শুধু এ অপরাধেই তাদের প্রতি বর্ণনাতীত অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়। প্রশ্ন হলো অত্যাচারীকে তার দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া এবং তার অত্যাচারের মোহ ভেঙ্গে দেয়া কি অন্যায় কাজ? মানবতার দুশমনদের রুখে দাড়ানো কি অযৌক্তিক? রক্ত পাগল, রণ উন্মাদ শয়তানী শক্তিকে সমুচিত শাস্তি দেয়া কি অন্যায়? যদি না হয় তবে জেহাদের বিধান প্রবর্তনে যারা আঁতকে ওঠেন তাদের কর্তব্য হলো সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করা। অসত্যের অন্ধকারে আচ্ছন্ন না থাকা। যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে জেহাদের বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে এর প্রয়োজনীয়তা এবং যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে বিলম্ব হয় না। দ্বিতীয়ত ঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যমানায় যত যুদ্ধ হয়েছে তার বেশীর ভাগই আত্মরক্ষামূলক। পৌত্তলিক শক্তি যখন প্রাণের মদীনায় হামলা করেছে তখন মুসলমানদেরকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে। ইসলামের প্রথম

জেহাদ বদর রণাঙ্গণে সংঘটিত হয়। বদর মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দু' শত মাইল দূরে অবস্থিত। কুখ্যাত আবু জেহেল গং মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফের পথে দু' শত মাইল এগিয়ে আসার পর বদর রণাঙ্গনে মুসলমানদের সঙ্গে মোকাবেলা হয়। পৌত্তলিকদের এক হাজার সৈন্যের একটি বিরাট দল রণাঙ্গণে উপস্থিত হয়। মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। আর অস্ত্র-শস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না। একখানি তরবারীতে ৯ জন মুজাহিদ শরীক হয়েছিলেন। মুসলমানদের নিকট মাত্র ২টি ঘোড়া ছিল কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমানের তেজ ছিল, সত্যের বল ছিল, তারা ঈমানের বলে বলীয়ান ছিলেন। তাই এক হাজার সৈন্যের সুসজ্জিত বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছেন। তৃতীয় হিজরীতে ওহোদের যুদ্ধ হয় মদীনা মোনাওয়্যারার উপকণ্ঠে। মক্কা শরীফ থেকে প্রায় তিনশত মাইল সফর করে মানবতার শত্রুরা প্রাণের মদীনা আক্রমণ করে। এমনিভাবে পঞ্চম হিজরীতে আরবের সকল অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে মদীনা শরীফে আক্রমণ পরিচালনা করে। ১২ হাজার সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ইসলামকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার দুঃস্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু মাত্র তিন হাজার মুসলমান তাদের মোকাবেলা করেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মদীনা শরীফের উপকণ্ঠে একটি পরিখা খনন করেন। পবিত্র কোরআনের সূরা আহযাবে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে। আল্লাহ্ পাক সেদিন মুসলমানদেরকে বিজয়ী করেছেন। পৌত্তলিক শক্তি রাতের অন্ধকারে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার আর দুশমনের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ চল্লিশ হাজার। বিজয়ের মালা শোভা পেয়েছে মুসলমানদের কণ্ঠে। সিন্ধুর রাজা দাহিরের বিরুদ্ধে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে মাত্র ৫ হাজার মুজাহিদ অংশ নিয়েছিলেন অথচ রাজা দাহির তার ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে পরাজিত হয়েছিলো। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮ হাজার যারা কাফেরদের ৬০ হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছিল। স্পেন বিজয়ী তারেকের সঙ্গে ছিলেন মাত্র ৭ হাজার মুজাহিদ। তাঁরা রড়ারিকের এক লক্ষ সৈন্যকে পরাজিত করেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, মুসলমান কখনো জনবল বা অস্ত্রবলে বিশ্বাসী হয়ে লড়াই করেনা; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি, নৈকট্য লাভের উদ্দেশে, তাঁরই শক্তিতে শক্তিমান হয়ে দুশমনের মোকাবেলা করেন। এ আলোচনা দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইসলাম তরবারি দ্বারা প্রচারিত হয়নি কেননা, যদি জেহাদের উদ্দেশ্য রক্তক্ষয় বা জুলুম অত্যাচার হতো তবে মক্কা বিজয়ের ঐতিহাসিক দিনে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করতেন না যে, তোমরা সকলেই মুক্ত, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। সেদিন তিনি কারও বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক কোন নির্দেশ প্রদান করেননি; বরং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন।

অতএব, নির্যাতিত মানবতাকে রক্ষা করার জন্যেই জেহাদের বিধান। এ বিধান সর্বকালের জন্যে। বর্তমান যুগে ইরাক, আফগানিস্তান সহ বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের প্রতি যে জুলুম অত্যাচার হচ্ছে, ফিলিস্তিনী মুসলমানদের প্রতি যে জুলুম হচ্ছে, পবিত্র

মসজিদুল আকসা ইহুদীরা দখল করে নিয়েছে এমনি অবস্থায় জেহাদের প্রয়োজনীয়তা কত বেশী তা সহজেই অনুমেয়। এ প্রেক্ষিতকে সম্মুখে রেখে যখন আমরা আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করি

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

(হে মোমেনগণ! তোমদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলো)

তখন এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের অন্যান্য বিধানের ন্যায় জেহাদের বিধানও অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত, বাস্তবের কঠিন পরীক্ষায় বারে বারে পরীক্ষিত।

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ۭ قُلْ قِتَالٌ
فِيْهِ كَبِيْرٌ ۭ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۤ
وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۭ
وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۭ
وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۗىِٕكَ حَبِطَتْ
اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ ۝

তরজমা

(২১৭) (হে রসূল!) তারা আপনাকে পবিত্র মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলে দিন তাতে যুদ্ধ করা অত্যন্ত অন্যায়, কিন্তু আল্লাহ্ পাকের পথে বাধা দেয়া, আল্লাহ্ পাককে অমান্য করা, মসজিদুল হারামে বাধা দেয়া, তার অধিবাসীদেরকে সেখানে থেকে বহিস্কার করা আল্লাহ্ পাকের নিকট তদপেক্ষা গুরুতর অপরাধ। আর অশান্তি সৃষ্টি করা হত্যার চেয়ে গুরুতর অপরাধ। তারা সক্ষম হলে সর্বদা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ স্বীয় দ্বীন পরিত্যাগ করে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, অতঃপর তারাই সে সব লোক যাদের পূর্ণ সাধনা দুনিয়া আখেরাতের উভয় জাহানে ব্যর্থ হলো আর তারা দোযখবাসী, আর তারা তাতে চিরদিন থাকবে।

শানে নুযুল

বর্ণিত আছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের একটি জামাতকে জেহাদের জন্যে প্রেরণ করলেন। তাঁদের দলপতি নির্বাচিত করলেন হযরত আবু ওবায়দাহ এবনুল জাররাহ (রাঃ)-কে। কিন্তু বিদায়কালে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরহ-জ্বালা সইতে না পেরে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এ অবস্থা দেখে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সফর থেকে বিরত রাখলেন। তাঁর স্থলে হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাহাসকে (রাঃ) দলপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করলেন, তাঁকে একটি চিঠি দিলেন এবং এরশাদ করলেন ঃ যে পর্যন্ত তোমরা বাত্নে নাখলা নামক স্থানে না পৌঁছাও সে পর্যন্ত চিঠি পাঠ করোনা। আর সেখানে পৌঁছার পর চিঠির মর্ম পাঠ করো। তবে নিজের সাথীদের মধ্যে কোন ব্যক্তিকে তোমার সাথে গমনের জন্যে বাধ্য করোনা। হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাহাশ (রাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত দল নিয়ে অগ্রসর হলেন এবং নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সেই চিঠি পাঠ করলেন এবং সংগে সংগে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন। এরপর বললেন, "আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ফরমান পাঠ করেছি এবং আমি প্রতিটি হুকুম মানতে প্রস্তুত আছি"। এরপর তিনি চিঠিটি সাথীদেরকে পড়ে শোনালেন এবং ব্যাপারটি ব্যক্ত করলেন। একথা শুনে দু' ব্যক্তি ফিরে গেল কিন্তু অবশিষ্ট সবাই সঙ্গে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করলো। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে তাঁরা কাফের এবনে হাজরমীকে পেলেন। কিন্তু একথা জানা ছিল না যে, ঐ দিনটি জমাদিউস্ সানির শেষ তারিখ ছিল নাকি রজবের প্রথম তারিখ। তাই তাঁরা সে শত্রু বাহিনীর উপর হামলা চালালেন। এবনে হাজরমী নিহত হলো। অতঃপর সাহাবাগণের জামাত সেখান থেকে ফিরে আসলেন। এরপর মুশরেকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, মুসলমানরা নিষিদ্ধ মাসেও যুদ্ধে রত হয়েছে এমনকি, মানুষকে হত্যা করেছে। এ সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ দলে হযরত আম্মার এবনে ইয়াসের, হযরত আবু হোজায়ফা, হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস, হযরত আতবা এবনে গজওয়ান, হযরত সোহাইল এবনে বায়জা, হযরত আমর্ এবনে ফোহায়রা এবং হযরত ওয়াকেদ এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। বাত্নে নাখলা নামক স্থানে পৌঁছে হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাহাশ্ (রাঃ) অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বললেন, "যারা শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে তাদেরই অগ্রসর হওয়া উচিত"। উষ্ট্র হারিয়ে যাওয়ার কারণে হযরত সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস এবং ওতবা (রাঃ) অগ্রসর হতে পারলেন না। অবশিষ্ট মুজাহেদগণ মুশরেকদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মুশরেকরা পরাজিত হলো। দুই জন কয়েদীসহ অনেক যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদ নিয়ে তাঁরা প্রত্যাবর্তন করলেন।[১] এ সময়

(১) তফসীর এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭০

পৌত্তলিকদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন উত্থিত হলো যে, মুসলমানগণ আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের কথা তো বলে কিন্তু সম্মানিত মাসের সম্মান করেনা। প্রকৃত অবস্থা এই যে, এ যুদ্ধটি যেদিন হয় তা ছিল রজব মাসের প্রথম তারিখ। কিন্তু মুসলমানগণ নিজেদের হিসাব মোতাবেক তাকে জমাদিউস সানীর শেষ তারিখ মনে করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধ ভুলবশতঃ রজব মাসের প্রথম তারিখে সংঘটিত হয়। এজন্যে সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে মুশরেকরা অপপ্রচারের সুযোগ পায়। অথচ সাহাবায়ে কেরাম যখন বুঝতে পারলেন যে, এ যুদ্ধ রজব মাসের প্রথম তারিখে হয়েছে তখন তারা অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে তাঁরা আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরাতো ইচ্ছা করে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করিনি। এমন অবস্থায় আমরা কি গুনাহ্‌গার হয়েছি"? তারই জবাব এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[২]

قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ

অর্থাৎ (হে রসূল) আপনি বলে দিন, এতে মর্মাহত হওয়ার কোন কারণ নেই; বরং মুশরেকদেরও এতে অপপ্রচারের কোন যুক্তি নেই কেননা, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ অত্যন্ত বড় গুনাহ্‌র কাজ, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুসলমানরা তো ভুল বশত ঃ এই তারিখে জেহাদ করেছে। তাদের ধারণা মোতাবেক তারা জমাদিউস সানীতেই যুদ্ধ করেছে। অতএব অনিচ্ছাকৃত ভুল ক্ষমার যোগ্য। এজন্যে তাদের প্রতি দোষারোপ করা সমীচিন হবে না। কিন্তু মুসলমানগণ অনিচ্ছাকৃত যে অন্যায় করেছে তার জন্যে যারা এতে অপপ্রচারে লিপ্ত তাদের অবস্থা কি? তারা তো এর চেয়ে অনেক বড় অপরাধ করে বসে আছে। তারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিয়েছে। মুসলমানদেরকে তাদের ভিটা-মাটি থেকে বহিষ্কার করেছে, তাদেরকে যেয়ারত থেকে বঞ্চিত রেখেছে। পৌত্তলিকদের এসব আচরণ যে মারাত্মক অপরাধ এতে কোন সন্দেহ নেই। এজন্যেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

অর্থাৎ মানুষকে ফেতনা-ফাসাদে লিপ্ত করা হত্যা অপেক্ষা জঘন্যতর (অপরাধ)। হে মুশরেকরা ! তোমরা তো আল্লাহ্ পাকের অস্তিত্বকে অস্বীকার কর যা সর্বাধিক গুরুত্ব অপরাধ।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বদরের যুদ্ধের দু' মাস পূর্বে অর্থাৎ ২য় হিজরীর জমাদিউস্ সানীতে তাঁর ফুফাতো ভাই হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে জাহাশকে (রাঃ) একটি অভিযানে প্রেরণ

(১) তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭০

করলেন। তাঁকে একটি হুকুমনামা দান করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, দু' দিন সফর করার পূর্বে হুকুমনামা খুলবে না। দু' দিন সফর শেষ হলে তিনি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত ফরমান খুলে দেখলেন। তাতে লিপিবদ্ধ ছিল ঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। হামদ ও সালাতের পর, তুমি আল্লাহ্ পাকের বরকত এবং রহমতের প্রতি ভরসা করে স্বীয় সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হও। বাত্নে নাখলা নামক স্থানে কোরায়েশের কাফেলার অপেক্ষা কর। আশা করা যায় যে, তাদের সম্পদ তোমাদের হাতে আসবে। আর তা তোমরা আমার নিকট নিয়ে আসবে। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে জাহাশ (রাঃ) এ ফরমান দেখে সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমি শ্রবণ করেছি এবং অনুগত হয়েছি। এরপর ঐ ফরমান সঙ্গীদেরকে শ্রবণ করালেন। আর একথাও বললেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আমার সঙ্গে চলার জন্যে তোমাদেরকে বাধ্য না করি। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা রাখে সে যেন আমার সঙ্গে চলে। অতঃপর তিনি অগ্রসর হলেন এবং সকলেই তাঁর সঙ্গে রইলেন। মদীনা শরীফ থেকে রওয়ানা হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাহাশ (রাঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি কোন্ দিকে যাবো? তিনি এরশাদ করেছিলেন– নজ্দের দিকে। যাহোক, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মোতাবেকই আবদুল্লাহ্ এবনে জাহাশ (রাঃ) বাত্নে নাখলা নামক স্থানে উপস্থিত হলেন যা মক্কা শরীফ ও তায়েফের মধ্যখানে অবস্থিত। কি আশ্চর্য! প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হলো। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই কোরায়েশদের সঙ্গে তাদের দেখা হলো, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ হলো, তাদের একজন নিহত হলো, দু' জন বন্দী হলো, তাদের ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হলো যা তাঁরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থাপন করলেন। অনুরূপ বিবরণ তফসীরে মাজহারীতেও রয়েছে।[১]

কোন কোন তফসীরকার বলেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে জাহাশ (রাঃ) এ গণীমতের মাল থেকে এক পঞ্চমাংশ প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে পৃথক রেখে অবশিষ্ট মাল নিজের সঙ্গীদের মধ্যে বিরতণ করে দিয়েছিলেন। ইসলামে এটিই ছিল সর্ব প্রথম গণীমতের মাল এবং এটিই ছিল সর্বপ্রথম এক পঞ্চমাংশ (খুমুস্) প্রথার প্রচলন। আর মুশরেকদের মধ্যে যে-ব্যক্তি সর্ব প্রথম নিহত হয় সে এই আমর হাজরমীই ছিল। সর্ব প্রথম বন্দী ওসমান এবং হাকাম ছিল। এ ঘটনা গণীমতের মাল থেকে 'খুমুস' বের করা ফরজ হওয়ার পূর্বেকার। অতএব, হযরত আবদুল্লাহ বিন জাহাশের (রাঃ) এই 'খুমুস' বের করার রীতিটিই পরবর্তীতে ফরজ হিসাবে নির্ধারিত হয়। এরপর যখন এই ব্যক্তিগণ হযরত রসূলুল্লাহ

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৯–৩০
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৪৩১-৩২
তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড, ২ পৃষ্ঠা ১০৭

সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হন তখন তিনি এরশাদ করলেন, আমি নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে নির্দেশ প্রদান করিনি (সুতরাং তোমরা সীমা অতিক্রম করেছে)। এরপর গণীমতের মালের কোন অংশই তিনি গ্রহণ করলেন না। এ মাল এবং কয়েদী দু' জনকে তিনি যথা-অবস্থায় রাখলেন। এরপর (যখন এ খবর মক্কায় পৌঁছলো তখন) কোরায়শরা মক্কায় বসবাসরত মুসলমানদেরকে বলতে লাগলো যে, তোমরা কি শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ মাসগুলোতে যুদ্ধ করা বৈধ মনে করে নিয়েছো? এ কথা শ্রবণে মুসলমান যোদ্ধাদের মনে আঘাত লাগলো এবং সকলেই মনে করলেন তাঁরা বিরাট অপরাধ করেছেন, তাই হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! এবনে হাজ রমীকে হত্যা করার পর সন্ধ্যায় আমরা রজবের চাঁদ দেখতে পেয়েছি। কিন্তু এ যুদ্ধ জ মাদিউস্সানীর শেষ তারিখে হয়েছে, নাকি রজব মাসের প্রথম তারিখে হয়েছে তা আমরা বুঝতে পারিনি। এরপর এ ব্যাপারে অনেকে অনেক রকম মত ব্যক্ত করেছেন।

এরপর আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সেই 'খুমুস' গ্রহণ করলেন যা আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রাঃ) বের করেছিলেন। তিনি সমস্ত মাল নিয়ে তা থেকে এক পঞ্চমাংশ 'খুমুস' বের করে নিলেন এবং অবশিষ্ট মাল যোদ্ধাদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।[১]

অতঃপর কোরায়েশরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করলো এ মর্মে যে, আমাদের উভয় বন্দীদের মুক্তিপণের বিনিময়ে রেহাই দিন। তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমার সাহাবী সা'দ এবনে আবি ওয়াক্কাস এবং আতাবা এবনে গজওয়ান প্রত্যাবর্তন করুন, তারপর তোমরা আস কেননা, আমি আশংকা করি যে, তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবে। অতঃপর যখন তারা প্রত্যাবর্তন করলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মুক্তিপণ নিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন। কিন্তু তম্মধ্যে হাকাম এবনে কাইসান ইসলাম কবুল করলেন এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারেই জীবন অতিবাহিত করলেন, অবশেষে 'বীরে মাউনা'র লড়াইতে শাহাদাত বরণ করেছিলেন। আর বন্দীদের মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি ওসমান এবনে আবদুল্লাহ মক্কা প্রত্যাবর্তন করলো এবং কাফের অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছিলো।

وَلَا يَزَالُوْنَ

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেন যে, ইসলামের দুশমনদের অপপ্রচারে তোমরা ব্যথিত হয়োনা, তারা এমন কষ্টদায়ক কাজ

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৩৩

করবেই এমনকি, তারা তো চায় যদি পারে তোমাদেরকে আদর্শচ্যুত করতে তথা ইসলামের মহান নেয়ামত থেকে বঞ্চিত করতে, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করার যে অপপ্রচার তারা করছে, তাতো নিতান্ত সামান্য ব্যাপার। তারা এর চেয়ে গুরুতর আচরণ করতেও দ্বিধাবোধ করেনা। এ কারণেই তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং সম্মানিত মাসের সম্মান বিনষ্ট করতে তথা যুদ্ধ করতে তারা আদৌ পিছপা হয় না। ৬ হিজরীতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ১৪শ সাহাবায়ে কেরামসহ ওমরাহ করতে এসেছিলেন, তারা তাঁকে মক্কা প্রবেশে বাধা দিয়েছিলো, সেখানে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছিলো আর আজ তারাই বলছে, মুসলমানগণ সম্মানিত মাসের সম্মান বিনষ্ট করছে।

যেহেতু এ আয়াতে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধর্মচ্যুত, আদর্শচ্যুত ও পথভ্রষ্ট করতে সচেষ্ট রয়েছে, তাই যদি আদর্শচ্যুত হয় তথা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করে তবে তার পরিণাম কত শোচনীয় হবে তার ঘোষণা রয়েছে পরবর্তী আয়াতে। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

অর্থাৎ যারা ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করবে তথা মুরতাদ হবে আর ঐ অবস্থায় যদি মৃত্যু হয় তবে তারা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে হবে বিপদগ্রস্ত হবে, তারা সর্বস্বান্ত কেননা, ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করলে এবং সে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে এর পরিণাম হয় মারাত্মক এবং ভয়াবহ। তার সারা জীবনের আমল হয় বিনষ্ট। তার জীবনের সমস্ত সম্পর্ক হয় বিচ্ছিন্ন এমনকি, দাম্পত্য জীবনও হয় বিচ্ছিন্ন ও বিঘ্নিত। তার উত্তরাধিকার সম্পর্কও হয় বিনষ্ট। সে 'মীরাস' পায় না। স্ত্রী তার থাকে না। দুনিয়াতে এমনি বহু দুঃখ কষ্ট তো তার আছেই আখেরাতে দোযখের আযাব তার জন্যে অবধারিত। আর সে আযাব হবে চিরস্থায়ী।

فَاُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ

এরা সেসব লোক যাদের পূণ্য-সাধনা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে বিনষ্ট হয়েছে।

মাসায়েলুল কোরআন

(১) এ আয়াতের আলোকে ইমাম শাফেয়ী (রঃ) এ মাসআলা বর্ণনা করেছেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি মুরতাদ হয় আর কুফরের অবস্থায় তার মৃত্যু না হয় এমন অবস্থায় তার নেক আমল বিনষ্ট হবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কোন ব্যক্তি জোহরের নামাজ আদায় করার পর মুরতাদ হলো (নাউযুবিল্লাহ) এবং যোহরের নামাযের সময় অবশিষ্ট থাকতেই সে পুনরায় মুসলমান হয়ে গেল। ঠিক এমনভাবে কোন ব্যক্তি মুরতাদ হলো অথচ সে ইতোপূর্বে হজ্জ করেছিলো। অতঃপর পুনরায় সে ইসলাম কবুল করল এমনি

অবস্থায় ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে তাকে আর হজ্জ করতে হবে না এবং উক্ত যোহরের নামাজও পুনরায় আদায় করতে হবে না। কেননা কোরআনে করীমে আমল বাতিল হওয়ার ক্ষেত্রে একটি শর্ত আরোপ করা হয়েছে ঃ

فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ

অর্থাৎ "কাফের অবস্থায় যদি সে মুরতাদ ব্যক্তির মৃত্যু হয়"।

কিন্তু আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ) এতে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে পুনরায় হজ্জব্রত পালন করতে হবে এবং উক্ত যোহরের নামাযও আদায় করতে হবে কেননা, মুরতাদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত আমল বাতিল হয়ে গেছে। পবিত্র কোরআনে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ

"আর যে ঈমান পরিত্যাগ করলো তার যাবতীয় আমল বাতিল হয়ে গেল"।

(২) কেউ যদি কাফের অবস্থায় কোন সৎ কাজ করে, এরপর ইসলাম কবুল করে এমন অবস্থায় তার সকল সৎ কাজের সওয়াব সে পাবে। পক্ষান্তরে যদি সে কাফের অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় তবে তার সব কিছুই ধ্বংস হবে।

(৩) এখানে এ-ও উল্লেখ্য, যারা ইসলাম গ্রহণ করে পরে তা পরিত্যাগ করে তথা মুরতাদ হয় তাদের পরিণাম সাধারণ কাফেরের চেয়ে অধিকতর শোচনীয়। কেননা কাফেরদের নিকট থেকে জিযিয়া (কর) গ্রহণের বিধান রয়েছে। অথচ মুরতাদ ব্যক্তির জন্যে রয়েছে মৃত্যুদণ্ডের বিধান। এর বিশেষ কারণ হলো, মুরতাদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সে ইসলামের অবমাননা করে।

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ اُولٰٓئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَتَ اللّٰهِ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢١٨﴾
يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۭ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ ۡ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۬ ۭ
قُلِ الْعَفْوَ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١٩﴾
فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۭ وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى ۭ قُلْ اِصْلَاحٌ لَّهُمْ
خَيْرٌ ۭ وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ
الْمُصْلِحِ ۭ وَلَوْ شَاۗءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٠﴾

তরজমা

(২১৮) নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্ পাকের পথে জেহাদ করেছে শুধু তারাই আল্লাহ্ পাকের রহমতের আশা রাখে, আর আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতিশয় দয়ালু।

(২১৯) (হে রসূল!) তারা আপনাকে মাদক-দ্রব্য এবং জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, উভয়ের মধ্যে গুরুতর পাপ রয়েছে এবং মানুষের জন্যে কিছু উপকারও রয়েছে। কিন্তু এগুলোর উপকার অনুপাতে পাপ অনেক বড় (ক্ষতি অত্যধিক) এবং (হে রসূল!) তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে যে তারা কি ব্যয় করবে? আপনি বলে দিন "যা উদ্বৃত্ত থাকে"। এভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর হুকুম বর্ণনা করেন যাতে তোমরা ভেবে দেখ–

(২২০) দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহান সম্পর্কে। আর তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে এতীমদের সম্পর্কে, আপনি বলে দিন তাদের উপকার সাধনই হলো উত্তম কাজ। আর যদি তোমরা তাদেরকেও একত্রিত করে রাখ তবে তারাতো তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ পাক জানেন কে এতীমদের হিতকারী এবং কে তাদের অনিষ্টকারী এবং আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরাক্রান্ত ও মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে সম্মানিত মাসে ভুলবশতঃ যুদ্ধ করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সাহাবায়ে কেরামকে আল্লাহ্ পাক আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা এজন্যে অপরাধী নন, ফলে এ কর্মের জন্যে তাদের কোন শাস্তি হবে না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাঁদের মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয় যে, আমরা দোষী নই, দণ্ডিত হবো না তাই বলে আমরা আল্লাহ্র রাহে জেহাদের যে কষ্ট স্বীকার করেছি তা কি একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে? এর কি কোন সওয়াবই আমরা পাবো না? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এ প্রশ্ন যখন উত্থাপন করা হয় তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا– الاية

অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি পূর্ণ ঈমান এনেছে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে প্রিয় মাতৃভূমি পরিত্যাগ করে হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র রাহে জেহাদ করেছে, আর তা করেছে শুধু আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশেই, তারা নিশ্চিন্ত হতে পারে যে তাদের সাধনা ব্যর্থ হবে না। তারা আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি, সান্নিধ্য এবং রহমত লাভে ধন্য হবে। আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়। তিনি তাঁর

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭২

নেককার বন্দাদের প্রতি মার্জনা করেন। তিনি নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না। তিনি এরশাদ করেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক নেককারদের বিনিময় বিনষ্ট করেন না, তাই এ আয়াত দ্বারা উপরোল্লিখিত অভিযানে অংশ গ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামকে তাঁদের সাফল্যের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে।

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

অর্থাৎ (হে রসূল!) তারা আপনার নিকট মদ্য-পান এবং জুয়া সম্পর্কে জানতে চায়।

মদ ও জুয়ার বিধান

ইমাম আহমদ (রঃ) হযরত আবু হোরায়রা (রঃ) থেকে বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা শরীফে হিজরত করেছিলেন তখন সেখানকার অধিবাসী মদ পান করতো এবং জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল। এ দুটি বিষয়ে যখন তাঁরা হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জানতে চাইলেন তখন আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেন। তখন কেউ কেউ বলতে লাগলেন যে, এ আয়াত দ্বারা বস্তুগুলো হারাম হওয়ার নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে না। কারণ

এতে শুধুমাত্র এতটুকু বলা হয়েছে যে, فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ- (এ দুটি বস্তুতে মস্ত বড় গুনাহ রয়েছে) এই ভেবে তারা পূর্বের ন্যায় মদ্য পান করে যেতে লাগলো। ঘটনাক্রমে একদিন এক মোহাজের ব্যক্তি সঙ্গীদেরকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়তে দণ্ডায়মান হলেন। তখন তিনি নেশাগ্রস্ত ছিলেন। তাঁর কেরাআত ওলট-পালট হয়ে যেতে লাগলো। তখন আল্লাহ্ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

অর্থাৎ ঃ "হে মুসলমানগণ! নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা নামাজের কাছেও যেয়ো না"।

এরপর সূরা মায়েদায় এর চেয়ে আরো কঠিনভাবে এ দুটি বস্তুকে নিষিদ্ধ করে আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ

থেকে-فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ পর্যন্ত। তখন সকলে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, আমরা আর কখনও মদ্য পান করবো না। এতটুকু নির্দেশ আমাদের জন্যে যথেষ্ট।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, মদ্যপান সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের চারটি আয়াত নাযিল হয়েছে। সর্বপ্রথম মক্কা-মোয়াজ্জমায় এ আয়াত নাজিল হয়।

وَمِنْ ثَمَرٰتِ النَّخِيْلِ وَالْاَعْنَابِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْهُ سَكَرًا وَّرِزْقًا حَسَنًا

তখন মুসলমানগণ মদ পান করতেন এবং তা ছিল তাদের জন্যে হালাল। এরপর হযরত ওমর (রাঃ) এবং হযরত মাআয এববে জবল (রাঃ) সহ কয়েকজন আনসারী সাহাবী প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে হাযির হয়ে এ আরজী পেশ করলেন,"ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদেরকে মদ্যপান এবং জুয়া সম্পর্কে নির্দেশ দান করুন। কেননা এ দুটি বস্তু মানুষের বুদ্ধি বিবেক এবং সম্পদকে ধ্বংস করে। তখন আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেনঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

এ আয়াতে যেহেতু আল্লাহ্ পাক মদ্যপান ও জুয়া সম্পর্কে এরশাদ করেছেন ঃ "এতে গুরুতর পাপ রয়েছে"। তাই অনেক সাহাবায়ে কেরাম সঙ্গে সঙ্গে মদ্যপান পরিত্যাগ করেছেন আর কোন কোন সাহাবায়ে কেরাম পবিত্র কোরআনের এ বাক্য

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

(এতে মানুষের কিছু উপকার রয়েছে) এ দলীলের কারণে মদ্যপান পরিত্যাগ করেননি। একবার সাহাবী হযরত আবদুর রহমান এবনে আউফ (রাঃ) কিছু লোককে দাওয়াত করেন। এতে অনেক সাহাবায়ে কেরাম অংশ গ্রহণ করেন আর ঐ দাওয়াতে মদ পরিবেশন করা হয় এবং তারা মদ্য পান করেন ও নেশাগ্রস্ত হন। তখন মাগরিবের নামাযের সময় হয়। ঐ অবস্থায় একজনকে ইমামতি করতে বলা হয়। তিনি যেহেতু নেশাগ্রস্ত ছিলেন তাই নামাযে সূরা ভুল পাঠ করলেন। তখন আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى

এ আয়াতের কারণে নামাযের সময় মাদকদ্রব্য হারাম বলে ঘোষণা করা হয়। তখন কিছু লোক সম্পূর্ণ ভাবে মাদকদ্রব্য বর্জন করেন। তাঁরা বলেন, এমন বস্তুতে কোন কল্যাণ নেই যা আমাদেরকে নামায থেকে বিরত রাখে। আর কিছু লোক নামাযের সময় ছাড়া অন্য সময়ে মদ্য পান করতে থাকেন। যেমন এশার নামাযের পর পান করতেন, ফলে ফজরের আগেই তার নেশা কেটে যেতো। আবার কেউ কেউ ফজরের নামাযের পর পান করতেন, যোহরের নামায শুরু হওয়ার পূর্বে এ দীর্ঘ সময়ে নেশা দূর হয়ে যেতো। একবার উৎবান বিন মালেক অনেক লোককে দাওয়াত করলো এবং এর মধ্যে কয়েকজন মুসলমান এবং বিশেষতঃ হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস

(রাঃ)-ও ছিলেন। এদের জন্যে উৎবান উটের মাথা রান্না করেছিলেন। সবাই খাবার খেয়ে মদ পান করেন এবং সেখানেই নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই তাঁরা নিজেদের গর্ব প্রচারে মেতে উঠলেন এবং উস্কানিমূলক কবিতা পাঠে নিবৃত্ত হলেন। হযরত সা'দ (রাঃ) সেখানে একটি কাসীদা (দীর্ঘ কবিতা) পাঠ করলেন। এই কবিতায় আনসারদেরকে খাটো করে দেখানো হয় এবং নিজের কওমের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করা হয়। ফলে একজন আনসার ব্যক্তি উটের চোঁয়ালের একটি হাড্ডি নিয়ে হযরত সা'দ (রাঃ)-এর মাথায় আঘাত করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ফেটে যায়। হযরত সা'দ (আঃ) তখন হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সেই আনসারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে নালিশ করলেন। আনসারী সাহাবী ঘটনার সব কিছু খুলে বললেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের কাছে দোয়া করলেন যে, হে আল্লাহ! মদের ব্যাপারে আমাদের জন্যে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করুন। এরপর সূরা মায়েদার সে আয়াত নাযিল হলো যেখানে মদকে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়।[১]

قُلْ فِيهِمَآ اِثْمٌ كَبِيرٌ

অর্থাৎ ঃ "(আপনি তাদেরকে) বলে দিন এ দু'টি বিষয়ে অনেক গুনাহ রয়েছে"। কারণ এ দু'টি বিষয় অনেক গুনাহ্র উৎস হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। যেমন পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করা, গালি-গালাজ করা এবং এমনি অন্যান্য ব্যাপার রয়েছে যা পরস্পর শত্রুতা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর জিকর ও নামায থেকে মানুষকে বিরত রাখে। হযরত মাআয (রাঃ) বলেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ তোমরা কিছুতেই মদ্যপান করোনা কারণ এটি সকল মন্দ কাজের উৎস (ইমাম আহ্মদ)। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জেনাকারী ব্যক্তি জেনা করার সময় মোমেন থাকেনা। চোর চুরি করার সময় মোমেন থাকে না এবং মদ্যপায়ী মদ পান করার সময় মোমেন থাকেনাঃ (ইমাম বোখারী)

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ "মদ্য পান করা সর্ব প্রকার নির্লজ্জপনা ও অশ্লীলতার উৎস এবং সকল কবীরা গুনাহর চেয়েও বড় গুনাহ। যে ব্যক্তি মদ্যপান করেছে সে নামায ত্যাগ করেছে (অর্থাৎ এর ফলে তার নামায হয় না) এবং সে তার মাতা, খালা এবং ফুফুর সাথে যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে" (তেবরানী)। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস হলো– "যে ব্যক্তি মদ্যপান করে তার চল্লিশ দিনের নামাজ আল্লাহ্ পাক কবুল করেন না। এরপর যদি সে তওবা করে তবে

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৪

আল্লাহ্ পাক তার অপরাধ মাফ করে দেন। এরপর যদি সে আবার মদ্যপান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হয় না। অতঃপর সে যদি আবার তওবা করে আল্লাহ পাক আবার তাকে মাফ করে দেন। তৃতীয়বারও এমনই হয়ে থাকে। এরপর যদি সে চতুর্থ বার মদ্য পান করে তবে আবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হয় না। এবার যদি সে তওবা করে তবু তার তওবা কবুল করা হয় না। অতঃপর কেয়ামতের দিন তাকে পুঁজ ইত্যাদির নদী থেকে পান করানো হবে" (নাসায়ী)।

হযরত এবনে ওমর (রাঃ) আরও বর্ণনা করেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ "মদ"সমস্ত মন্দ কাজের উৎস। যে ব্যক্তি মদ পান করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামাজ কবুল হয় না। যদি সে পান করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করলো" (তেররানী)। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে আরও বর্ণনা করেন, তিনি এরশাদ করেনঃ "পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি, জুয়াড়ী, উপকার করার পর খোটা দানকারী এবং মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না (দারেমী)। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ তিন ব্যক্তি এমন যাদের জন্যে আল্লাহ পাক জান্নাতকে হারাম করে দিয়েছেনঃ মদ্য পানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং দাইয়্যুস ব্যক্তি (ইমাম আহমদ)।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমাকে আল্লাহ্ পাক সমগ্র মানব জাতির জন্যে রহমত এবং হেদায়েতরূপে প্রেরণ করেছেন। সর্ব প্রকার বাদ্য, মূর্তি, এবং জাহেলিয়াতের নিয়ম-কানুনকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে আমাকে হুকুম করেছেন। আর আল্লাহ্ পাক তাঁর ইজ্জতের শপথ করে বলেন, 'আমার যে বন্দা মদের এক চুমুক পান করবে তাকে সে পরিমাণ পুঁজ অবশ্যই পান করাবো। আর যে ব্যক্তি আমার ভয়ে মদ্য পান পরিত্যাগ করবে তাকে 'কুদুস' হাউস থেকে (শরাবে তহুর) অবশ্যই পান করাবো"। (ইমাম আহমদ)

হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "তিন ব্যক্তি এমন যারা জান্নাতে প্রবেশ করবে নাঃ মদ্যপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি, বে-রহম ব্যক্তি এবং যাদুকে সত্য বলে বিশ্বাসকারী" (ইমাম আহমদ)। হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "যদি মদে অভ্যস্ত কোন ব্যক্তি মারা যায় তবে তাকে মূর্তি-পূজারীদের মত করে আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির করা হবে" (ইমাম আহ্মদ)।

হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত– "আমার কাছে মদ পান করা এবং আল্লাহ্কে ছেড়ে দিয়ে এ খুঁটিটির এবাদত করা একই রকম" (নাসায়ী)।

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ "এবং মানুষের জন্যে কিছু উপকারও আছে"।

কারণ মদ্য পানের সময় এক ধরনের স্বাদ পাওয়া যায়, আনন্দ পাওয়া যায়, খাদ্য-বস্তু তাড়াতাড়ি হজম হয়, সাহস না থাকলে মনে সাহস এবং বীরত্বের সৃষ্টি হয়, অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়, শরীর চাঙ্গা হয় এবং অনেক রোগের উপশম হয়। এতদ্ব্যতীত, জুয়ার দ্বারা বিনা খাটুনীতে এবং বিনা-পরিশ্রমে সম্পদ লাভ হয়।

মাসআলাঃ

এ ব্যাপারে ইমামগণ একমত যে, ইচ্ছাকৃত শরাব দ্বারা কোনরূপ প্রয়োজন মেটানো জায়েয নয়। তবে জবরদস্তি অথবা বাধ্য হলে জায়েয আছে। কারণ আল্লাহ পাক এরশাদ করেনঃ

إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"তবে যদি তোমাদেরকে সে ব্যাপারে জবরদস্তি করা হয়"।

فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তিকে বাধ্য করা হয়, যে বিরোধিতা এবং সীমাও ছাড়িয়ে যায় না তার জন্যে কোন গুনাহ নেই"।

সুতরাং গলায় লোকমা (গ্রাস) আটকে গেলে যদি শরাব ব্যতীত অন্য পানীয় না পাওয়া যায় তবে গলা থেকে লোকমা নামানোর পরিমাণে শরাব পান করে নেয়া ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহ্‌মদ (রঃ)-এর মতে জায়েয আছে।

মদকে ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করার ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা, ইমাম মালেক, ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) বলেন, জায়েয হবে না। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর আরেকটি মত রয়েছে যে, ঔষধ হিসাবে সামান্য ব্যবহার করে নেয়া জায়েয আছে। বিখ্যাত হেদায়া কেতাবের গ্রন্থকার বলেন যে, মদের পাত্রের গাদ ইত্যাদি পান করাও মকরূহ। কারণ এর মধ্যে মদের উপকরণ থেকে যাবে এবং হারাম বস্ত দ্বারা কোন প্রকার উপকার লাভ করাও হারাম। এজন্যে এর দ্বারা জখমে প্রলেপ দেয়া অথবা গৃহপালিত পশু ইত্যাদির ক্ষতস্থানের ঘায়ে প্রয়োগ করা জায়েয হবে না। ঔষধ হিসাবে শিশু অথবা জিম্মিকে পান করানোও জায়েয হবে না। জীব-জন্তুকেও মাদক দ্রব্য পান করানো জায়েয হয় না।

হযরত ওয়ায়েল বিন হজর (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে মদের ব্যবহার সম্পর্কে জানতে চাইলো। তখন তিনি তাকে মদের ব্যবহার থেকে নিষেধ করে দিলেন। এরপর লোকটি আরজ করলো, "আমিতো শুধুমাত্র ঔষধের কাজে ব্যবহার করে থাকি"। তিনি এরশাদ করলেনঃ "এটি ঔষধ নয়; বরং নিঃসন্দেহে এটি রোগ সৃষ্টি করে থাকে" (মুসলিম)

হযরত তারেক বিন মুওয়াইদ (রাঃ) বলেন, "আমি একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলাম, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের

দেশে আঙ্গুর উৎপন্ন হয় এবং সেই আঙ্গুর থেকে আমরা মদ তৈরী করে থাকি'। তখন তিনি এরশাদ করলেন, 'এটি করা উচিত নয়'। আমি আবার আরজ করলাম, তিনি পুনরায় একই জবাব দিলেন। এরপর আমি আরজ করলাম, ঔষধ হিসেবে আমরা রোগীদেরকে এই শরাব পান করিয়ে থাকি"। তিনি এরশাদ করলেন, "এর মধ্যে আরোগ্য (শেফা) নেই, বরং নিঃসন্দেহে রোগের উৎস"। (ইমাম আহ্মদ)

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, "আমি একবার আঙ্গুরের রস থেকে এক পেয়ালা 'নবীজ' তৈরী করেছিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনলেন। তখন সেই রস ফুটন্ত অবস্থায় ছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'এগুলো কি'? আমি আরজ করলাম, 'আমার কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়েছে তার জন্যে এ ঔষধ তৈরী করেছি'। তিনি এরশাদ করলেন 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর যা হারাম করে দিয়েছেন তার মধ্যে তোমাদের কোন শেফা (আরোগ্য) নেই' (বায়হাকী)।[১]

আল্লাহর রাহে দানের পরিমাণ

وَيَسْئَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ط قُلِ الْعَفْوَ ط

অর্থাৎ মানুষ আপনাকে জিজ্ঞাসা করে দান-খয়রাত করতে গিয়ে কী পরিমাণ ব্যয় করবে? (হে রসূল!) আপনি বলে দিন, তোমাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের পর যা উদ্বৃত্ত থাকে তাই ব্যয় কর তথা তোমাদের প্রয়োজন পূরণের পর যা অবশিষ্ট থাকে আখেরাতের কামিয়াবীর আশায়, আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে তা ব্যয় কর। যে-পরিমাণ দান করলে তোমরা অর্থ কষ্ট ভোগ করবে না অথবা কারো হক্ব নষ্ট করে আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে বিপদগ্রস্ত হবে না সে পরিমাণ ব্যয় কর। অতএব, নিজের যথাসর্বস্ব উৎসর্গ করে নিজের স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে কষ্ট দেয়া এবং পর মুখাপেক্ষী হওয়া ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় কাজ নয়। পক্ষান্তরে, আল্লাহর রাহে দান করার ব্যাপারে কার্পণ্য করাও আল্লাহ্ পাকের নিকট পছন্দনীয় নয়। অতএব দুই চরম-পন্থার মাঝামাঝি থাকতে হবে; তথা মধ্য-পন্থা অবলম্বন করতে হবে। নিজের বা স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের নিতান্ত প্রয়োজন পূরণের পর অন্যের প্রয়োজনের প্রতি সহৃদয় দৃষ্টিপাত করতে হবে। এটিই ইসলামী শরীয়তের বিধান। হাদীস শরীফে আছেঃ হে আদম সন্তান! তোমার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা তোমার নিকট আছে তা আল্লাহর রাহে ব্যয় করাই তোমার জন্যে উত্তম। তা ধরে রাখা তোমার জন্যে মন্দ অবশ্য নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা তোমার জন্যে অন্যায় নয়। হযরত হাসান (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হলো এমন যেন না হয় যে তোমার যথা-সর্বস্ব আল্লাহর রাহে দান করে নিজে অন্যের সাহায্য প্রার্থী হও। মুসলিম শরীফে অন্য একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৪৭-৪৯

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেছেন–"তুমি নিজের উপর ব্যয় করা থেকে শুরু কর। অর্থাৎ সর্ব প্রথম নিজের জন্যেই ব্যয় কর। এরপর নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতি, এরপর আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এবং এরপর অন্যান্য লোকদের জন্যে ব্যয় কর।

অপর একখানি হাদীসে রয়েছে ঃ সর্বোত্তম দান হলো মানুষ নিজের প্রয়োজনের পূরণের জন্যে রেখে উদ্বৃত্ত সম্পদ আল্লাহর রাহে দান করবে।[১]

শানে নযুল

সাহাবী হযরত মাআয এবনে জবল (রাঃ) এবং হযরত সা'লাবা (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের সন্তান-সন্ততি রয়েছে, আমাদের গোলামও আছে এবং আমরা সম্পদশালীও আমরা কি আল্লাহর রাহে কিছু ব্যয় করবো? তার জবাবে এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[২]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বর্ণনা করেছেন, মানুষ আল্লাহর রাহে সে পরিমাণ ব্যয় করবে যা তার জন্যে সহজ হবে এবং যে-পরিমাণ ব্যয় করার পর তাকে কষ্টে পতিত না হতে হয়।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ সবচাইতে উত্তম দান সেটি যা নিজের স্বচ্ছলতা বজায় রাখে এবং যে দান নিজের আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু হয় (বোখারী শরীফ)।

হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি গণীমতের মাল বাবদ কিছু স্বর্ণ লাভ করেছিল। তা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির করে আরজ করলো, "এটি আমার পক্ষ থেকে সদকা হিসেবে গ্রহণ করুন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দিক হতে চেহারা মোবারক ফিরিয়ে নিলেন। লোকটি কয়েকবার একই কথা বললো। তখন তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে এরশাদ করলেন, "আন"। এরপর স্বর্ণ খণ্ডটি হাতে নিয়ে এমন জোরে নিক্ষেপ করলেন যে যদি তা সে ব্যক্তির মাথায় লাগতো তবে ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। এরপর এরশাদ করলেন, তোমরা তোমাদের সকল সম্পদ সদকা করার জন্যে হাযির কর, এরপর মানুষের কাছে সাহায্য প্রার্থী হও। মনে রেখো সে সদকাই কবুল হয় যা নিজের স্বচ্ছলতা বজায় রেখে করা হয়"। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যদি আমার নিকট ওহোদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণও হতো তবে আমার নিকট অতীব পছন্দনীয় হতো যে তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তা নিঃশেষ হয়ে যেতো। শুধু এতটুকু যা আমি ঋণ পরিশোধ করার জন্যে রেখে দিতাম"। (বোখারী শরীফ)

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩,পৃষ্ঠা ৭৩
(২) তফসীরে রুহুল মাআনী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১১৫

হযরত আসমা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ "ব্যয় কর, কার্পণ্য করোনা। অন্যথায় আল্লাহ পাক তোমাকে দান করতেও কার্পণ্য করবেন, সুতরাং যথাসাধ্য দান কর"।[১]

এ সুদীর্ঘ আলোচনা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, আল্লাহর রাহে দান করা কর্তব্য। এ ব্যাপারে কার্পণ্য করা নিন্দনীয় কিন্তু কারো পক্ষে সমস্ত ধন-সম্পদ দান করে পরক্ষণে মানুষের মুখাপেক্ষী হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নয়। অতএব, নিজের ও পরিবার বর্গের ব্যয়ভার গ্রহণের পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে তা আল্লাহ্‌র রাহে দান কর। (قُلِ الْعَفْوَا) এ আয়াতে ব্যবহৃত عفو শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। তাউস বর্ণনা করেন عـفـو শব্দটির ব্যাখ্যা হলো– "যা" তোমাদের জন্যে সহজ হয়"।

আমর এবনে দীনার বর্ণনা করেন عفو শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, অপব্যয়ও যেন না হয় এবং কার্পণ্যও যেন না করা হয়। উভয়ের মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করা হয়।[২] যেমন পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

অর্থাৎ ঃ যখন তারা ব্যয় করে তখন তারা অপব্যয় করেনা, কার্পণ্যও করেনা। তারা উভয়ের মাঝে মধ্য-পন্থা অবলম্বন করে।

এ আয়াতে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের ব্যাপারে চিন্তা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কেননা, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী এবং আখেরাত চিরস্থায়ী। দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য অথচ আখেরাতের সাফল্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। অতএব, দুনিয়ার প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে এতে কোন সন্দেহ নেই কিন্তু তা আখেরাতের মূল্যে নয় কেননা, দুনিয়াতে সুখ হোক বা দুঃখ হোক উভয়েরই অবসান হয় মৃত্যুর অলংঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। কিন্তু আখেরাতের অবস্থা এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। সেখানে সুখ হোক দুঃখ হোক দু'ই হবে চিরস্থায়ী। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

اعمل لدنياك بقدر بقائك فيها–(الحديث)

অর্থাৎ ঃ তোমরা দুনিয়ার জন্যে সে পরিমাণ কাজ কর যে পরিমাণে তোমরা তাতে বেঁচে থাকবে। আর আখেরাতের জন্যেও সে পরিমাণ কাজ কর যে পরিমাণ তোমাদের সেখানে অবস্থান করতে হবে।

মূলতঃ দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জহানের ব্যাপারে চিন্তা করার জন্যে এই হাদীস হলো অতি সুন্দর মানদণ্ড। এতদ্ব্যতীত অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার সম্পর্ক যেমন

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা, ৪৫৩
(২) তানবীরুল মেকবাস মীন তফসীরে এবনে আব্বাস (রাঃ) পৃষ্ঠা ৩০

দুনিয়ার সঙ্গে রয়েছে তেমনি আখেরাতের সঙ্গেও রয়েছে। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনে অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ হওয়ার কারণে দুনিয়ার সাথে সম্পর্ক সুস্পষ্ট। এর পাশাপাশি যেহেতু অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের মাধ্যমে ছওয়াব হাছিল করা যায় এজন্যে আখেরাতের সাথেও রয়েছে তার সম্পর্ক বিদ্যমান। এ পর্যায়ে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রঃ) তাঁর বিখ্যাত তফসীরে বয়ানুল কোরআনে কয়েকটি মূল্যবান কথা সংযোজন করেছেন।

ব্যয় সম্পর্কে কর্তব্য

তিনি বলেছেন ঃ ব্যয় সম্পর্কে সর্ব প্রথম চিন্তা করা কর্তব্য যে, এ ব্যয় শরীয়ত মোতাবেক কি-না। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ব্যয় সম্পর্কে যে বিধান প্রদান করেছেন সে মোতাবেক কি-না। যদি তা না হয় তবে বিরত থাকতে হবে। অর্থাৎ যদি কোন পাপ কার্যে ব্যয় করার প্রশ্ন ওঠে তবে তা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে কেননা, সে ব্যয় কোন অবস্থাতেই বৈধ হবে না। আর যদি ছওয়াবের কাজে ব্যয় করার প্রশ্ন থাকে তবে দেখতে হবে যে, এ ব্যয় ফরজ ওয়াজিব কি-না যেমন যাকাত, ফেতরা প্রভৃতি। তবে এমন ব্যয় অবশ্য কর্তব্য হবে। পক্ষান্তরে যদি ঐ কাজটি নফল হয় যেমন সাধারণ দান-খয়রাত, তবে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হবে, এতদ্বারা স্বীয় পরিবারবর্গের কোন হক্ব নষ্ট হয় কি-না। যদি পরিবার বর্গের কোন হক্ব নষ্ট হয় তবে এমন ব্যয় শরীয়ত মতে বৈধ হবে না। এমন কি যদি কারো হক্ব নষ্ট না হয় অথচ ব্যয় করার পর নিজেরই ব্যাকুল হওয়ার আশংকা থাকে তথা ব্যয়ের পর আক্ষেপ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন অবস্থায়ও দান করা শরীয়ত মতে বৈধ হবে না। আর যদি সে কাজের সওয়াব বা আযাবের প্রশ্ন না থাকে কাজটি মোবাহ্ পর্যায়ের হয় যেমন কোন উপকারী ফল খাওয়া, যদি এবাদতে শারীরিক বৃদ্ধি হবার আশায় ফল খাওয়া হয় তবে তাতে সওয়াব হবে। পক্ষান্তরে পাপ কার্যে শক্তি অর্জনের উদ্দেশে যদি খাওয়া হয় তবে তাতে গুনাহ্ হবে। আর যদি শুধু মনের সন্তুষ্টি লাভের জন্যে খাওয়া হয় তবে তা মোবাহ্ হবে।

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتٰمٰى

অর্থাৎ ঃ (হে রসূল!) আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি এতীমদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তাদের কল্যাণ সাধনই হলো উত্তম কাজ। আর যদি তাদের ধন-সম্পদ তোমাদের সঙ্গে মিশ্রিত করে নাও তবে তারা তো তোমাদেরই ভাই।

এতীমের হক্ব

তদানীন্তন কালে এতীমদের ধন-সম্পদ সম্পর্কে আদৌ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো না। পরিণামে এতীমদের ধন-সম্পদ প্রায় বিনষ্ট হতো। এজন্যে এতীমদের

সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ- الاية

অর্থাৎ ঃ "তোমরা এতীমদের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না (অন্যায়ভাবে)"। এমনিভাবে আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى

অর্থাৎ "এতীমদের অর্থ-সম্পদ গ্রাস অগ্নি ভক্ষণের ন্যায় মারাত্মক"।

এ আয়াত সমূহ নাযিল হওয়ার পর এতীমদের যারা অভিভাবক ছিলেন তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এতীমদের ধন-সম্পত্তি তাদের ধন-সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক করে নেয় কেননা, একত্রে থাকলে এতীমের সম্পত্তি নিজেদের ব্যবহারে আসার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে, তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্য-দ্রব্য ফেলে দিলেও হয় তাদের ক্ষতি। এমনি অবস্থায় কল্যাণকামী মানুষের যা করণীয় তারই উপদেশ রয়েছে এ আয়াতে। এর মর্ম হচ্ছে ঃ এতীমদের ধন-সম্পদ, তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে একত্রিত রাখা বা পৃথক রাখা মূখ্য বিষয় নয়, বরং গৌণ। মূলত ঃ এতীমের অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদের কল্যাণ সাধনই প্রকৃত উদ্দেশ্য। অতএব, যে স্থলে এতীমের কল্যাণের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় সে স্থলে যদি নিজেদের সম্পদ ও এতীমের সম্পদ একত্রিত করে রাখা হয় এবং তাদের সম্পদ থেকে কোন বস্তু খেতেও হয়, তাতে ভয়ের কোন কারণ নেই কেননা, অন্য সময় তারাও তোমাদের সম্পদের কোন অংশ ভোগ করে থাকে। যেখানে ভ্রাতৃত্বের এবং মহত্বের পবিত্রতম সম্পর্ক বিরাজমান সেখানে একে অন্যের সঙ্গে পানাহার করাই স্বাভাবিক। এমন অবস্থায় কোন দোষের প্রশ্ন উত্থিত হয় না। পবিত্র কোরআন এ কথাটিকেই বলেছে ঃ

وَاِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ

(আর যদি তোমরা তাদেরকে একত্রিত করে রাখ তবে তারা তো তোমাদের ভাই।)

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

(আল্লাহ পাক জানেন কে এতীমদের হিতকারী এবং কে এতীমদের অনিষ্টকারী।)

কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, এতীমদের অভিববক হয়ে সামান্য নাম-মাত্র জিনিস এতীমের সম্পদের সঙ্গে মিশিয়ে অধিকাংশ সম্পদই হজম করা হয়। যারা এতীমের সম্পদ আত্মসাত করার অসৎ উদ্দেশে এমন কাজ করে আল্লাহ্ পাক তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। পক্ষান্তরে যারা এতীমদের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষায় আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে অর্থাৎ এ উদ্দেশে তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের সম্পদ ও নিজের সম্পদ একত্রিত করে এবং এমন অবস্থায় তাদের অজ্ঞাতসারে কিছু

কম-বেশী হয়, অথচ তাদের নিয়ত থাকে সঠিক, সৎ ও মহৎ এমনি অবস্থায় সে এজন্যে দায়ী হবে না।

وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَاَعْنَتَكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক ইচ্ছা করলে এ সহজ পন্থার অনুমতি না দিয়ে তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করতে পারতেন। তোমাদের জন্যে কঠিন বিধান প্রবর্তন করতে পারতেন, তোমাদের অজ্ঞাতসারে এ পর্যায়ে যে ভুল-ত্রুটি হয় তার জন্যেও তিনি তোমাদেরকে পাকড়াও করতে পারতেন। তোমাদের প্রতি কঠিনতর নির্দেশ প্রদান করতে পারতেন।

اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি সর্বশক্তিমান, তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র কার্যকর, তাঁর কতৃত্ব সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান কিন্তু তিনি তা করেন না কেননা, তিনি حكيم অর্থাৎ তিনি বিজ্ঞানময়, তিনি বন্দাদের কল্যাণের লক্ষ্যে সব কিছু করেন।

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۭ وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى
يُؤْمِنُوْا ۭ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۭ
اُولٰۗىِٕكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ ۚ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِاِذْنِهٖ ۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۝

তরজমা

(২২১) আর যে পর্যন্ত মুশরেক রমণীরা ঈমান না আনে তাদেরকে বিবাহ করোনা। মুশরেক রমণী থেকে মোমেন দাসী অনেক উত্তম, যদিও মুশরেক মহিলা তোমাদের মুগ্ধ করে এবং যে-পর্যন্ত মোমেন না হয় সে-পর্যন্ত মুশরেকদের নিকট বিবাহ দিও না। (মনে রেখো) অভিজাত মুশরেক পুরুষ থেকে মোমেন গোলামও অনেক ভাল, যদিও মুশরেক পুরুষ তোমাদের অতি পছন্দনীয় হয়। তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ্ পাক আহ্বান করেন বেহেশত এবং মাগফেরাতের দিকে তাঁর আদেশক্রমে এবং আল্লাহ্ পাক মানুষের উপকারার্থে তাঁর নিদর্শন সমূহ বর্ণনা করে থাকেন হয়তো তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) বলেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার আবু মুরশেদ গানাবী (রাঃ)-কে মক্কা মোয়াজ্জমায় এ উদ্দেশে প্রেরণ করলেন, যেন মক্কার মুসলমানদেরকে তিনি গোপনে সরিয়ে নিয়ে আসেন। যখন তিনি মক্কায় পৌঁছলেন তখন এনাক নাম্নী এক মুশরেক স্ত্রীলোক তাঁর আগমনের সংবাদ শ্রবণ করে তাঁর নিকট উপস্থিত হলো। সে জাহেলিয়াতের যুগে তাঁর প্রতি আসক্ত ছিল। স্ত্রীলোকটি বলতে লাগলো, "কি ব্যাপার আবু মুর্শেদ! তুমি আমার সাথে অভিসারে মিলিত হচ্ছো না কেন"? তখন তিনি বললেন, "কমবখ্‌ত এনাক দূর হও"? ইসলাম আমাকে এসব ব্যাপার থেকে বিরত রেখেছে"। তখন মহিলাটি বললো, "তাহলে তুমি আমাকে বিয়ে করে নাও"। তিনি বললেন, "যদি তা করতে হয় তবে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে গিয়ে তাঁর অনুমতি গ্রহণ করতে হবে"। স্ত্রীলোকটি বললো, "তুমি আমার সাথে কৌতুক করছো মনে হচ্ছে"। একথা বলেই সে হৈ-হল্লা শুরু করে দিল। আর তার দলের পুরুষেরা এসে আবু মুর্শেদ (রাঃ)-কে অমানবিক ভাবে প্রহার করতে লাগলো। অতঃপর যখন হযরত আবু মুর্শেদ (রঃ) মক্কার দায়িত্ব পালন করে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌঁছলেন তখন তিনি এনাক এবং নিজের মধ্যেকার সকল ঘটনা ব্যক্ত করলেন এবং আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! তার সাথে কি আমার বিবাহ জায়েয হবে"? এ সময় আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ

অর্থাৎ মুশরেক স্ত্রীলোকরা যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না আনে ততক্ষণ তাদেরকে বিবাহ করোনা।[১]

তফসীরুল কোরআন

অমুসলিমের সাথে বিবাহ প্রসঙ্গ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে অমুসলমাদের সঙ্গে মুসলমানদের বিয়ে-শাদী বৈধ ছিল। মুসলমান পুরুষরা অমুসলিম নারীদেরকে বিয়ে করতো এমনিভাবে মুসলিম নারীদেরও অমুসলিম পুরুষদের সঙ্গে বিয়ে হতো। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ প্রথা বাতিল হলো। অমুসলিম নারী কী পুরুষ সে যত পছন্দনীয়, লোভনীয়, মোহনীয় হোক না কেন তার সাথে কোন মুসলমানের দাম্পত্য সম্পর্ক সর্বকালের জন্যে নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হয়েছে এ আয়াতে। এমনকি যদি কোন মুসলিম পরিবারেও স্বামী বা স্ত্রী মুশরেক

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৬
তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৫৪।

হয়ে যায় তবে তাদের বিবাহ-বন্ধন বিনষ্ট হয়ে যায়। আলোচ্য আয়াতে এ ঘোষণার পর একথাও এরশাদ হয়েছে যে, মোমেন স্ত্রীলোক কাফের স্ত্রীলোক থেকে (সহস্র গুণ) উত্তম, যদিও ধন-সম্পদ বা সৌন্দর্যের কারণে মুশরেকরা তোমাদের চিত্তকে মুগ্ধ করে। তার কারণ হচ্ছে এই যে, দাম্পত্য সম্পর্ক যা সর্বাধিক ঘণিষ্ঠতর সম্পর্ক একে অন্যের প্রীতি বন্ধন এর পূর্ব শর্ত। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি চিন্তায়-চেতনায়, বিশ্বাস-ভরসায় এত বড় তফাত থাকে যে, একজন হয় তৌহীদ-পন্থী তথা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসী, অপরজন হয় পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী এমন অবস্থায় তাদের জীবনে শান্তির সম্ভাবনা থাকেনা, তাদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি অচিন্তনীয় তাদের জীবন হবে দুর্বিষহ। তাই স্বভাব-ধর্ম ইসলাম মুশরেক পুরুষ বা নারীর সাথে মুসলমানদের বিবাহ অবৈধ বলে ঘোষণা করেছে।[১]

এতদ্ব্যতীত, ইসলামে বিবাহ একটি ধর্মীয় কাজ। এমন অবস্থায় যখন এক পক্ষ ইসলাম ধর্মের মূল ভিত্তি তৌহীদকে অস্বীকার করে তখন এমন লোকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায় না। এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে সকল অমুসলিমের সাথে মুসলমানদের বিবাহ অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত থানবী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ এ আয়াতে দুটি আদেশ বর্ণিত হয়েছে– (১) কাফের পুরুষের সাথে মুসলিম মহিলার বিবাহ বৈধ নয় এমনকি, স্বামী কাফের হয়ে গেলে স্ত্রী মুসলমান থাকলে পূর্বের বৈধ বিবাহেও বিচ্ছেদ ঘটে যায় এবং এই স্ত্রীলোকটির ঈদ্দত পালনের পর অন্য পুরুষের সঙ্গে বিবাহ হতে পারে। এমনিভাবে যদি কোন অমুসলিম নারী আল্লাহ্ পাকের মর্জিতে ইসলাম কবুল করে আর তার কাফের স্বামী যদি ইসলাম কবুল না করে তবে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। তবে এখানে এতটুকু কথা রয়েছে যে ঘটনাস্থল দারুল ইসলাম হলে পুরুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে সে ইসলাম কবুল করে কি-না। যদি সে ইসলাম কবুল করে তবে বিবাহ অটুট থাকবে। পক্ষান্তরে যদি সে ইসলাম কবুল করতে রাজী না হয় তবে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। কিন্তু ঘটনাস্থল যদি দারুল হরব হয় তবে স্বামীকে একথা জিজ্ঞাসা করার কোন প্রয়োজন হয় না। স্ত্রী লোকটি ইসলাম কবুল করার পর তিন ঋতু কাল অতিক্রান্ত হলে, আর ঋতুস্রাব বন্ধ অবস্থায় তিন মাস পর এবং গর্ভবতী থাকা অবস্থায় সন্তান প্রসবের পর পূর্ব বিবাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হবে। অবশ্যই এসব ক্ষেত্রে বিবাহ ভঙ্গের পর ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব হবে। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই, বিবাহ ভঙ্গের পর থেকে তালাকের ঈদ্দত পালন করার পর অন্যের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

সাধারণত ঃ এমন পরিলক্ষিত হয় যে অমুসলিম স্ত্রীলোক মুসলমান হওয়ার সাথে সাথে তাকে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দেয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় ঈদ্দত পালন করা হয় না। এটি একটি না-জায়েষ কাজ এবং এই নতুন বিবাহটি শুদ্ধ হয় না।

৮-৩৫

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৫৬

(১) এ আয়াতের দ্বিতীয় আদেশটি এই, কোন মুসলমান পুরুষ কোন কাফের স্ত্রীলোককে বিবাহ করবে না। এ নির্দেশের আবার দু'টি অংশ আছে–

(ক) সেই কাফের স্ত্রীলোকটি কেতাবী অর্থাৎ কোন ইহুদী অথবা নাসারা না হয়ে থাকবে। অতএব, হিন্দু অথবা অগ্নি উপাসনাকারী স্ত্রীলোকের সাথে মুসলমানের বিবাহ হতে পারেনা।

(খ) সেই কাফের স্ত্রীলোকটি কেতাবী অর্থাৎ ইহুদী অথবা নাসারা হবে। এ ক্ষেত্রে আলোচ্য আয়াতে নিষিদ্ধতা নেই; বরং সূরা মায়েদায় এ বিষয়ে বলা হয়েছে, কেতাবী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা জায়েয।

মাসআলা

কেতাবী স্ত্রীলোককে বিবাহ করা জায়েয থাকলেও কাজটি ভাল নয়। হাদীস শরীফে দ্বীনদার স্ত্রীলোককে বিবাহ করার হুকুম রয়েছে। অতএব, (কেতাবী) অমুসলিম স্ত্রীলোককে বিবাহ করা আরও অধিক অপছন্দনীয় হবে।

মাসআলা

কোন কোন জাতি এমনও রয়েছে যাদেরকে দেখতে শুনতে আহ্‌লে কেতাব মনে হয় কিন্তু তাদের আকীদা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে তারা আহ্‌লে কেতাব নয়। অতএব, এমন জাতির স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ করা জায়েয হবে না। যেমন আজ কাল ইংরেজ জাতিকে সাধারণ লোক খৃষ্টান (নাসারা) মনে করে থাকে কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারা অধিকাংশের আকীদা নাস্তিকতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এরা আল্লাহ্‌কেও বিশ্বাস করে না, ঈসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতেও বিশ্বাস করেনা এবং প্রকৃত ইঞ্জিলকে আল্লাহ্ পাকের কিতাব হিসেবে বিশ্বাস করেনা। সুতরাং এসব লোক খৃষ্টান (নাসারা) নয়। এ গোষ্ঠীর স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ্ করা জায়েয হবে না। অনেকে অনুসন্ধান না করে পশ্চিমা দেশগুলোতে যেয়ে বিয়ে করে নিয়ে আসে- এটি মারাত্মক ভুল।

মাসআলা

যে ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে মুসলমান বলে মনে হয়ে কিন্তু তার আকীদা কুফর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এমন ব্যক্তির সাথে মুসলমান স্ত্রীলোকের বিবাহ জায়েয নয়। আর যদি বিবাহের পর আকীদা কুফরীতে গিয়ে পৌঁছায় তবে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। যেমন আজকাল অনেকেরই নিজের ধর্ম ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান থাকে না, ফলে আধুনিকতার প্রভাব তাদের উপর ভুল ভাবে পতিত হয়ে আকীদাকে ধ্বংস করে দেয়। তাই কণে পক্ষের লোকদের উচিত যেন বিবাহের প্রস্তাব আসার সময় প্রথমে আকীদার অনুসন্ধান করে নেয়। যখন আকীদার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে তখনই কেবল মাত্র জবান দান

করে। আর স্ত্রীলোকদের উচিত যে বিবাহের পর যদি স্বামীর এরূপ আকীদা প্রমাণিত হয় তবে তার কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়ে এবং যেভাবে হোক তার সাথে শয্যা গ্রহণ থেকে বেঁচে থাকে। এ ব্যাপারে এরূপ স্ত্রীলোকদেরকে সাহায্য করা অভিভাবকদের উপর ফরজ।[১]

وَلَاَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ চারটি কারণে কোন রমণীকে বিবাহ করা হয়ে থাকে –(১) সম্পদ, (২) আভিজাত্য (৩) সৌন্দর্য এবং (৪) ধর্মপরায়ণতা। তবে তোমরা দ্বীনদার বা ধর্ম পরায়ণা রমণীকেই গ্রহণ করো। (বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ দুনিয়া একটি পুঁজি। আর এই দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তম পুঁজি হলো নেককার রমণী (মুসলিম শরীফ)। মুসলমানের সাথে অমুসলমানের বিবাহ-বন্ধনে ধর্ম-বিনষ্ট এবং জীবন দুর্বিষহ হওয়ার আশংকা রয়েছে বলেই এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, মুশরেক রমণী যত পছন্দই হোক না কেন মোমেন দাসী তার চেয়ে উত্তম।

অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান না এনেছে, তোমরা মুশরেক রমণীকে বিবাহ করোনা, এমনিভাবে মুশরেক পুরুষের নিকট বিবাহ দিও না।

اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ– الاية

কাফের মুশরেক নারী হোক কি পুরুষ, তারা দোযখের দিকে আহ্বান করে। তথা এমন অন্যায় কাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, যা অবশেষে দোযখের শাস্তির কারণ হয়।

وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

আর আল্লাহ্ পাক মানুষকে ডাকেন জান্নাতের দিকে এবং মাগফেরাতের দিকে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক এমন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন যার ফলশ্রুতি হলো জান্নাত এবং মাগফেরাত। ইমাম রাজী (রঃ) এর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, আল্লাহ্ পাক মুসলিম নারীর পাণি গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন ফলে এ ঘর থেকে যে শিশুর জন্ম হবে সে হবে মুসলমান, সে হবে জান্নাতী। আর আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত জীবন বিধানের বাস্তবায়নে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে শান্তি এবং সন্তুষ্টি।[২]

(১) বয়ানুল কোরআন ২য় পারা, পৃষ্ঠা ১১৭
(২) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬২

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ
عَنِ الْمَحِيْضِ ۭ قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاۗءَ فِي الْمَحِيْضِ ۙ
وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ ۚ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ
حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ۝
نِسَاۗؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۠ فَاْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ ۡ وَقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

তরজমা

(২২২) আর (হে রসূল!) আপনাকে তারা রক্তস্রাব (ঋতু) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন, তা নাপাক। অতএব, ঋতুর সময় তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে দূরে রেখো এবং পাক না হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হয়োনা। পরে যখন তাঁরা পাক হবে তখন যেভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেভাবে তোমরা তাদের নিকট গমন কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তওবাকারী ও শুদ্ধাচারী লোকদেরকে ভালবাসেন।

(২২৩) তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শষ্য-ক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব, যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের ক্ষেত্রে তোমরা গমন কর এবং তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে কিছু (সৎ কাজ) করে পাঠাও এবং আল্লাহ্ পাককে ভয় কর আর নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদেরকে তাঁর দরবারে হাযিরী দিতে হবে এবং মোমেনদেরকে সুসংবাদ দাও।

তফসীরুল কোরআন

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্ পাকের কালাম, পূর্ণ পরিণত জীবন-বিধান। মানব-জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ হেদায়েত। মানুষের জীবনের এমন কোন দিক নেই যেখানে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত নেই। ব্যক্তি জীবন হোক, কি পারিবারিক, সামাজিক জীবন হোক কি জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক– এক কথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রয়েছে পবিত্র কোরআনের হেদায়েত কেননা, বিশ্ব-মানবের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে। অতএব, মানব জীবনের সকল সমস্যার

সমাধান পবিত্র কোরআনে স্থান পেয়েছে। ঋতুবতী নারীদের সমস্যা তন্মধ্যে অন্যতম।

মাসিক স্রাব বা ঋতু, যাকে আরবী ভাষায় 'হায়েয' বলা হয় নারী সমাজের বৈশিষ্ট্য। এ অবস্থায় তাদের নামায-রোজা নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয়; বরং এমন অবস্থায় তাদের সাথে সহবাসও নিষিদ্ধ বা হারাম। পবিত্র কোরআন আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়ে বিশেষ ঘোষণা প্রদান করেছে।

শানে নুজুল

পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে ইহুদীরা ঋতুবতী স্ত্রীদের সাথে শুধু যে ইন্দ্রীয় সম্ভোগ পরিত্যাগ করতো তাই নয়; বরং খাওদা-দাওয়া, ওঠা-বসা পর্যন্ত অবৈধ মনে করতো। এমনকি তাদেরকে ঘর থেকে বের করে রাখা হতো, তাদেরকে সম্পূর্ণ অপবিত্র এবং অপাংক্তেয় মনে করা হতো।

পক্ষান্তরে খৃষ্টানরা ঋতুবতী নারীদের সঙ্গে ওঠা-বসা তো করতোই এমনকি, তাদের সাথে ঋতুবতী অবস্থায় যৌন সম্পর্ক গড়ে তুলতেও দ্বিধা বোধ করতো না। এমন অবস্থায় মুসলমানগণ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান দরবারে এ প্রশ্ন উত্থাপন করলেন যে, ঋতুবতী মহিলাদের সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিধান কি? এ সময় আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়।[১] যা সত্য, যা বাস্তব, যা সঠিক তারই নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে, ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রী সহবাস সর্বকালের জন্যে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, এমন নারীদেরকে এক ঘরে করে রাখতে হবে। বরং তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়া-দাওয়া সবই বৈধ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ভাষায়ঃ

امنعوا كل شيء الا النكاح

অর্থাৎ স্ত্রী সহবাস ব্যতীত আর সবই তাদের জন্যে বৈধ।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, বর্ণিত আছে ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকরা হায়েযের সময় তাদের স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে অবস্থান করতো। আর নাসারারা হায়েযের কোন রূপ পরোয়া না করে তাদের সাথে কামাচারে লিপ্ত হতো। পক্ষান্তরে জাহেলী যুগের মুশরেকরা ইহুদী এবং অগ্নি উপাসকদের মত যখন নারীরা ঋতুবতী হতো তখন তাদের সাথে পানাহার করতো না, তাদেরকে নিজেদের বিছানায় বসতে পর্যন্ত দিত না এমনকি তাদের নিজেদের বাড়ীতেও বসবাস করতে দিত না। অতঃপর যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন মুসলমানগণ আয়াতের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে মহিলাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিতেন। এই সময় গ্রাম থেকে আগত কিছু লোক আরজ করলো ঃ 'ইয়া রসূলাল্লাহ! শীত প্রচণ্ড, কাপড়ও অল্প এ অবস্থায় যদি তাদেরকে সম্পূর্ণ কাপড় দিয়ে গৃহের বাইরে

(১) তফসীরে রুহুল মাআনী খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১২০-২১
খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৯

রাখি তবে পরিবারের সবাই ধ্বংস হয়ে যাবে। আর যদি কাপড় না দেই তবে ঋতুবতী স্ত্রী লোকটি মারা যাবে'। হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, 'যখন তারা ঋতুবতী হয় তখন শুধু কামাচারে লিপ্ত হওয়া থেকে দূরে রাখতে বলেছি। তাদেরকে ঘর থেকে বাইরে রাখতে নির্দেশ প্রদান করিনি যেমন ইহুদীরা করে থাকে'। ইহুদীরা যখন একথা শুনলো তখন বললো, 'এ ব্যক্তিটি আমাদের কোন ব্যাপারেই বিরোধিতা না করে পারে না'। অতঃপর এবাদ এবনে বশীর এবং আসীদ এবনে হাদীস হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে বিষয়টি জানালো এবং আরজ করলো, 'ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা কি হায়েযের অবস্থায় তাদেরকে বিয়ে করতে পারি? তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমরা মনে করলাম তিনি (এ প্রশ্ন করার দরুণ) রাগান্বিত হয়েছেন। অতঃপর তারা দু' জন দাঁড়ালো। এ সময় হাদীয়া স্বরূপ কিছু দুধ আসলো। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের দু'জনের কাছে তা প্রেরণ করলেন এবং পান করালেন। সুতরাং আমরা বুঝলাম যে, তিনি তাদের দু'জনের উপর রাগান্বিত হননি।[১]

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ

"আর লোকেরা আপনার কাছে হায়েযের বিষয়ে জানতে চায়"।

قُلْ هُوَ اَذًى ۙ فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِى الْمَحِيْضِ

"আপনি বলে দিন, তা নাপাক সুতরাং হায়েযের সময় স্ত্রীলোকদের কাছ থেকে দূরে সরে থাক"।

তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণের মতে এই সরে থাকার অর্থ হলো তাদের সাথে কামাচারে লিপ্ত না হওয়া। একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করা বা ওঠা-বসা করা নিষিদ্ধ নয়। যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, কামাচার ব্যতীত তোমরা সব কিছুই করতে পার (বোখারী ও মুসলিম শরীফ)।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি এবং হযরত রসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উভয়ে হায়েযের অবস্থায় একই পাত্রে আহার করতাম। আবার কখনও কখনও আমি নাপাক হয়ে পড়লে আমাকে তিনি তহবন্দ বেঁধে নিতে বলতেন। আমি তহবন্দ বেঁধে নেয়ার পর তিনি আমার সাথে শয়ন করতেন। আবার এ'তেকাফের অবস্থায় তিনি যখন (মসজিদ থেকে) মস্তক মোবারক বের করে দিতেন তখন আমি তা ধৌত করে দিতাম। –(বোখারী, মুসলিম)

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৬৩

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরও বলেন, 'আমি পানি পান করে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পেয়ালা প্রদান করতাম। তখন তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানেই মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন। অনুরূপভাবে আমি একটি হাড় চুষে হযরতকে প্রদান করতাম, তখন তিনি আমার মুখ লাগানো স্থানে মুখ লাগিয়ে হাড়টি চুষে খেতেন (মুসলিম শরীফ)'। তিনি আরও বলেন, 'আমার নাপাক অবস্থায় হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার কোলে মাথা রাখতেন এবং ঐ অবস্থায় কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করতে থাকতেন (হাদীসের সকল কিতাব)'। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) আরও বলেন, একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মসজিদ থেকে আমাকে নির্দেশ করলেন, 'চট গুলো দাও'। তখন আমি আরজ করলাম, 'আমি নাপাক অবস্থায় আছি'। তিনি এরশাদ করেন, 'তোমার হাতে তো নাপাকী নেই'। (মুসলিম শরীফ)

উম্মুল মোমেনীন হযরত মায়মুনা (রাঃ) বলেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এমন একটি চাদর ব্যবহার করে নামায আদায় করেন যার কিছু অংশ তাঁর দেহে মুবারকে থাকতো এবং কিছু অংশ আমার দেহ থাকতো– আর তখন আমি নাপাক অবস্থায় থাকতাম (হাদীসের কিতাব সমূহ)।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, "একবার আমি ঋতুবতী হলাম এবং তখন হায়েযের নির্দিষ্ট কাপড় পরিধান করলাম। তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কি ঋতুর দিন এসে গেছে'? আমি আরজ করলাম,'জ্বী-হ্যাঁ'। তখন তিনি আমাকে তাঁর নিজের চাদরের মধ্যে নিয়ে নিলেন" (বোখারী শরীফ)।

وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ

"আর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা পাক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে যেয়ো না"।

فَاِذَا تَطَهَّرْنَ

"অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে",

فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ

"তখন যেভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে নির্দেশ করেছেন সেভাবে তোমরা তাদের কাছে যেয়ো"।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক মানুষের দৈহিক চাহিদা মেটানোর তথা যৌন-ক্ষুধা নিবারণের বৈধ পন্থা সম্পর্কে নির্দেশ প্রদান করেছেন। যে স্থানে আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২৯

অনুমতি দিয়েছেন তথা জননেন্দ্রীয় পথেই তোমরা ইন্দ্রীয় সম্ভোগ করবে। এ আয়াত দ্বারা গুহ্যদ্বারে রতিক্রিয়া এবং লাওয়াতাত সম্পূর্ণ হারাম বা অবৈধ বলে ঘোষিত হলো। আবার এ আয়াতের এ অর্থও হতে পারে যে "স্ত্রী-সহবাসে সে পন্থা অবলম্বন কর- যে পন্থাটির জন্যে আল্লাহ্ পাক নির্দেশ করেছেন, আর তা হলো স্ত্রীর পবিত্র থাকা কালীন অবস্থায়, হায়েয অবস্থায় নয়"।

মাসআলা

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে হায়েযের সবচেয়ে কম সময় হলো তিন দিন আর সর্বাধিক সময় হলো দশ দিন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে হায়েযের সবচেয়ে কম সময় হলো এক দিন এক রাত আর সর্বাধিক হলো পনের দিন।

মাসআলা

হায়েযের সময় যেমন স্ত্রী-সহবাস নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি ঋতুবতী স্ত্রীলোক নামায পড়বে না, রোজা রাখবে না, মসজিদে গমন করবে না, কোরআন মজীদ স্পর্শ করবে না এবং বায়তুল্লাহ্ শরীফের তওয়াফও করবে না। এমনকি হায়েযের সময় শেষ হলে এ সময়ের নামায সমূহ কাযাও করতে হবে না কিন্তু রোজার কাযা আদায় করতে হবে।

আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে যদি দশ দিনের পূর্বেই কারো হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে গোসল না করে অথবা এমন সময় অতিবাহিত না হয় যে সময়ে গোসল করতে পারে ততক্ষণ এমন স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইন্দ্রীয় সম্ভোগ বৈধ নয়। তবে দশ দিন পূর্ণ হওয়ার পর যদি হায়েয বন্ধ হয় তবে গোসল করার পূর্বেও ইন্দ্রীয় সম্ভোগের অনুমতি রয়েছে। উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (রঃ), আওযায়ী (রঃ), সওরী (রঃ) এবং ইমাম মালেক (রঃ) প্রমুখ মনীষীদের মতে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর গোসলের পূর্বে ইন্দ্রীয় সম্ভোগ বৈধ নয়।

মাসআলা

হায়েয শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্ত্রী গোসল না করা পর্যন্ত স্ত্রী-সহবাস জায়েয হবে না। আর যদি হায়েয বন্ধ হওয়ার পর কমপক্ষে এক ওয়াক্ত নামাজের সময় অতিবাহিত হয় তবে গোসল না করলেও সহবাস জায়েয হবে।

মাসআলা

হায়েযের সর্বোচ্চ সময়-সীমা অর্থাৎ দশ দিন হায়েয থাকার পর যদি হায়েয বন্ধ হয়ে যায় তবে স্ত্রীলোক গোসল না করলেও স্ত্রী সহবাস জায়েয হবে।

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ

"(গুনাহ্ থেকে) তওবাকারীগণকে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন"।

وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

"এবং যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন"।

অর্থাৎ যারা গুনাহ্র কাজ থেকে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্র পাকের পাক দরবারে তওবা করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, কোন লোক যদি ভুলবশতঃ ঋতুকালে বা অবৈধ পথে যৌন-ক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে পরে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তওবা করে, ক্ষমাপ্রার্থী হয়, অবৈধ পথ পরিহার করে এবং হায়েয অবস্থায় সহবাস বর্জন করে চলে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন। আর যারা পবিত্রতা অবলম্বন করে অপবিত্র ও অশুদ্ধ পথ পরিহার করে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে পছন্দ করেন।

বস্তুতঃ নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের তথা ইন্দ্রীয় সম্ভোগ বৈধ হওয়ার কয়েকটি শর্ত রয়েছে। (১) বিবাহিত হতে হবে, (২) স্বামী-স্ত্রী কেউই এহ্রাম অবস্থায় থাকবে না এবং (৩) স্ত্রীকে হায়েয থেকে পবিত্র হতে হবে।

উল্লেখ্য, বর্তমান যুগে শরীয়ত মোতাবেক পর্দা-প্রথা অনুসরণ না করার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ দাম্পত্য কলহ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরকীয়া প্রেম, ব্যাভিচার ইত্যাদি প্রসার লাভ করেছে। পরিণামে হত্যাকাণ্ডও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরকীয়া প্রেমের পরিণতিতে অনেক ক্ষেত্রে ঘর ভেঙে যায়। সংসার ধ্বংস হয়ে যায়, স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়ে প্রেমিকের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রেমিক সঙ্গে সঙ্গে কাযী বা ম্যারেজ রেজিষ্ট্রারের স্মরণাপন্ন হয় এবং ঐ মজলিসে বিবাহ কাজ সমাধা করা হয়। অথচ পূর্বের স্বামীর তালাকের পর ইদ্দত পালনের যে ইসলামী বিধান রয়েছে তার প্রতি গাফলত করে অমার্জনীয় অপরাধ করা হয়। এমন অবস্থায় বিবাহ শুদ্ধ হয় না। পরিণামে ব্যাভিচার হতে থাকে। এমনি অবৈধ ও অপবিত্র পন্থা থেকে যারা বিরত থাকে তারা পবিত্রতা অবলম্বকারীদের অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য আয়াতে এমন লোকদেরকে আল্লাহ্ পাক পছন্দ করেন বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

نِسَآئُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ

তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে চাষের জমি সদৃশ বা কৃষি ক্ষেত্র স্বরূপ। এ ক্ষেত্রে তোমরা যে শুক্রবিন্দু বপন কর, তা হলো তোমাদের বীজ। এর ফসল হলো সন্তান-সন্ততি। অতএব, বংশ বৃদ্ধি বা সন্তান উৎপাদনই স্বামী-স্ত্রী মিলনের মূল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করার জন্যে যে কোন ভাবে যে কোন পন্থায় বা অবস্থায় তোমরা স্ত্রী-সহবাস করতে পার। তবে যেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে তা হলো বীজ যেন সঠিক স্থানে পৌঁছে। স্বামী-স্ত্রী মিলনের পন্থা বা প্রণালী যাই হোক না কেন, জননেন্দ্রীয় পথেই হতে হবে। এ পর্যায়ে মসনদে আহ্মদে সংকলিত একখানি হাদীস রয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির

হয়ে বললেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি তো ধ্বংস হয়ে গেছি"। তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি হয়েছে"? তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "রাত্রে আমার বাহনকে উল্টো করে দিয়েছি"। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথার কোন জবাব দিলেন না। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, "সম্মুখের দিক থেকে আস বা পশ্চাত দিক থেকে আস তোমাদের ইচ্ছা, তবে হায়েয অবস্থায় এসো না এবং গুহ্যদ্বারে যেও না।

وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ

(আর তোমরা নিজেদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে সৎ কাজ করে পাঠাও।)

অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী মিলনের দ্বারা শুধু ইন্দ্রীয় সুখই কামনা করোনা; বরং সে সব উপকারিতার প্রতিও লক্ষ্য রাখ যা দ্বীনের প্রতি তোমাদেরকে ধাবিত করে। যেমন স্ত্রী-সহবাসের মাধ্যমে যে উপকার পাওয়া যায় তম্মধ্যে একটি হলো ব্যাভিচার থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয় (২) সুসন্তান লাভ করা যায়, যে সন্তান তোমাদের জন্যে দোয়া করবে। আর এ সন্তান যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয় তবে সে জান্নাতে তোমাদের জন্যে অগ্রগামী দল হিসাবে হাযির হবে। অতএব, স্ত্রী সহবাসের মাধ্যমেও মোমেনের জন্যে নেকী হাসিলের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। এতদ্ব্যতীত কোন মোবাহ কাজ যদি সঠিক নিয়তে সুসম্পন্ন করা হয় তবে তা এবাদতে পরিণত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "স্ত্রী-সহবাসেও তোমাদের জন্যে সওয়াব রয়েছে"। সাহাবাগণ আরজ করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্! আমরা যখন ইন্দ্রীয় সুখ ভোগ করবো তখনও কি সওয়াব লাভ করবো? তিনি এরশাদ করলেন, "তোমরাই বল, যদি কেউ ব্যাভিচারে লিপ্ত হয় তবে কি তার পাপ হবে না? ঠিক এভাবে যদি ঐ কাজটি হালাল ভাবে কর তবে সে পাবে সওয়াব" (মুসলিম শরীফ)।

এখানে একথাও স্মরণযোগ্য যে স্ত্রী-সহবাসের মাধ্যেমে যদি সুসন্তান লাভ হয় তবে তা মানুষের জীবনের একটি বিরাট সাফল্য বলে বিবেচিত হয়। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "মানুষ যখন মৃত্যু মুখে পতিত হয় তখন তার আমলের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি পথ উম্মুক্ত থাকে। (১) সদকায়ে জারিয়া (২) সে যদি কোন দ্বীনী গ্রন্থ রচনা করে যায় অথবা (৩) যদি সুসন্তান রেখে যায় সে তার জন্যে দোয়া করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন আনসারী মহিলাকে এরশাদ করেন যে, তোমাদের মধ্যে কারো তিনটি সন্তান মারা যাওয়া সত্ত্বেও যদি সে সবর করতে থাকে তবে নিশ্চয় সে বেহেশতে যাবে। তখন মহিলা আরজ করলো "ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি দু' জন মারা যায়"। তিনি এরশাদ করেন, দু' জন মারা গেলেও"।

হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, "আমার উম্মতের মধ্যে যদি কারো দু'টি সন্তান

মারা যায় তবে তাদের কারণে আল্লাহ্ পাক তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন"। হযরত আয়েশা (রাঃ) আরজ করলেন, "আপনার উম্মতের মধ্যে যদি কারো একটি মাত্র সন্তান থাকে"? তিনি এরশাদ করলেন, "যার একটি আছে তার ব্যাপারেও সেই একই নির্দেশ". (তিরমিজী)।

বিখ্যাত তফসীরকার আতা এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ وَقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ এর তাৎপর্য হলো স্ত্রী সহবাসের পূর্বক্ষণে বিস্‌মিল্লাহ্ এবং দোয়া পাঠ কর কেননা, ইমাম বোখারী (রঃ) সংকলিত এবং হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি স্ত্রী সহবাসের সময়

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

এ দোয়া পাঠ করে তবে এ দম্পতির তকদীরে যদি কোন সন্তান থাকে তবে শয়তান সেই সন্তানের কোন ক্ষতি করতে পারবে না"।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

"এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাককে শাস্তি দাতা হিসেবে ভয় করে গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাক।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّكُمْ مُّلٰقُوْهُ

"এবং জেনে রাখ যে (একদিন না একদিন) তাঁর সাথে তোমাদের সাক্ষাত করতে হবে"।

সেদিন তিনি তোমাদের কৃতকর্মের বিনিময় দান করবেন। যদি ভাল কাজ করে থাক তবে ভাল বিনিময় পাবে আর যদি মন্দ কাজ হয় তবে শাস্তি হবে অবধারিত।

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"(হে রসূল!) আপনি মোমেনদেরকে সুসংবাদ দান করুন"।

বিখ্যাত সাহাবী হযরত সোহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মুসলমানদের অবস্থা আশ্চর্যজনক যদি সে আনন্দিত হয় তবে সে আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে তবে তা হয় তার জন্যে উত্তম আর যদি সে কোন কারণে ব্যথিত হয়, আর সে সবর অবলম্বন করে তবে তা-ও তার জন্যে উত্তম হয় (মুসলিম শরীফ)।[১]

মূলত ঃ এ কারণেই মোমেনদেরকে সুসংবাদ প্রদানের নির্দেশ হয়েছে।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭০-৭১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৭৯

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْا وَتَتَّقُوْا وَتُصْلِحُوْا
بَيْنَ النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٤﴾ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ
فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
حَلِيْمٌ ﴿٢٢٥﴾ لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ ۚ
فَاِنْ فَآءُوْ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ
اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٢٧﴾ وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْٓءٍ ؕ
وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ اَنْ يَّكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ فِيْٓ اَرْحَامِهِنَّ اِنْ
كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ
ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا ؕ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۠ ع ١٣
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٢٨﴾

তরজমা

(২২৪) আর তোমরা তোমাদের শপথে আল্লাহ্ পাকের নামকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করোনা, এভাবে যে তোমরা পরের উপকার করবেনা, পরহেযগারী অবলম্বন করবে না এবং মানুষের মাঝে মীমাংসা করবে না। আর আল্লাহ্ পাক সর্ব-শ্রোতা, সর্ব-জ্ঞাত।

(২২৫) এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদের অযথা শপথ সমূহের জন্যে ধর-পাকড় করবেন না। তবে তোমাদের অন্তর সমূহ যে সংকল্প গ্রহণ করেছে তজ্জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ, অতীব সহিষ্ণু।

(২২৬) যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন না করার শপথ করে তাদের জন্যে চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি তারা প্রত্যাবর্তন করে তবে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়ালু।

(২২৭) আর যদি তারা তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত করে থাকে তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সব কিছু শ্রবণ করেন, সব বিষয় সম্পর্কে অবগত।

(২২৮) আর তালাক-প্রাপ্ত রমণীগণ তিন ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষায় থাকবে, আল্লাহ্ পাক তাদের গর্ভে যা সৃষ্টি করেছেন তার কথা গোপন করা বৈধ নয়, যদি তারা আল্লাহ্

পাকের প্রতি ও কেয়ামতের দিনের প্রতি বিশ্বাস করে থাকে। এবং যদি উক্ত সময়ে (ইদ্দতকালে) তারা আপোষ মীমাংসা করতে চায় তবে তাদের স্বামীগণ তাদেরকে পুনরায় (স্ত্রী হিসেবে) গ্রহণে অধিক হক্বদার, আর পুরুষদের প্রতি নারীদেরও অনুরূপ দাবী আছে যেভাবে নারীদের প্রতি পুরুষের দাবী আছে, নারীদের উপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

তফসীরুল কোরআন

وَلَا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِّاَيْمَانِكُمْ

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) এবং তাঁর ভগ্নিপতি আনছারী হযরত বশীর এবনে নো'মান (রাঃ)-এর মাঝে এমন কিছু ঘটে যায় যে জন্যে হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) কসম করলেন, "বশীরের কাছে কখনও যাবো না, তাঁর সাথে কথা বলবো না এবং তাঁর বিরোধিতা কারীদের মধ্যে কখনও মীমাংসা করবো না"। এরপর থেকে বশীর এবনে নো'মান (রাঃ) সম্পর্কে কেউ কোন কিছু আবদুল্লাহ্ (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করলে তিনি জবাব দিতেন, "আমি তাঁর জন্যে কোন কিছু করার ব্যাপারে আল্লাহ্র কসম করেছি। তাই কসম থেকে মুক্ত না হয়ে কোন কিছু করা আমার জন্যে জায়েয হবে না"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

আল্লাহ্র নামে শপথ করা একটি মন্দ কাজ

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন যে, নেক কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্যে এবং আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যে আল্লাহ্র নামে কসম করোনা। অন্যত্র আরও এরশাদ করেছেন ঃ

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (সূরা নূর)

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাব গ্রস্তকে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় যারা গৃহ ত্যাগ করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; বরং মাফ করে দেয়া এবং সহ্য করার অভ্যাস গ্রহণ করাই উচিত। তোমরা কি নিজেদের ব্যাপারে কামনা কর না? যে আল্লাহ্ পাক

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭১

তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেন (অতএব, এমন শপথ যদি কেউ করে, তার উচিত এ কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা প্রদান করা)"।

বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে আছে– আমরা সবার শেষে এসেছি কিন্তু কেয়ামতের দিন সবার আগে থাকবো। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ এমন কসম করে বসে অতঃপর কাফ্ফারা আদায় না করে তবে সে বড় গুনাহ্গার হবে"।

হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেন ঃ

"আল্লাহ্ পাকের কসম করে বলছি যদি আমি এরূপ কোন কসম করি যা ভঙ্গ করার মধ্যে আমার কল্যাণ দেখা যায় তবে ইনশা-আল্লাহ্ নিশ্চয় আমি তা ভঙ্গ করবো এবং কাফ্ফারা আদায় করবো"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার হযরত আবদুর রহমান বিন সামুরাহ্ (রাঃ)-কে এরশাদ করলেন, "হে আবদুর রহমান! সরদার, নেতা এবং ইমাম হওয়ার জন্যে প্রার্থী হয়োনা। যদি না চাইতে এসব পদ তোমাকে দেয়া হয় তবে এর দায়িত্ব পালনের জন্যে আল্লাহ্র তরফ থেকে সাহায্য করা হবে, আর যদি তুমি এ সব পদের প্রার্থী হয়ে থাক তবে এর দায়িত্ব পালনের জন্যে তোমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তুমি যদি কসম কর এবং এরপর এ কসমের বিরুদ্ধে কাজ করার মধ্যে কোন কল্যাণ দেখ তবে (কসম ভঙ্গ করে) সেই কল্যাণজনক নেক কাজটি করে নিও এবং (কসম ভঙ্গের জন্যে) কাফ্ফারা দিয়ে দিও"। (বোখারী শরীফও মুসলিম শরীফ)

মুসলিম শরীফের হাদীস ঃ যে ব্যক্তি কসম করেছে এবং পরে অপর কোন বিষয়কে কল্যাণকর হিসেবে দেখতে পেয়েছে তার উচিত কসম ভঙ্গ করে সেই কল্যাণকর কাজটি করা এবং কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা দেয়া।

আবু দাউদ শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একখানি হাদীসে বলা হয়েছে যে অর্থহীন কসম হলো সেগুলো যা লোকেরা নিজেদের পরিবারের মধ্যে কথা প্রসঙ্গে বলে ফেলে। যেমন- 'খোদার কসম এরূপ' অথবা বলে 'খোদার কসম এরূপ নয়'। অর্থাৎ কথার রেশ বজায় রাখার জন্যে শব্দটি এসে পড়ে অথচ অন্তরে কসম করার নিয়ত থাকে না। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, 'অর্থহীন কসম হলো সেগুলো যে কসম-গুলো কথা বলতে গিয়ে মানুষের মুখ থেকে বের হয়ে পড়ে। এসবের উপর কাফ্ফারা নাই। আরও বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি অনুসন্ধানের পর কোন বিষয়ে কসম করে অতঃপর সে বিষয়টি সেরূপ না হয় তবে এ কসমটি অর্থহীন হিসেবে গণ্য হবে। অন্য একখানি হাদীসে আছে, একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি তীর নিক্ষেপকারী দলের নিকটে গিয়ে দণ্ডায়মান হলেন। দলের লোকেরা তখন তীর নিক্ষেপ করছিলেন। এক ব্যক্তি তখন বলছিলো, "আল্লাহ্র কসম! তার তীর লক্ষ্যবস্তুতে লাগবে"। আবার বলছিলো, "আল্লাহ্র কসম! সে লক্ষ্যভ্রষ্ট করবে"। তখন একজন সাহাবী আরজ করলেন,

"দেখুন হে আল্লাহর রসূল! তীর তার কসমের বিরুদ্ধে গেছে"। তখন তিনি এরশাদ করলেন, "এসব কসম অর্থহীন, এর দরুণ কাফ্ফারা দিতে হয় না এবং এর জন্যে কোন শাস্তি বা আযাব হয় না"।

তবে এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, অধিক কসম করা একটি মকরূহ কাজ এবং অধিক কসম করা মানে আল্লাহ্র নিয়মানুযায়ী যা-কিছু ঘটে থাকে তার চেয়ে বেশী কিছু ঘটাতে চেষ্টা করা। এমন ব্যক্তি নেককার হতে পারে না এবং সমাজের বিষয়াদি মীমাংসার ব্যাপারেও সে নির্ভরযোগ্য হতে পারেনা। ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করেন যে, (এ আয়াত থেকে) একথাও প্রমাণিত হয়, যে ব্যক্তি কোন নেক কাজ থেকে বিরত থাকার জন্যে কসম করে তার উচিত যেন এ কসমকে নেক কাজে বাধার বস্তু না বানায়; বরং কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা দিয়ে দেয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেন যে, এ আয়াত হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি কসম করেছিলেন যে তিনি কখনও মুস্তেহের উপকার করবেন না, কারণ সে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর উপর অকারণে অপবাদ দিয়েছিল।[১]

وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"আর আল্লাহ্ পাক সর্ব শ্রোতা, সর্ব-জ্ঞাত"।

তিনি তোমাদের কসম সমূহ শ্রবণ করেন এবং তোমাদের নিয়ত সমূহ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। অথবা এর অর্থ একথাও হতে পারে যে, আল্লাহ্র নামে যারা শপথ গ্রহণ করে আল্লাহ্ পাক সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। আর কেউ যদি আল্লাহ্র ভয়ে এমন শপথ পরিহার করে তথা এমন শপথ করা থেকে বিরত থাকে তা-ও আল্লাহ্ পাকের অজানা থাকে না। অতএব, গোপন ও প্রকাশ্য সকল অবস্থায় সদা সতর্ক, সজাগ, সচেতন থাকাই প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ

"আল্লাহ্ পাক তোমাদের বাজে শপথ সমূহ সম্পর্কে ধর-পাকড় করবেন না"।

কোন প্রকার নিয়ত বা ইচ্ছা ব্যতীত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভ্যাসের কারণে যখন শপথ বাক্য উচ্চারিত হয় তখন তাকে 'লগ্ব' কসম তথা বাজে শপথ বলা হয়। যেহেতু এ শপথের সঙ্গে অন্তরের কোন সম্পর্ক নেই তাই এমনি শপথের কোন কাফ্ফারা বা প্রতিবিধানও নেই। উল্লেখ্য, যদি কেউ নিজের বক্তব্যকে জোরালো করতে আল্লাহ্ পাকের নামে শপথ গ্রহণ করে তবে এমন শপথ ভঙ্গ করলে অবশ্যই কাফ্ফারা

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮১-৮২
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭৩

দিতে হবে। এমনিভাবে যদি কেউ মনে মনে কোন শপথ গ্রহণ করে পরে তার বিরোধিতা করে এমন অবস্থায়ও কাফ্ফারা দিতে হবে। এজন্যে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

"কিন্তু তোমাদের অন্তর সমূহ যে সংকল্প গ্রহণ করেছে তজ্জন্যে তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন"।

وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ

"এবং আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ এবং অতীব সহনশীল"।

তাঁর এই ক্ষমা পরায়ণতা এবং সহনশীলতার কারণে তিনি তোমাদের বাজে শপথের জন্যে পাকড়াও করেন না, তোমাদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন না এবং বন্দা মাত্রকে আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে আত্মোন্নতি লাভের সুযোগ দান করেন। এটি তাঁর দয়া-মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কসমের প্রকারভেদ

তফসীরকারগণ বলেছেন, কসম বা শপথ তিন প্রকার (১) কোন কথাকে মিথ্যা জানা সত্বেও তাকে সত্য বলে শপথ করা। ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে এমন শপথের ব্যাপারে কাফ্ফারা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। হানাফী মাজহাবে এমন শপথে গুনাহ্ রয়েছে তবে কাফ্ফারা নেই। (২) কোন বিষয়ে এ সংকল্প প্রকাশ করা যে আমি এ কাজটি অবশ্যই করবো বা করবো না। আর নিজের ইচ্ছাকে জোরদার করে প্রকাশ করতে আল্লাহ্র নামের কসম করা। যদি এমন কাজ করা হয় তবে ভাল। পক্ষান্তরে যদি সংকল্প অনুযায়ী কাজ না করা হয় তবে অবশ্যই কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে। এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত। (৩) লগ্ব বা বাজে শপথঃ যে-শপথের ক্ষেত্রে অন্তরে আদৌ ইচ্ছা বা সংকল্প থাকে না; বরং অভ্যাস বশতঃ সাধারণতঃ এমন শপথ করা হয় এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে এমনি শপথে কোন পাকড়াও হবে না। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা।[১]

পিতা-মাতার নামে কসম

শপথ বা কসমের ব্যাপারে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের নিষেধ করেছেন তোমাদের পিতা-

(১) খোলাতাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬

মাতার নামে শপথ করতে। যার শপথ করা একান্ত প্রয়োজন হয় সে যেন আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে অথবা নীরব থাকে (হাদীসের সকল কিতাব)।

হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে তিনি বলেন, "আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি– "যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অপর কারো নামে শপথ করলো সে শের্‌ক করলো"। (তিরমিযী শরীফ)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন– তোমরা পিতা, পিতামহ, মাতা এবং মূর্তি সমূহের নামে কোন অবস্থাতেই শপথ করো না। আর আল্লাহ্‌র নামেও শপথ করো না তবে হ্যাঁ যদি তোমরা সত্যবাদী হও (আবু দাউদ শরীফ ও নাসায়ী শরীফ)।

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ

অর্থাৎ ঃ যারা স্ত্রীদের (কাছে যাওয়ার) ব্যাপারে কসম করে বসে তাদেরকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে।

কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করবে না বলে শপথ করে তবে তার জন্যে চার মাস অবসর মঞ্জুর করা হলো। যদি সে এই সময়ের মধ্যে তার স্ত্রীর নিকট গমন করে তবে তার বিবাহ অব্যাহত থাকবে, কিন্তু তাকে কসম ভঙ্গের জন্যে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। পক্ষান্তরে যদি চার মাসের এ মেয়াদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মিলন না ঘটে এবং চার মাস অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তাদের বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে। উল্লেখ্য, ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেন, ঈলা হলো বর্বতার যুগের তালাক। হযরত সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব (রঃ) বলেন যে, ঈলা ছিল জাহেলিয়াত যুগের একটি অত্যাচার। যখন স্ত্রীর সাথে কারো ভালবাসা থাকতো না এবং সে চাইতো না যে তার স্ত্রীকে অন্য কেউ বিবাহ করুক তখন সে এমন কসম করে বসতো। ফলে স্ত্রীলোকটি স্বামীও পেতো না এবং তালাকও প্রাপ্ত হতো না, তার জীবন এভাবেই অতিবাহিত হতো। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এ নিয়মকে অনুসরণ করা হতো। অতঃপর ইসলাম এমন অবস্থায় সময় সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১]

ঈলা ঃ স্ত্রীর সাথে সহবাস না করার জন্যে যে কসম করা হয় তাকে ঈলা বলে। এমন কসমের দু' টি পর্যায় আছে। (১) চার মাসের কম সময়ের জন্যে কসম করা অথবা (২) চার মাসের অধিক সময় নির্ধারিত করে কসম করা। যদি চার মাসের কম সময়ের জন্যে কসম করে থাকে তবে সে সময় পর্যন্ত স্ত্রী ছবর করবে এবং উল্লিখিত সময় শেষ হওয়ার পর স্ত্রী তার সাথে মিলিত হবার জন্যে স্বামীর কাছে দাবী করতে পারবে। বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একবার এক মাসের জন্যে এমন কসম করেছিলেন।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৪৭৯-৮০

অতঃপর তিনি উনত্রিশ দিন পৃথক থাকার পর এরশাদ করেন ঃ উনত্রিশ দিনেও এক মাসের সময়-সীমা শেষ হয়ে থাকে। আর যদি চার মাসের অধিক সময়ের জন্যে কসম করে থাকে তবে চার মাস পূর্ণ হওয়ার পর স্ত্রী তার স্বামীর কাছে এ দাবী করার অধিকার প্রাপ্ত হবে যে হয় সে তার

সাথে মেলা-মেশা করবে নয়তো তালাক দেবে। এ সময় বিচারক এ দুটি কাজের মধ্যে যে-কোন একটি করতে স্বামীকে বাধ্য করবে যাতে স্ত্রী ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।[১]

এখানে চার মাসের যে-সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, এ চার মাসের সাথে স্ত্রীলোকদের অবস্থার একটি সম্পর্ক রয়ে গেছে। 'মুআত্তায়ে ইমাম মালেকে' হযরত আবদুল্লাহ্ বিন দীনার (রাঃ) বর্ণিত একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। এ ঘটনাটি ফেকাহ্ শাস্ত্রবিদগণ প্রসঙ্গক্রমে প্রায়ই উল্লেখ করে থাকেন। হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণতঃ রাতে মদীনা শরীফের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। এক রাতে তিনি যখন এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন হঠাৎ নারী কণ্ঠের আওয়ায শ্রবণ করলেন। একজন মহিলা তার প্রবাসী স্বামীর বিরহে করুণ ভাবে কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। "এই কালো এবং দীর্ঘ রাতগুলোতে আমার স্বামী ঘরে নেই, যার সাথে আমি কথা বলতাম এবং হাসতাম। আল্লাহ্র কসম! যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তবে এ রাতে আমার খাটের পায়া নড়তে থাকতো"। এ কবিতা শ্রবণের পর হযরত ওমর (রাঃ) তৎক্ষণাৎ তাঁর কন্যা উম্মুল মোমেনীন হযরত হাফছা (রাঃ)-এর কাছে ছুটে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, "বল দেখি স্ত্রীলোকেরা উর্দ্ধে কতদিন পর্যন্ত স্বামীর বিরহে সবর করতে পারে"। হযরত হাফছা (রাঃ) জবাব দিলেন, "ছয় অথবা চার মাস"। তখন হযরত ওমর (রাঃ) বললেন, "এখন থেকে আমি হুকুম জারি করে দেব যে, মুসলমান মুজাহেদগণ যেন এ সময় সীমার অধিক সফরে অবস্থান না করে"।[২]

فَإِنْ فَآءُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয় তবে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল। স্ত্রী সহবাস না করার কসমের বিষয়টি আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করবেন কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। শুধু তাই নয়, বরং তিনি দয়াবানও কেননা, তিনি প্রবর্তন করেছেন কসম ভঙ্গের কাফ্ফারার বিধান। এটি তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।[৩]

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ

"আর যদি তালাক দেয়ারই সিদ্ধান্ত নেয় তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখো যে, আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত"।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৩
(২) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৪
(৩) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ৩১

আলোচ্য আয়াত সমূহে দুটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ যদি কেউ স্ত্রী সহবাস করবে না বলে শপথ করে তবে তার জন্যে দুটি পন্থা রয়েছে (১) হয় চার মাসের মধ্যে সে স্ত্রীর সংসর্গে গমন করবে, (২) অন্যথায় তালাক হবে। অবশ্য যদি ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে যেমন সফরে থাকার কারণে অথবা অসুস্থ হওয়ার কারণে স্ত্রী-সহবাস সম্ভব না হয় তবে অন্ততঃ মৌখিকভাবে সদিচ্ছার কথা প্রকাশ করলেও তালাক হবে না। যখন বিশেষ অসুবিধা বা ওজর দূর হবে তখন স্ত্রী সংসর্গে গমন করবে এবং কাফ্ফারা আদায় করবে।

তালাকের প্রকারভেদ

তালাক তিন প্রকার ঃ

(১) "রেজয়ী" এক অথবা দু' তালাক দেয়া। "রেজয়ী" তালাকের ইদ্দতকালে স্বামী তার স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করতে পারে এতে মোহরানার দাবী আদায়ও করতে হবে না, পুনঃ বিবাহেরও কোন প্রয়োজন হবে না।

(২) "তালাকে বাইয়্যেনাহ' এতে স্ত্রীর সাথে আর সম্পর্ক থাকে না, তবে উভয় পক্ষ একমত হলে নতুন করে বিবাহ হতে পারে।

(৩) "মোগাল্লাজাহ" অর্থাৎ তিন তালাক দিয়ে দেয়া, এতে হালালাহ ব্যতীত দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয় না অর্থাৎ ইদ্দত শেষ হওয়ার পর অন্যের সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়, সেই স্বামীর সাথে মিলন হওয়ার পর সে স্বেচ্ছায় তালাক দেবে, এরপর পুনরায় ইদ্দত অতিবাহিত হবে। এরপর ইচ্ছা করলে পূর্ব স্বামীর সাথে বিবাহ হতে পারে (এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবে দ্রষ্টব্য)।[১]

وَالْمُطَلَّقٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ

অর্থাৎ তালাক প্রাপ্তির পর স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেনা, বরং তাকে তিন হায়েয বা ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এর কারণ হলো গর্ভ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া। একজনের সন্তান যেন আরেকজনের না হয়, তার জন্যে এটি একটি বাস্তব ব্যবস্থা।

আল্লামা ওসমানী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন ঃ বস্তুতঃ স্ত্রীর অবশ্য কর্তব্য হলো তার প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা। যদি সে অন্তসত্ত্বা হয় তবে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত, আর যদি তা না হয় তবে তার ইদ্দত হবে তিন হায়েয।

আল্লামা ওসমানী (রঃ) আরও লিখেছেনঃ আলোচ্য আয়াতে শুধু সেই স্ত্রীলোকদেরই উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে, যাদের হায়েয হয়, যারা কারো বাঁদীও নয়। এর কারণ এই, যদি বিবাহের পর স্বামী-

(১) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৪৫

স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই তালাক প্রদান করা হয়, এমন স্ত্রীলোকদের ইদ্দত পালন করতে হয় না। এতদ্ব্যতীত বার্ধক্যের কারণে অথবা নিতান্ত অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে যদি কোন স্ত্রীলোকের হায়েয না হয় তবে তার ইদ্দত হলো তিন মাস।

আর অন্তস্বত্ত্বা স্ত্রীলোকের ইদ্দত হলো প্রসব কাল পর্যন্ত। এর পাশাপাশি স্ত্রী যদি কারো বাঁদী হয় আর তার হায়েযও হয়, তবে এমন স্ত্রীলোকের ইদ্দত হয় দুই হায়েয। আর এমন স্ত্রীলোকের যদি বার্ধক্যের কারণে অথবা অল্প বয়স্ক হওয়ার কারণে হায়েয না হয়, তবে তার ইদ্দত হবে দু' মাস।[১]

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

অর্থাৎ কোন স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পর স্বামী যদি তাকে পুনরায় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এবং দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর ভাবে ও উত্তমরূপে যাপনের অঙ্গীকার করে তবে পুনর্বার গ্রহণের ব্যাপারে স্বামীর অগ্রাধিকার রয়েছে। পক্ষান্তরে, উত্তমরূপে জীবন যাপনের জন্যে নয়, বরং পূর্বের চেয়েও বেশী নির্যাতন উৎপীড়নের লক্ষ্যে যদি পুনরায় গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয় তবে তা হবে জুলুম।

এ পর্যায়ে পবিত্র কোরআনে মানুষকে তার দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনের আহ্বান জানিয়ে ঘোষণা করেছেঃ

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ

অর্থাৎ স্ত্রীর উপর স্বামীর যেমন হক্ব বা অধিকার রয়েছে, তেমনি স্বামীর উপরও স্ত্রীর হক্ব বা দাবী রয়েছে।

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যে দায়িত্ব বা হক্ব রয়েছে তা সঠিকভাবে যদি আদায় করা হয়, তবে দাম্পত্য জীবনে আসে সুখ শান্তি। অতএব, স্বামীকে আল্লাহ্ পাক যে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছেন তাকে আল্লাহ্ পাকের দান হিসেবে গ্রহণ করতে হবে এবং স্ত্রীর প্রতি যথাযথ ভাবে দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে তাগিদ করে এরশাদ করেছেন ঃ

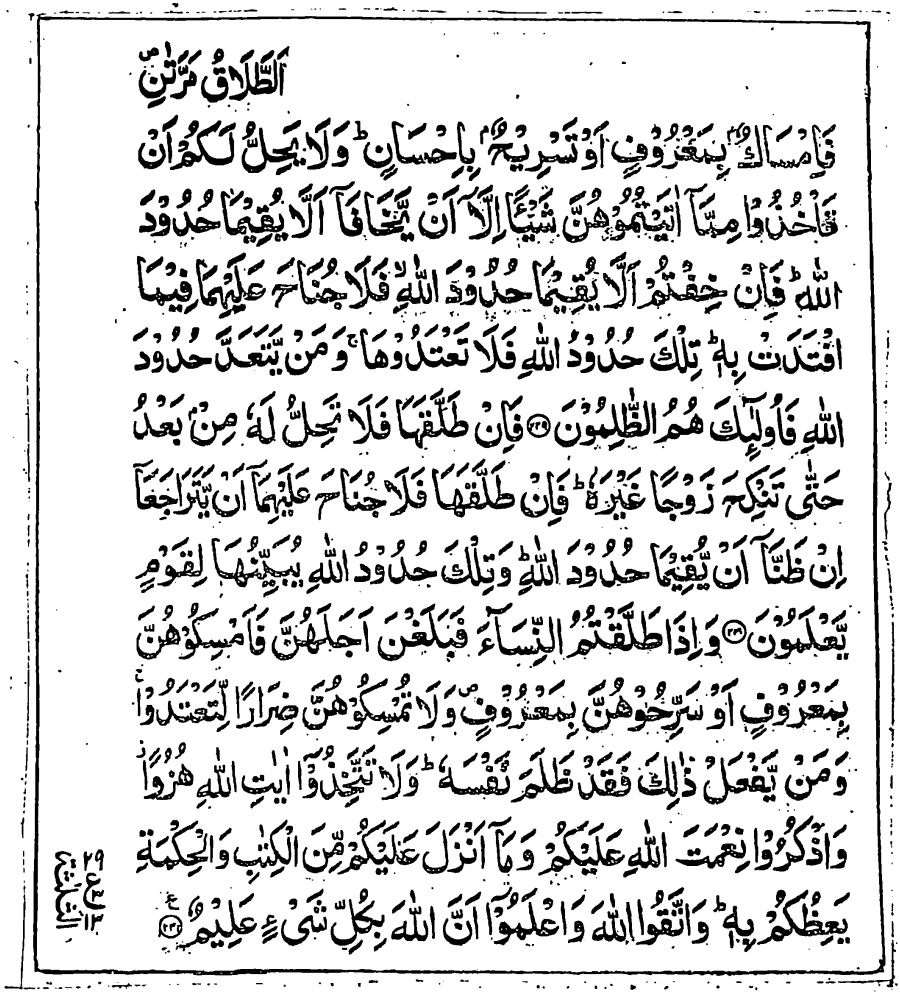
خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلى

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি যে তার পরিবারবর্গের সাথে ভাল ব্যবহার করে আর আমি তোমাদের চেয়ে অধিকতর ভাল ব্যবহার করি আমার পরিবারবর্গের সাথে।

অন্য একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জেনে রাখো, তোমাদের অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের প্রতি আর তাদেরও

(১) খোলাসাতুত্তাফাসীর খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৪

অধিকার রয়েছে তোমাদের প্রতি। তাদের প্রতি তোমাদের অধিকার হলো তোমাদের বিছানায় তারা অন্য কোন লোককে স্থান দেবে না, সতীত্ব রক্ষা করে চলবে এবং তোমাদের প্রতি অনুগত থাকবে। আর তোমাদের প্রতি তাদের হক্ব হলো তোমরা তাদের ভরণ-পোষণের উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।



اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ
فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ ؕ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ
تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ
اللّٰهِ ؕ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا
افْتَدَتْ بِهٖ ؕ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ
اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۲۲۹﴾ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ؕ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ
اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿۲۳۰﴾ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ
بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ ۪ وَّلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوْا ۚ
وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ؕ وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا ۠
وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتٰبِ وَالْحِكْمَةِ
يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ﴿۲۳۱﴾ ع ۲۹ ۱۲

তরজমা

(২২৯) এ তালাক দু'বার পর্যন্ত অতঃপর নিয়ম মাফিক রাখবে অথবা সদয় ভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্যে বৈধ নয় যে, তোমরা স্ত্রীদেরকে যা প্রদান করেছিলে তা থেকে কোন কিছুও গ্রহণ কর। অবশ্য যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই ভয় করে যে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ তারা ঠিক রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে তারা আল্লাহ্ পাকের হুকুম বজায় রাখতে পারবেনা, তবে স্ত্রী যদি কোন

কিছুর বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করে নিতে ইচ্ছুক হয়, তাতে উভয়ের কোন গুনাহ নাই। এসব আল্লাহ পাকের বিধান। অতএব, তা লংঘন করোনা এবং যারা আল্লাহ পাকের সীমা লংঘন করে, তারাই অত্যাচারী।

(২৩০) অতঃপর যদি কেউ স্ত্রীকে (তৃতীয়বার) তালাক দেয় তবে অন্য কোন স্বামীর সাথে সম্মিলিত না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সেই স্বামীর জন্যে হালাল নয়, পরে যদি কেউ স্ত্রীকে তালাক দেয় এবং তারা উভয়ে মনে করে যে আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ পালন করতে পারবে তবে তাদের পনঃমিলনে কোন পাপ নেই। আর এসবই আল্লাহ নির্ধারিত সীমা। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যেই এসব সুস্পষ্ট ভাবে তিনি বর্ণনা করে থাকেন।

(২৩১) আর যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, পরে তারা ইদ্দত পূর্ণ করে তখন তাদেরকে নিয়ম মোতাবেক রাখ, অথবা উত্তমভাবে বিদায় করে দাও, আর তাদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে আবদ্ধ রেখোনা এবং যে ব্যক্তি এরূপ কাজ করে সে নিজের প্রতিই অত্যাচার করে, আর আল্লাহ পাকের নিদর্শন সমূহকে উপহাস করোনা, আর তোমাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ রয়েছে তা স্মরণ কর এবং তোমাদের নসিহতের উদ্দেশে তিনি যে কিতাব ও জ্ঞান তোমাদের নিকট নাজিল করেছেন তা-ও স্মরণ কর এবং আল্লাহ পাককে ভয় কর, জেনে রাখ যে, আল্লাহ পাক সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল রয়েছেন।

তফসীরুল কোরআন

ইসলাম শান্তির ধর্ম। এ শান্তি সকলের জন্যে সমভাবে ইসলামের কাম্য কেননা, বিশ্ব-মানবের সার্বিক কল্যাণের এক নিখুঁত, পরিপূর্ণ এবং সময়োপযোগী নীল-নকশা নিয়ে এসেছে ইসলাম। ইসলাম যে সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করে তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো সকলের প্রতি সুবিচার। এ সমাজ-ব্যবস্থায় জালেমের অস্তিত্ব অসহনীয়। ফলে মজলুমের অস্তিত্ব অচিন্তনীয়।

একথা সর্বজন-বিদিত যে ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে তথা বর্বরতার যুগে নারী সমাজ ছিল সর্বাধিক মজলুম বা উৎপীড়িত, অবহেলিত, উপেক্ষিত। এ উৎপীড়িত নারী সমাজের সার্বিক উন্নতির বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণ করেছে ইসলাম। বর্বরতার যুগে নারী সমাজকে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করা হতো। একাধিক তালাক দেয়ার পর ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ করা হতো। দু' একদিন পরই পুনরায় তালাক দেয়া হতো। অতঃপর পুনরায় ইদ্দত অতিবাহিত করতে হতো। এভাবে নারী সমাজের দুর্বিষহ জীবন অব্যাহত থাকতো। তখন এ মজলুমদের ফরিয়াদ শ্রবণের জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিল না। এমনি অবস্থায় ইসলামই সর্ব প্রথম নারী সমাজের দুর্দশা লাঘবের কথা এ আয়াতে ঘোষণা করলো যে, স্ত্রীকে দু' বার পর্যন্ত তালাক দেয়ার পর তাকে পুনরায় গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু যদি কেউ তিন তালাক দিয়ে দেয় তবে অন্যত্র বিবাহের পর স্বেচ্ছায় স্বামী তালাক দেবে, এরপর ইদ্দত পূর্ণ করে পুনরায় সাবেক স্বামীর সঙ্গে

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। আলোচ্য আয়াতে মজলুম নারী সমাজের দুর্দশা লাঘবের কথা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন ঃ

তালাকের আহ্কাম ও মাসায়েল ঃ

পূর্বেই বলা হয়েছে, প্রাক-ইসলামী যুগে এ নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, স্বামী যতবার ইচ্ছা স্ত্রীকে তালাক দিতে পারতো এবং ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার 'রুজু' করতে পারতো। ফলে স্ত্রীলোকদের জীবনে এক চরম সংকটজনক অবস্থা বিরাজ করছিল। কারণ তালাক দেয়ার পর ইদ্দত শেষ হওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে রুজু করা এবং আবার তালাক দেয়ার ফলে স্ত্রীলোকটি স্বামীর কবল থেকে মুক্তও হতে পারতো না পুনরায় স্বামীর সান্নিধ্য থেকেও বঞ্চিত হতো। এভাবে যখন অত্যাচার করা হচ্ছিল তখন ইসলাম এসে তালাকের একটি সীমা নির্ধারিত করে দিল যে, 'রুজু' শুধু মাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় তালাকের পরেই হতে পারে। তৃতীয় তালাকের পর আর 'রুজু' করা চলবে না। আবু দাউদ শরীফের একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে তিন তালাকের পর 'রুজু' করার নিয়ম রহিত হয়েছে। অপর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)ও একথা বলেন। এবনে আবি হাতেমে আছে যে, একবার এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বললো যে, "আমি তোমাকে ছাড়বোও না আবার তোমার সাথে বসবাসও করবো না"। স্ত্রী বললো, "এটা আবার কি করে সম্ভব"? লোকটি বললো, "প্রথমে তালাক দেব এবং যখন ইদ্দত শেষ হওয়ার সময় আসবে তখন আবার 'রুজু' করে নেবো। জীবন-ভর এমন করতে থাকবো"। স্ত্রীলোকটি তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে তার দুঃখের কথা বলে কাঁদতে লাগলো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর থেকে তালাক সম্পর্কে মানুষের ধারণা পাল্টে যায় এবং তারা সংযত হয়ে পড়ে। কারণ তৃতীয় তালাক দেয়ার পর স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার অধিকার স্বামীর আর থাকলো না। স্ত্রীর সংশোধনের জন্যে দু' বার মাত্র তালাক দিয়ে তাকে ইদ্দত থাকতেই পুনরায় ফিরিয়ে নিতে পার। আবার ফিরিয়ে না নিয়ে ইদ্দত শেষ হতে দিতেও পার যাতে নতুন করে পুনরায় বিবাহ করার উপযোগী হয়।

আর যদি তৃতীয় বার তালাক দিতে চাও তবে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে তাদের তালাক দিয়ে বিদায় দাও। অর্থাৎ তার কোন হক্ব নষ্ট করো না। তার প্রতি কোন প্রকার জুলুম করোনা অথবা তার কোন ক্ষতি করো না।

এক ব্যক্তি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করলেন যে, "এ আয়াতে দু' তালাকের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু তৃতীয় তালাকটির কথা কোথায় উল্লেখ আছে"? তিনি এরশাদ করলেন ঃ

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

"অথবা সুন্দর আচরণের মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া"।

একথায় যখন তৃতীয় তালাক প্রদানের ইচ্ছা হয় তখন যেন স্ত্রী নিজের হক্ব ছেড়ে দিয়ে তালাক চেয়ে নিতে বাধ্য হয়। এমনি চাপ সৃষ্টি করা স্বামীর জন্যে হারাম। এর প্রমাণ অন্যত্র এভাবে রয়েছে ঃ

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ

"তাদেরকে যা দিয়েছ সেগুলো ফেরত পাওয়ার জন্যে তাদেরকে বিরক্ত করোনা"।

তবে স্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছায় কিছু প্রদান করার মাধ্যমে তালাক দাবী করে তবে তা স্বতন্ত্র ব্যাপার যেমন এরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

"যদি স্ত্রীলোকেরা নিজের খুশীতে কিছু ছেড়ে দেয় তবে তা তোমাদের জন্যে হালাল এবং ভালো হিসেবে গণ্য হবে"।

যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ বেড়ে যায় এবং স্ত্রী স্বামীর উপর সন্তুষ্ট হতে না পারে এবং স্বামীর হক্ব আদায় করতে পারে না তখন যদি স্ত্রী স্বামীকে কিছু প্রদান করার মাধ্যমে স্বামীর নিকট থেকে তালাক গ্রহণ করে তবে সেই দেয়া-নেয়ার মধ্যে কোন গুনাহ্ নেই। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক চাওয়া স্ত্রীর জন্যে কঠিন গুনাহ্র কাজ। তিরমিজী শরীফে এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে আছে, যে স্ত্রীলোক বিনা কারণে স্বামীর নিকট তালাক দাবী করে তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত হারাম হয়ে যায়। অথচ অন্য একখানি হাদীসে আছে জান্নাতের সুগন্ধ চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়। অপর একখানি বর্ণনায় আছে যে, এরূপ স্ত্রীলোক মুনাফেক। অধিকাংশ ইমামের মতে 'খোলা' (স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু প্রদান পূর্বক স্বামীর কাছ থেকে তালাক লাভ) শুধুমাত্র সে অবস্থায় হতে পারে যখন অবাধ্যতা এবং উচ্ছৃংখলতা স্ত্রীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। স্বামী কেবলমাত্র তখন স্ত্রীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ (ফেদিয়া) নিয়ে সে স্ত্রীকে ছাড়তে পারবে। কোরআনে পাকের এ আয়াতে একথা বলা হয়েছে। এ অবস্থা ব্যতীত অন্য কোন পরিস্থিতিতে ঐরূপ নেয়া জায়েয হবে না। বরং ইমাম মালেক (রঃ) বলেন ঃ যে স্ত্রীলোকদেরকে কষ্ট দিয়ে তাদের 'হক্ব' ছেড়ে দিতে বাধ্য করে তাদের কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করে থাকলে তা ফেরত দেয়া ফরজ।

শানে নুযুল

মুআত্তায়ে ইমাম মালেকে (রঃ) আছে যে, হাবীবা বিনতে সহ্‌ল ছিলেন ছাবেত বিন কায়েস বিন শামস (রাঃ)-এর স্ত্রী। একদিন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন ফজরের নামাযের উদ্দেশে বের হয়েছিলেন তখন অন্ধকারের মধ্যে দেখতে পেলেন যে দরজার কাছে হযরত হাবীবা (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এখানে"? জবাব এলো, "আমি হাবীবা বিনতে সহল"। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি"? হাবীবা (রাঃ) আরজ করলেন হে আল্লাহ্‌র রসূল! ছাবেত বিন কায়েসের ঘরে আর থাকতে পারি না, হয় সে না হয় আমি পৃথক হয়ে যাই"। তিনি একথা শুনে নীরব হয়ে গেলেন।

অতঃপর যখন হযরত ছাবেত (রাঃ) আগমন করলেন তখন তিনি এরশাদ করলেন, "তোমার স্ত্রী কিছু একটা বলতে চায়"। হযরত হাবীবা (রাঃ) আরজ করলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমার স্বামী যা কিছু আমাকে দিয়েছেন সব আমার কাছে রয়েছে, আমি সেগুলো ফেরত দিতে চাই"। তিনি হযরত ছাবেতকে নির্দেশ করলেন, "ঐসব নিয়ে যাও"। সুতরাং তিনি সবকিছু ফেরত নিলেন। এভাবে হযরত হাবীবা (রাঃ) মুক্ত হতে পারলেন।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত ছাবেত (রাঃ) স্ত্রীকে প্রহার করেছিলেন এবং সেই প্রহারের কারণে একটি হাত ভেঙ্গে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন তাঁকে ঐ সকল সম্পদ ফেরত নিতে নির্দেশ করলেন তখন তিনি আরজ করলেন, "আমি কি এ সম্পদ ফেরত নিতে পারি"? তিনি এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ"। তখন হযরত ছাবেত (রাঃ) আরজ করলেন,"আমি তাকে দুটি বাগান দিয়েছি, সেগুলো ফেরত দেয়া হোক। সুতরাং মোহরানা বাবদ দেয়া সেই দুটি বাগান তাকে ফেরত দেয়া হলো। এভাবে তাঁদের সম্পর্ক-ছেদ ঘটলো।

অপর একটি বর্ণনা এভাবে আছে যে, হযরত হাবীবা (রাঃ) একথাও বলেছিলেন যে, "আমি তাঁর চরিত্র এবং তাঁর দ্বীনী ব্যাপারে কোন দোষ ধরতে চাই না। তবে আমি ইসলামের মধ্যে কুফরী পছন্দ করি না"। সুতরাং সম্পদ গ্রহণ করে হযরত ছাবেত (রাঃ) তালাক দিয়ে দিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় তাঁকে জামীলা নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

একথাও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছিলেন, "ক্রোধ এবং অত্যাচার এখন আর আমার বরদাশ্‌ত করার শক্তি নেই"। আরও বর্ণিত আছে, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, "তুমি যা দিয়েছো শুধু তাই নাও, অতিরিক্ত নিও না"। অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, "সে দেখতেও সুন্দর নয়"।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, ইনি হযরত আবদুল্লাহ বিন উবাইয়ের (রাঃ) বোন ছিলেন এবং এটিই ইসলামের সর্ব প্রথম খোলা (তালাক) ছিল।

এ ঘটনার আরেকটি কারণ এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত হাবীবা (রাঃ) বলেছিলেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমি একবার যখন তাঁবুর পর্দা সরালাম তখন দেখলাম যে, আমার স্বামী কয়েকজন লোকের সঙ্গে এদিকে আসছেন। সবগুলো লোকের মধ্যে তাঁকেই শুধু সবচেয়ে কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত দেখা গেলো"।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন এরশাদ করেছিলেন, "তার বাগান তাকে ফেরত দাও"। হযরত হাবীবা (রাঃ) তখন বলেছিলেন "আপনি যদি নির্দেশ করেন তবে আমি এর চেয়েও বেশী কিছু দিতে প্রস্তুত আছি"।

আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত হাবীবা (রাঃ) একথা বলেছিলেন- "হে আল্লাহর রসূল! যদি আল্লাহ্‌র ভয় না থাকতো তাহলে আমি ওর মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম"।

অধিকাংশ আলেমের মতে, খোলা তালাকের বেলায় স্বামী যদি স্ত্রীকে দেয়া সম্পদের চেয়ে অধিক নেয় তবু জায়েয হবে। কারণ কোরআনে পাকে রয়েছেঃ

فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ

"এ দেয়া-নেয়ার মধ্যে কোন গুনাহ নেই যা দিয়ে স্ত্রী নিজেকে ছাড়িয়ে নেবে"।[১]

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ

অর্থাৎ দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যত বিধি-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে- এসবই আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত সীমা, আল্লাহ পাক প্রদত্ত বিধি-নিষেধ পালনের মাধ্যমে তাঁর নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সকলকে অবশ্যই থাকতে হবে। পক্ষান্তরে যারা এ সীমা লংঘন করবে তথা আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অমান্য করবে তারা জালেম বলে বিবেচিত হবে। আর এ জুলুমের পরিণাম তাদের নিজেদেরই ভোগ করতে হবে। উল্লেখ্য, পারিবারিক জীবনে শান্তি শৃংখলা থাকলেই সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির কথা চিন্তা করা যায়।

এজন্যে পবিত্র কোরআন জাতীয় জীবনের বৃহত্তর অঙ্গনে অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি লাভের জন্যে উন্নত ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে। জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে যদি আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের বিধান মেনে চলার অভ্যাস না করা হয়, আল্লাহ পাককে ভয় করে এবং তাঁর রহমতের আশা করে আল্লাহর বিধি-নিষেধের সঠিক অনুসরণ না করা হয় তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইসলামী সংবিধানের বাস্তবায়নের কথা চিন্তাও করা যায় না।

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৮৭-৮৮

এ কারণেই পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক পারিবারিক জীবনকে সুন্দরতর করে গড়ে তোলার তাগিদ করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের সম্পর্কের উপরই নির্ভর করছে পারিবারিক জীবনের শান্তি শৃংখলা। এজন্যেই বিষয়টির উপর এত গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনে বিস্তারিত ভাবে বিধি-নিষিধ বর্ণিত হয়েছে। নমুনা স্বরূপ এখানে কয়েকটি বিধানের উদ্ধৃতি দেয়া হচ্ছে।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কার?

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ط فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ط وَالّٰتِىْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ج فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا (সূরা নেছা)

পুরুষগণ নারীদের উপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, যেহেতু আল্লাহ্ পাক তাদের একের উপর অন্যকে (অর্থাৎ নারীর উপর পুরুষকে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং যেহেতু পুরুষগণ নারীদের উপর তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে থাকেন অতএব, স্ত্রীগণ তাদের স্বামীগণের অত্যন্ত অনুগত। তাদের অনুপস্থিতিতে যা হেফাজতের জন্যে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ তার হেফাজতকারী। আর তোমরা যে সমস্ত নারীদের আনুগত্যহীনতা সম্বন্ধে ভয় কর তবে তাদেরকে প্রথম নসিহত কর, অতঃপর তাদেরকে বিছানা থেকে দূরে রাখ এবং (পরে প্রয়োজন হলে) তাদেরকে দৈহিক শাস্তি দাও, অতঃপর তারা যদি তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অন্য পথ অনুসন্ধান করো না (অর্থাৎ শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্য হলো তাদেরকে অনুগত করা, যদি তারা অনুগত হয়, তবে তাদের সম্বন্ধে বিকল্প পথের কথা চিন্তা করোনা; বরং সম্পর্ক যেন ভাল হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহার কর)। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, সর্বশ্রেষ্ঠ।

আরও এরশাদ হয়েছেঃ

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (সূরা বাকারা)

এবং নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা রয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ পাক ক্ষমতাবান, বিজ্ঞানময়। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তিনি মানুষকে একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদা দান করে থাকেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাবান, তিনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, অধিকতর মর্যাদার অধিকারী কে? কে আনুগত্য লাভের অধিকারী? আর কে অনুগত হওয়ার উপযুক্ত, তিনি এ সমস্ত বিচার করেই উপরোক্ত আদেশ দিয়েছেন।

নারী পুরুষ উভয়ের অধিকার

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ (সূরা বাকারা)

নারীদের উপর যেমন পুরুষদের অধিকার রয়েছে, ঠিক এভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে (অর্থাৎ উভয়ের উপরই উভয়ের অধিকার রয়েছে)। নারীদের উপর পুরুষদের যেমন সমস্ত বৈধ অধিকার রয়েছে, ঠিক এমনিভাবে পুরুষদের কাছে নারীদেরও বহু কিছু চাওয়ার এবং পাওয়ার আছে। অতএব, অধিকারের ব্যাপারে উভয়েই উভয়ের নিকট সমান।

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوْا ط وَلِلنِّسَآءِ نَصِيْبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ط

وَاسْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا (সূরা নেছা)

"পুরুষদের কৃতকর্মের জন্যে তাদের সওয়াবের অংশ রয়েছে এবং নারীদের কৃতকর্মের জন্যে রয়েছে তাদের অংশ। এবং আল্লাহ্ পাকের নিকট তাঁর দান চাও। নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে অবগত আছেন"।

কেউ ব্যাভিচারী হলে

وَالَّذٰنِ يَاْتِيٰنِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوْهُمَا ج فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا الرَّحِيْمًا (সূরা নেছা)

"এবং তোমাদের মধ্যে যে দু' জন ব্যাভিচার করেছে, তাদেরকে (শরীয়তের নির্দিষ্ট) শাস্তি প্রদান কর। অতঃপর যদি তারা তওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে তবে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করোনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান (তাঁর দরবারে যদি কেউ সঠিকভাবে তওবা করে তবে তিনি তা কবুল করে থাকেন)"।

আমলের ব্যাপারে পার্থক্য নাই

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَآ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ج (সূরা আলে-এমরান)

অর্থাৎ অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের দোয়া কবুল করেছেন (এবং ঘোষণা করেছেন) তোমাদের মধ্যে কি পুরুষ কি নারী যে কেউ সৎ কাজ করবে, আমি তার কাজ বিনষ্ট করব না। তোমরা একে অন্য থেকে অর্থাৎ তোমাদের মূল কেন্দ্র বিন্দু হলো আদম (আঃ)। তাঁর সন্তান হিসাবে তোমরা একে অন্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং নারী পুরুষের মধ্যে আমলের ব্যাপারে কোন পার্থক্য নেই। তোমাদের মধ্যে যে কেউ সৎ কাজ করবে, তার যথোচিত মর্যাদা এবং বিনিময় দেয়া হবে। কারো কোন নেক আমল আল্লাহ্ পাকের দরবারে বিনষ্ট হয় না; বরং প্রত্যেকটি নেক কাজেরই উপযুক্ত বিনিময় আল্লাহ্ পাকদান করে থাকেন।

স্ত্রী অপছন্দ হলে

فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا (সূরা নেছা)

"অতঃপর যদি তোমরা স্ত্রীগণকে (কোন কারণে) অপছন্দ কর তবে (এমনও হতে পারে যে) হয়তো তোমরা একটি বস্তুকে অপছন্দ কর আর আল্লাহ্ পাক তার মধ্যে বহু কল্যাণ রেখেছেন (অতএব, সবর করা উচিত, হয়তো আল্লাহ্ পাক যাকে অপছন্দ করা হয়েছে সেই ভাগ্যবতীর কারণে অপছন্দকারীকে সুখী করবেন)।

দ্বিতীয় বিবাহ্ করলে

وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَّاٰتَيْتُمْ اِحْدٰىهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَاْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا ط اَتَاْخُذُوْنَهٗ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا (সূরা নেছা)

"আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর স্থলে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে চাও এবং তাদের একজনকে অগাধ অর্থ দিয়ে থাক তবে তা থেকে কিছুই ফেরত নিও না। তোমরা কি কোন অপবাদ আরোপ করে বা প্রকাশ্যে অন্যায় কথা বলে তা ফেরত নেবে"?

একাধিক স্ত্রী হলে

وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ط وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (সূরা নেছা)

"আর তোমরা যতই ইচ্ছা কর না কেন একাধিক স্ত্রীগণের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবে না, তবু একজনের দিকে সম্পূর্ণ ভাবে ঝুঁকে পড়োনা এবং অন্যকে এমন ভাবে ছেড়ে দিওনা যেন ঝুলন্ত রয়েছে এবং পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব করে দাও এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর। তবে নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক ক্ষমাশীল অত্যন্ত দয়াবান"।

একাধিক বিবাহের শর্ত

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ط ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ط (সূরা নেছা)

"তবে যদি তোমাদের ভয় হয় যে, একাধিক স্ত্রীর মধ্যে ন্যায়-বিচার করতে পারবে না তবে এক স্ত্রী রাখাই উত্তম অথবা তোমাদের বাঁদীগণ"।

(অর্থাৎ যদি সমান আচরণ করতে পার তবে একাধিক বিবাহ বৈধ তবে যদি তেমন করতে পারবে না বলে ভয় হয় তবে এক স্ত্রীর উপর ধৈর্য ধারণই শ্রেয় আর এ পথেই তোমরা জুলুম-অত্যাচার অবিচার থেকে আত্মরক্ষা করতে পার। এ ব্যাপারে এটিই নিকটতর পথ।)

পরস্পরে মত বিরোধ হলে

وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهٖ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا ج اِنْ يُّرِيْدَآ اِصْلَاحًا يُّوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا خَبِيْرًا (সূরা নেছা)

"আর তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মত বিরোধের ভয় কর তবে একজন বিচারক স্বামীর পক্ষ থেকে আরেক জন বিচারক স্ত্রীর পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট কর, যদি তারা উভয়ে সংশোধনের ইচ্ছা করে তবে আল্লাহ্ পাক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তার তওফিক দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, সর্ব বিষয় অবগত"।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতবিরোধ এমনকি কলহ-দ্বন্দ্ব পর্যন্ত হয়ে থাকে এজন্যে উভয় পক্ষ থেকেই একজন করে বিচারক নির্দিষ্ট কর, যদি তাদের পুনঃ মিলনের ইচ্ছা থাকে তবে আল্লাহ্ পাক তওফিক দেবেন। আর যেহেতু আল্লাহ্ পাক মহাজ্ঞানী, সব বিষয়ে অবগত এজন্যে তিনি খুব ভাল ভাবেই অবগত আছেন যে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নত করার ইচ্ছা কার আছে এবং কার নেই। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِنِ امْرَءَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ط وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ ط وَاِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

(সূরা নেছা)

"আর কোন স্ত্রী যদি স্বামীর অত্যাচার বা বিমুখ হওয়াকে ভয় করে তবে এতে কোন গুনাহ্ নেই যে তারা একটা মীমাংসা করে নেয় এবং মীমাংসা (সর্বাবস্থাতেই) উত্তম কাজ। এবং প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে অল্প বিস্তর কৃপণতা আছেই আর যদি একে অন্যের সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর (তবে তাই উত্তম ব্যবস্থা। মূলতঃ একে অন্যের জন্যে ত্যাগের পরিচয় দিলে পরস্পর পরস্পরের সুখ-শান্তি, সুযোগ-সুবিধার প্রতি লক্ষ্য করলেই ঘরে আসে শান্তি, দূরীভূত হয় কলহ-দ্বন্দ্ব। আর যেখানে প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্যে উদগ্রীব হয় সেখানেই আসে অশান্তি, অনৈক্য, দুঃখ-ব্যথা, বেদনা, এমনকি জুলুম অত্যাচার অতঃপর ভাঙ্গন। তাই আল্লাহ্ পাক এ আয়াতে পরস্পরের সদ্ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন) নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের কার্যাবলী সন্ধন্ধে সম্পূর্ণ অবগত রয়েছেন (তিনি তোমাদের প্রত্যেককে তার আমলের সওয়াব দান করবেন)"।

وَاِنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّٰهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهٖ ط وَكَانَ اللّٰهُ وَاسِعًا حَكِيْمًا

(সূরা নেছা)

"আর যদি (স্বামী স্ত্রীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মীমাংসা না হয়) তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে, তবে আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ দানে একে অন্যকে পরস্পরের মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্তি দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ পাক উদার, বিজ্ঞানময়"।

যেভাবে পবিত্র কোরআনে পারিবারিক জীবনের বিভিন্ন অবস্থার পেক্ষিতে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের বিধি-নিষেধ, তেমনি স্বামী-স্ত্রীর কর্তব্য সম্পর্কে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও বিশেষ সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন ঃ যে নারী এমন অবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয় যে, তার প্রতি তার স্বামী থাকে সন্তুষ্ট তবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও

এরশাদ করেছেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায কবুল হয় নাঃ

(১) যে গোলাম মালিকের বাড়ী থেকে পলায়ন করে।

(২) যে ব্যক্তি মদ মত্ত থাকে।

(৩) যে স্ত্রীলোকের প্রতি তার স্বামী অসন্তুষ্ট। (মেশকাত শরীফ)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ

যে স্ত্রীলোক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, রমজানের রোজা রাখে, সতীত্ব রক্ষা করে, স্বামীর অনুগত থাকে, তাকে বেহেশতের যে কোন দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতে আহ্বান জানানো হবে।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ যদি কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ডাকে তখন সে যে কাজেই থাকুক না কেন, স্বামীর ডাকে সাড়া দেয়া এবং তার নিকট অনতিবিলম্বে হাযির হওয়া একান্ত কর্তব্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরও এরশাদ করেছেন ঃ যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে কষ্ট দেয়, এমন অবস্থায় সে ব্যক্তির জন্যে সংরক্ষিত বেহেশতী হুরগণ সেই স্ত্রীলোকটিকে অভিশাপ দিয়ে বলে- "তোমার ধ্বংস হোক তাকে কষ্ট দিও না। সে-তো তোমার নিকট কয়েক দিনের মেহমান, অদূর ভবিষ্যতে সে তোমাকে ছেড়ে আমাদের নিকট চলে আসবে"।

একবার একজন সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ উত্তম নারী কে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যার প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই স্বামী আনন্দিত হয়।

এমনিভাবে স্বামীকে তার কর্তব্য পালনের তাগিদ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবেচয়ে বেশী উত্তম যে তার স্ত্রীর সাথে সবচেয়ে বেশী ভালো ব্যবহার করে। (মেশকাত শরীফ)

তিনি আরও এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যার স্ত্রীর সাথে যে যত বেশী ভাল ব্যবহার করবে তার ঈমানের পরিপূর্ণতা তত বেশী প্রমাণিত হবে। তোমরা দু' দল মানুষের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, (১) নারী (২) এতীম অর্থাৎ এদের হক্ব আদায় কর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ মানুষকে আনন্দ দিতে পারে এমন বস্তু দ্বারা পৃথিবী পরিপূর্ণ কিন্তু সর্বাধিক আনন্দদায়ক বস্তু হলো একজ ন পরহেযগার সতী স্ত্রী। (কানজুল উম্মাল)

ইসলামে নারী সমাজের মর্যাদা কত বেশী তা এই হাদীস সমূহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

এতদ্ব্যতীত স্বামী ও স্ত্রীর প্রতি পরস্পরের যে কর্তব্য রয়েছে তারও তাগিদ রয়েছে উপরোল্লিখিত আয়াত ও হাদীস সমূহে।

পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের সাফল্যের জন্যে এ কর্তব্য পালন পূর্ব শর্ত। এ কর্তব্য সমূহ যথাযথ ভাবে পালন না করলে অশান্তি, অকল্যাণ অবশ্যম্ভাবী এমনকি,

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনাও অনস্বীকার্য। এমনি অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েই দেয় তখন যা করণীয় তার নির্দেশ রয়েছে। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে ঃ

যদি তিন তালাক দেয়া হয়

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ط فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللّٰهِ ط وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অতঃপর স্বামী যদি স্ত্রীকে তৃতীয় তালাক দেয় তবে অন্য লোকের সাথে বিবাহ দেয়া ব্যতীত সেই স্ত্রী (প্রথম) স্বামীর জন্যে হালাল নয়। পরে যখন (দ্বিতীয় স্বামী সহবাসের পর) স্ত্রীকে তালাক দেয় তখন তারা যদি এ ধারণা করে যে, আল্লাহ পাকের সীমার ভেতর থাকতে পারবে (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ অনুযায়ী জীবন যাপন করতে পারবে) তবে উভয়ে পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তাদের কোন গুনাহ নাই। এসব আল্লাহ্ পাকের সীমা সমূহ, আল্লাহ পাক এমন সমাজের জন্যে তা বর্ণনা করেন যারা বোঝার শক্তি রাখে।

স্ত্রীকে তিন তালাক দিলে তাকে পুনঃ বরণ করে নেয়ার জন্যে একমাত্র বৈধ ব্যবস্থা হলো "হালালাহ" করা অর্থাৎ অন্য স্বামীর নিকট নিয়মিত বিবাহ দেয়া এবং তাদের মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার পর তালাক দিলে পুনরায় নতুন করে বিবাহ হতে পারে ইদ্দত অতিবাহিত করার পর প্রথম স্বামীর সাথে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, তিন তালাকের পরও যদি স্ত্রী স্বামীর নিকট গমন করতে ইচ্ছুক হয় তবে পাঁচটি কাজ অবশ্যই করতে হবে। প্রথমে–

(১) তিন মাসের ইদ্দত অতিবাহিত করতে হবে।

(২) দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ হতে হবে।

(৩) দ্বিতীয় স্বামীর সাথে শুধু নামে মাত্র বিবাহ হলে চলবে না; বরং তার সাথে যথারীতি সহবাস হতে হবে।

(৪) দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক তাকে তালাক দিতে হবে। এ তালাকের জন্যে পুনরায় ইদ্দত অতিবাহিত করতে হবে।

(৫) পুনরায় প্রথম স্বামীর সাথে নিয়মিত ভাবে বিবাহ হতে হবে।[১]

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১০৪

অত্যন্ত অপছন্দনীয় বৈধ কাজ

মূলতঃ ইসলামের দৃষ্টিতে তালাক অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ। কথায় কথায় যেন স্বামী-স্ত্রীকে তালাক না দেয় আর যদি তালাক দেয়ার প্রয়োজন হয় তবে প্রথমে রেজয়ী তালাক দিয়ে স্ত্রীকে সতর্ক করা উচিত।

তিন তালাক দেয়ার পূর্বে শতবার চিন্তা করা উচিত আর যদি কেউ তিন তালাক দিয়েই ফেলে, তখন এ স্ত্রীকে ফেরত আনার জন্যে তাকে অবশ্যই চড়া মূল্য দিতে হবে আর তা হলো 'হালালাহ' করার বিধান।

বর্তমান যুগে একদিকে মানুষ নারী স্বাধীনতার নামে ইসলামী শরীয়তের পরিপন্থী অনেক কাজ করে তার শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ আজ নারী নির্যাতনের ভয়াবহ বিপদ প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হচ্ছে। অন্যায়, অশ্লীল কাজ, ব্যাভিচার-অবিচার, হত্যা প্রভৃতি অহরহ হচ্ছে। নৈতিক অবক্ষয় প্রলয়ংকরী বন্যার রূপ ধারণ করেছে। এ থেকে আত্মরক্ষার একটি মাত্র পন্থা হলো পবিত্র কোরআনের বিধি-নিষেধ যথাযথভাবে পালন করা। নারীকে নারীই থাকতে হবে। তাকে পুরুষের ভূমিকায় হাযির করলে নারী জাতির অবমাননা করা হবে। মায়ের জাতিকে তার যোগ্য মর্যাদা দেয়ার শিক্ষাই দিয়েছে পবিত্র কোরআন। এ শিক্ষার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই শুধু নারী নির্যাতনের পথ বন্ধ হতে পারে, নারীর মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকতে পারে।

ইসলাম নারী নির্যাতন বন্ধ করার এবং নারী জাতির হক্ব আদায় করার প্রতি কতখানি গুরুত্বারোপ করে তা পরবর্তী আয়াত সমূহ দ্বারা সহজেই অনুমান করা যায়। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, বর্বরতার যুগে নারী-নির্যাতনের একটি পন্থা হিসেবে লোকেরা স্ত্রীকে তালাক দিত, ইদ্দত শেষ হওয়ার মুহূর্তে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করতো, পুনরায় তালাক দিত, পুনরায় ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে গ্রহণ করতো। এ অন্যায় আচরণ পরিহার করার তাগিদ করে আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।[১]

এরশাদ হয়েছে ঃ আর যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও এবং তারা ইদ্দত পূর্ণ করে, তখন তাদেরকে সঠিকভাবে নিয়ম মাফিক আপন করে রাখ, অথবা উত্তমভাবে বিদায় কর, খবরদার! তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার করার লক্ষ্যে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তাদেরকে আটকে রেখো না, এটি মানবতা বিরোধী কাজ। যে এমন অন্যায় আচরণ করবে সে নিজেরই ক্ষতি করবে, নিজের প্রতিই সে জুলুম করবে কেননা, এমন অন্যায়-আচরণের কঠিন শাস্তি তাকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে।

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৬

আলোচ্য আয়াতের তফসীরে ইমাম এবনে জরীর তাবারী (রঃ) লিখেছেন ঃ সাবেত এবনে ইয়াসার নামক এক ব্যক্তি তার স্ত্রীক তালাক দেয়। ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার দু' বা তিন দিন পূর্বে স্ত্রীকে পুনঃ গ্রহণ করে।

এরপর পুনরায় তালাক দেয়, সে তার স্ত্রীকে ৯ মাস যাবত এভাবে ঝুলিয়ে রাখে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।[১]

وَلَا تُمْسِكُوْهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

অর্থাৎ স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশে তার প্রতি জুলুম করার লক্ষ্যে তাকে আটকে রেখোনা।

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اٰيٰتِ اللّٰهِ هُزُوًا

"আর আল্লাহর আদেশকে বিদ্রুপ করোনা"।

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের প্রতি যে বিধি-নিষেধ জারী করেছেন তা পালনে অবহেলা করোনা, আল্লাহ্ পাকের আদেশ হলো স্ত্রীকে নিয়ম মাফিক রাখো অথবা উত্তমভাবে বিদায় কর, কিন্তু রাখবেও না আবার বিদায়ও করবে না, শুধু তাকে কষ্ট দেবে, এ দৃশ্য মর্মন্তুদ, অসহনীয়, বর্জনীয়, এর পরিণাম হবে অবশ্যই শোচনীয়, শুধু তাই নয়, বরং এমন কাজ মূলত ঃ আল্লাহ্ পাকের বিধানকে বিদ্রুপ করার শামিল।[২]

কোন কোন তফসীরকার এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ প্রাক-ইসলামী যুগে লোকেরা প্রথম তালাক দিত, এরপর বলতো, আসলে তালাক দেইনি, এমনিই বিদ্রুপ করলাম। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে এবং এ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ ইতোপূর্বে এমন হতো স্বামী তার স্ত্রীকে বলতো আমি তোমাকে তালাক দিলাম। অতঃপর বলতো মূলতঃ আমি রসিকতা করে বলছি। তখন এ আয়াত নাযিল হয়েছে।[৩]

হযরত আব হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তিনটি বস্তু এমন, যদি কেউ বিদ্রুপ ও রসিকতা করে বলুক অথবা বাস্তবিকই বলুক, সকল অবস্থায় তা হয়ে যাবে। (১) বিবাহ (২) তালাক (৩) তালাক থেকে রুজু করা।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ

(১) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯০
(২) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১৬
(৩) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯২

অর্থাৎ তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাক যে নেয়ামত দান করেছেন তা স্মরণ করো, আল্লাহ্ পাক তোমাদের হেদায়েত করেছেন, হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উম্মত ভুক্ত করেছেন, তাঁর প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন, এতদ্বারা আল্লাহ্ পাক তোমাদের নসিহত করেন।

অতএব, তোমরা আল্লাহ্ পাককে ভয় কর, তাঁর বিধি-নিষেধ পালন কর, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ কর, তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়োনা, তাঁর অবাধ্য হয়োনা, তাঁর নেয়ামতের অসদ্ব্যবহার করোনা। মনে রেখ, আল্লাহ্ পাক তোমাদের জীবনের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত।

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَ
اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

তরজমা

(২৩২) আর যখন তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে তালাক দাও, আর তারা ইদ্দত পূর্ণ করে তখন যদি তারা নিয়ম-মাফিক পরস্পর সম্মত হয়, তবে তাদেরকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে বাধা দিও না, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছ, তাদেরকে এতদ্বারা উপদেশ প্রদান করা হচ্ছে। এটি তোমাদের জন্যে সর্বোত্তম এবং পবিত্রমত পন্থা, এবং আল্লাহ পাক জানেন, তোমরা জান না।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুজুল

হযরত মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ)-এর ভগ্নি জুমলা বিনতে ইয়াসার সম্পর্কে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। স্বামী বাদাহ এবনে আসেম তাঁকে তালাক দেয়। যখন ইদ্দত পূর্ণ হয় তখন সে লজ্জিত হয়ে পুনরায় বিবাহের পয়গাম নিয়ে হাযির হয়। তখন মা'কাল এবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেনঃ আমি তোমার সাথে আমার ভগ্নির বিবাহ দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি তালাক দিয়েছ, আল্লাহ্র শপথ! এখন আর তোমার গৃহে আমার ভগ্নি যাবে না। এদিকে জুমলা বিনতে ইয়াসারের ইচ্ছা ছিল সাবেক স্বামীর গৃহে

ফিরে যাবার, এমনি অবস্থায় এ আয়াত নাযিল হয়। এ সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মা'কাল (রাঃ)-কে ডাক দিয়ে তাঁর সম্মুখে এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন। এ আয়াত শ্রবণ করা মাত্র হযরত মা'কাল (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহ! আমি রাযী হয়েছি, আমি তোমার আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছি। অতঃপর স্বীয় ভগ্নিকে সাবেক স্বামীর সঙ্গে পুনরায় বিয়ে দিলেন।[১] বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ এবং সাদী প্রমুখ বর্ণনা করেন ঃ এ আয়াত হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তিনি তাঁর চাচাতো বোনকে বিয়ে দিয়েছিলেন, কিছুদিন পর স্বামী তাকে তালাক দেয়। যখন ইদ্দত শেষ হয়ে আসলো তখন ঐ স্বামীই পুনরায় হাযির হলো কিন্তু হযরত যাবের (রাঃ) সাবেক স্বামীর নিকট পুনরায় বিবাহ দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তখন আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়।[২]

এ আয়াতে আত্মীয়-স্বজনের প্রতি নির্দেশ রয়েছে, যদি স্বামী স্ত্রী পুনঃমিলনে প্রস্তুত হয় তবে তোমরা তাতে বাধা দিও না। স্ত্রীলোকদের মতামত এবং তাদের কল্যাণ সাধনের প্রতি গুরুত্বারোপ কর। তোমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার প্রতি নজর দিও না।

যেহেতু এ আয়াতে বিশেষভাবে স্ত্রীলোকদের অভিভাবকদের প্রতি সম্বোধন করা হয়েছে তাই তাদের তথা সকল আত্মীয়-স্বজনের একটি বিরাট দায়িত্ব হলো স্ত্রী-লোকদের যোগ্য ও সঠিক পাত্রে বিবাহের ব্যবস্থা করা। এ পর্যায়ে নিজের ভাবাবেগকে প্রশ্রয় না দেয়া। পূর্বের স্বামীর সাথে পুনঃমিলনে যদি উভয়ে সম্মত হয় তবে তারও ব্যবস্থা করা। এ পর্যায়ে এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কোন নারী যদি এমন স্থানে বিয়ের জন্যে ইচ্ছুক হয় যা তার কুফু নয় অথবা শরীয়ত নির্দেশিত নিয়ম কানুন বিরোধী বিবাহে আগ্রহী হয় বা প্রথম স্বামীর ইদ্দত পূর্ণ হবার পূর্বেই অন্য কোথাও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে আগ্রহী হয়, এমন অবস্থায় তাকে বাধা দেয়ার অধিকার অভিভাবকদের অবশ্যই থাকবে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন ঃ

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো কোন স্ত্রীলোক নিজে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারেনা (কেননা আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রীর পুনঃমিলনে বাধা না দেয়ার জন্যে অভিভাবকদের প্রতি নির্দেশ জারী করা হয়েছে)। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এ বক্তব্যের সমর্থনে এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন ঃ বিবাহ একজন পথ-প্রদর্শক ও দু' জন সাক্ষী ব্যতীত হয় না।[৩]

আল্লামা আবদুল হক্ব সাহেব (রঃ) তাঁর তফসীরে হক্কানীতে এ আয়াত সম্পর্কে লিখেছেন ঃ কেউ কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে, তালাকের ন্যায় একটি মন্দ এবং

(১) তফসীরে কবীর খন্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা ৫১৭
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৩
তফসীরে হক্কানী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯৮
(২) তফসীরে তাবারী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২৯৮
(৩) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯২

নিন্দনীয় কাজের অনুমতি ইসলামী শরীয়ত কিভাবে দিয়েছে? এর জবাব এই, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তালাক অত্যন্ত ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ। হাদীস শরীফেও তালাককে অত্যন্ত অপছন্দনীয় কাজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথা এরশাদ করেছেন ঃ "যে স্ত্রীলোক নিতান্ত প্রয়োজন ব্যতীত তালাক চায় তার প্রতি জান্নাতের সুগন্ধ হারাম"।

কিন্তু একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, স্বামী স্ত্রীকে সারা জীবন একাত্ম হয়ে অতিবাহিত করতে হয়, এর মধ্যে একজন আরেকজনের মেজাজ মোতাবেক না হওয়া অস্বাভাবিক নয়, এমনি অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে তালাকের পন্থা অবলম্বনের অনুমতি ইসলামী শরীয়ত দিয়েছে। তবে ইহুদীদের ন্যায় কথায় কথায় তালাকের বিধান ইসলামে কাম্য নয়, আর খৃষ্টানদের ন্যায় একজনকে আরেকজন থেকে পৃথক করার তথা পরিত্রাণ পাওয়ার পথ থাকবে না, এমন অযৌক্তিক পন্থা ইসলাম সমর্থন করে না, বরং উভয় চরম পন্থার মাঝামাঝি পথ অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে গরমিল হয় তবে স্বামীকে প্রথমত ঃ সবর অবলম্বনের তা'লীম দেয়া হয়েছে কেননা, স্ত্রীর মধ্যে একটি দোষ থাকলে আরেকটি গুণও আছে। অতএব, স্ত্রীকে আদর সোহাগ দিয়ে, এহসানের নীতি অবলম্বন করে উদারতা, মহানুভবতার পরিচয় দিয়ে তাকে আপন করার পথ নির্দেশ করেছে ইসলাম।

ذٰلِكَ يُوْعَظُ

বস্তুত ঃ যারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান লাভে ধন্য হয়, যারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তারাই এ-নসীহতের দ্বারা উপকৃত হতে পারে কেননা, যারা এ কথার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে যে, অবশেষে আমাকে একদিন এ পৃথিবী চিরকালের তরে ছেড়ে যেতে হবে এবং পরকালে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জন্যে জবাবদেহী করতে হবে। এ জীবনে নেক কাজ করলে তার পুরষ্কার আমি পাব, পক্ষান্তরে মন্দ কাজ করলে তার শাস্তি অবশ্যই আমাকে ভোগ করতে হবে। একথার উপর বিশ্বাসই মানুষকে নেক আমলে উদ্বুদ্ধ করে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে। এ ঈমান বা বিশ্বাস যার যত বেশী সুদৃঢ় হবে জীবন তার তত বেশী পবিত্র হবে।

পক্ষান্তরে, আল্লাহ্ পাকের প্রতি ও আখেরাতের প্রতি যাদের ঈমান নেই তাদের পক্ষে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত মূল্যবান নসীহত সমূহ দ্বারা উপকৃত হওয়া সম্ভব হয় না।

ذٰلِكُمْ

উপরোক্ত আয়াতে এরশাদ হয়েছে, তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোক যদি ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পর নিজের স্বামীর সাথে পুনঃমিলনে রাজী থাকে তবে তাতে তোমরা বাধা দিওনা, এ পন্থাই হলো পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী পুনরায় একত্রিত হতে চাইলেও আত্মীয়-স্বজন জেদের বশবর্তী হয়ে তাতে বাধা সৃষ্টি করে এবং অন্যত্র

বিবাহের ব্যবস্থা করতে চায়, তাতে যে পবিত্রতা নেই একথা তারা জানে না, তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক তোমাদের মনের কথা জানেন এবং তোমাদের কল্যাণ কোন্ পথে রয়েছে তা-ও তিনি জানেন, তোমরা জান না। অতএব, আল্লাহ্ পাকের বিধান মেনে চলো, তাঁর অবাধ্য হয়ো না।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ؕ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا ۚ
لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌ ۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذٰلِكَ ۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ؕ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٢٣٣﴾

তরজমা

(২৩৩) মাতাগণ দু' বছর পর্যন্ত তাদের সন্তানদের স্তন্য দান করবে, যদি কেউ দুধের মেয়াদ পূর্ণ করতে ইচ্ছুক হয়। নিয়ম মোতাবেক উক্ত স্ত্রীলোকদের ভরণ পোষণ দেয়া সন্তানের পিতার কর্তব্য। কোন ব্যক্তিকেই তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেয়া যায় না। মাতাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যেতে পারে না এবং পিতাকে তার সন্তানের জন্যে কষ্ট দেয়া যেতে পারে না এবং ওয়ারিশের উপরও একই প্রকার দায়িত্ব রয়েছে। তবে যদি তারা পরস্পর পরামর্শ করে এবং উভয়ে সম্মত হয়ে দুগ্ধ পান বন্ধ করাতে চায় তবে তাতে গুনাহ নেই। এবং যদি তোমরা শিশুদেরকে (অন্য ধাত্রীর সাহায্যে) দুগ্ধ পান করাতে চাও তবে তাতেও কোন গুনাহ্ নাই, যদি তোমরা নিয়ম মোতাবেক তাদেরকে কিছু প্রদান কর এবং আল্লাহ পাককে ভয় করতে থাক, আর জেনে রাখ যে, আল্লাহ্ পাক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।

তফসীরুল কোরআন

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন মানব জাতিকে আশরাফুল মাখ্লুকাত বা অভিজাত সৃষ্টি বলে ঘোষণা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করার পর তার লালন-পালনের যাবতীয় ব্যবস্থা তিনিই করেন। একটি নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাকের রবুবিয়্যাত বা লালন-পালনের ব্যবস্থা সমূহ অলৌকিক ভাবে কার্যকর হতে দেখা যায়। শিশুর মাতার বক্ষে আল্লাহ্ পাক দয়া করে তাঁর নবাগত বন্দার জন্যে এক অসাধারণ পন্থায় দুগ্ধ সৃষ্টি করেন যা হালকা মিষ্টি। ঠাণ্ডাও নয় এবং অতি গরমও নয়, বরং নবজাত শিশুর নাজুক অবস্থা মোতাবেক উষ্ণ। শিশু যখনই তৃষ্ণার্ত বা ক্ষুধার্ত হয় তখনই আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলমীনের পক্ষ থেকে তা শিশুকে সরবরাহ করা হয়। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ জননীগণ দু' বছর কাল পর্যন্ত তাদের স্তন্য দান করবে।

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ

এ আয়াতে শিশুদেরকে তাদের মাতাদর সঙ্গে সম্পর্কিত করে বর্ণনা করার কারণ এই, যাতে করে মাতাগণ তাদের শিশুদের প্রতি অধিক পরিমাণে দরদী হয়ে তাদেরকে স্তন্য দান করে। এ আদেশ অত্যাবশ্যকীয়। কিন্তু মাতা অসুস্থতার কারণে স্তন্য দানে অপরাগ হলে, সেক্ষেত্রে এ আদেশ রহিত। তাই অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেন ঃ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

কোন জননীকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেয়া যেতে পারে না। এজন্যেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে স্বামী তার স্ত্রীকে শিশুর স্তন্য দানের জন্যে বেতনভুক শ্রমিক রূপে ব্যবহার করতে পারে না তথা এটি শরীয়ত মোতাবেক বৈধ নয় কেননা, শিশুকে স্তন্য দান করা তার মায়ের একান্ত কর্তব্য। এ কর্তব্য শরীয়ত এবং সামাজিক উভয় দিক থেকেই আরোপিত। মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-মায়া যা শিশুর জন্যে সে অনুভব করে তা সত্ত্বেও যদি সে শিশুকে স্তন্য দান করতে না পারে তবে তাকে 'মাজুর' গণ্য করা হবে। কিন্তু যদি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে স্তন্য দানে প্রস্তুত হয় তবে সে-যে স্তন্য দানে সক্ষম তা প্রমাণ হয়ে যাবে এবং শিশুকে স্তন্য দান করা মা হিসাবে তার প্রতি ওয়াজিব বলে এর বিনিময়ে কোন মূল্য গ্রহণ করা জায়েয হবে না।

প্রশ্ন হতে হতে পারে, যদি তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে তার ইদ্দত পূর্ণ করার পর শিশুকে স্তন্য দানের কথা বলা হয় তখনও কি পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অবৈধ হবে? এর জবাবে বলা হয়, এমন অবস্থায় পারিশ্রমিক গ্রহণ করা অবশ্যই অবৈধ হবে না কেননা, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক এর অনুমতি দান করেছেন। এরশাদ হয়েছে ঃ

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"যদি তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীগণ তোমাদের জন্যে শিশুদেরকে স্তন্য দান করে তবে তাদের পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"।

যেহেতু তালাকের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক প্রকার শত্রুতা এবং পরস্পরের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে এমন সময় যখন স্ত্রী অন্য কোথাও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক হয় তখন শিশুর প্রতি আকর্ষণ পূর্বের অনুপাতে কমে যায়। বিশেষ করে এ উদ্দেশেও এ ভাবনার অবতারণা হয় যে তালাকদাতা স্বামী যেন নবজাত শিশুর প্রতিপালনে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ক্ষেত্র বিশেষে পিতাও চায় যে তার শিশু সন্তানকে তালাক প্রাপ্ত স্ত্রী থেকে ছিনিয়ে নেয়। যাতে করে মাতা থেকে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করে স্ত্রীকে রিবহ-জ্বালা সইতে বাধ্য করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন শিশুর প্রতি দয়া করে সুস্পষ্ট ভাষায় আলোচ্য আয়াতে এ বিধান ঘোষণা করেছেন যে, জননীগণ দু' বছর যাবত তাদের সন্তানকে স্তন্য দান করবে। আর সন্তানের পিতার কর্তব্য হলো স্ত্রীলোকদের খোর-পোষের দায়িত্ব নিয়ম মাফিক পালন করবে। সন্তানের কারণে মাতাকে বা পিতাকে কষ্ট দেয়া যাবে না। শিশুকে তার মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া যাবে না, অথবা নিয়ম-নীতি মোতাবেক যে খোরপোষ দেয়া কর্তব্য তাতে অবহেলা করা যাবে না। এমনিভাবে পিতাকে মাতার খোর-পোষের জন্যে তার সামর্থের অতিরিক্ত খোর-পোষ দাবী করা যাবে না। অথবা শিশুকে তার পিতার নিকট দায়িত্বহীন ভাবে ফেলে চলে যাওয়া যাবে না। যদি শিশুর পিতা জীবিত না থাকে তবে ওয়ারিশদের প্রতিও এ দায়িত্ব অর্পিত হবে।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি শিশুর প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবে তারই দায়িত্ব হবে শিশুর দুগ্ধ পানের সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের। আর যদি উত্তরাধিকারী একাধিক হয় তবে তাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ মীরাছের অংশ মোতাবেক শিশুর জন্যে ব্যয় ভার গ্রহণ করতে হবে।

এ আয়াতের তফসীরে মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) লিখেছেন ঃ

শিশুকে স্তন্য দান করানোর ব্যাপারে মাতা অধিক হক্বদার। মাতা বলতে সন্তান প্রসবকারীণীকে বোঝানো হয়েছে, নানী বা দাদী নয়। সুতরাং স্বামীর সাথে বিবাহ-বন্ধন অবশিষ্ট থাকুক বা না থাকুক জন্মদাত্রী মায়ের চাইতে অধিক উপযোগী স্তন্য দানকারিণী আর কেউ হতে পারে না। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানীগণও এ ব্যাপারে একমত হতে বাধ্য হয়েছেন।[১]

(১) তফসীরে হক্কানী পারা ২, পৃষ্ঠা ৯০
তফসীরে মাজেদী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯৩

শিশুকে স্তন্য দানের সময় সীমা

এ আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন যে, শিশুকে মায়েরা দু' বছর কাল পর্যন্ত স্তন্য দান করবে।

অর্থাৎ এ সময় সীমা শেষ হওয়ার পর স্তন্য পান করার হুকুম প্রমাণিত হচ্ছে না এবং নিষিদ্ধ হওয়ার কথাও প্রমাণিত হচ্ছে না।[১]

যদিও অন্যান্য ইমামের মতে স্তন্য দানের সময় সীমা দু' বছর কিন্তু হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে ত্রিশ মাস। কোরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের আলোকে শিশুর দুর্বলতার প্রেক্ষিতে ইমাম ছাহেব (রঃ) এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইমাম মালেক (রাঃ)-এর মতে দু' বছর দু' মাস। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে দু' বছর তিন মাস। স্তন্য পানের মেয়াদ ত্রিশ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর শিশুকে মাতৃ-দুগ্ধ পান করানো নিষিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন সকল ইমাম।

فَاِنْ اَرَادَ فِصَالًا

অর্থাৎ যদি শিশুর মাতা-পিতা পরস্পর পরামর্শ এবং সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে স্তন্য দানের নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যেই স্তন্য দান বন্ধ করা হবে, তবে তাতে গুনাহ নেই। স্তন্যদান বন্ধ করার ব্যাপারটির উদ্দেশ্য হতে হবে সন্তানের মঙ্গল কামনা।

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْا

অর্থাৎ তোমরা যদি কোন প্রকার কল্যাণ লাভের আশায় মাতা ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীলোকের স্তন্য দান করাতে ইচ্ছা কর তবে তাতেও কোন পাপ নাই।

وَاتَّقُوا اللّٰهَ

আর তোমরা আল্লাহ্কে ভয় করতে থাক। তোমাদের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের হাতে। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক কেননা , আল্লাহ পাক সবকিছুই জানেন, তিনি সব বিষয়ে ওয়াকেফহাল। তিনি সর্বজ্ঞাত, যদি তোমরা আল্লাহ পাকের প্রদত্ত বিধানের বরখেলাফ কিছু কর তার শাস্তি অবধারিত, পরিণাম অবশ্যম্ভাবী।

---

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দূ) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৩

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ
اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ
اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۭ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهٖ
مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاۗءِ اَوْ اَكْنَنْتُمْ فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ
سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلٰكِنْ لَّا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا اِلَّآ اَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا
مَّعْرُوْفًا ۬ وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰبُ اَجَلَهٗ ۭ
وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ ع ۱۴
اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

তরজমা

(২৩৪) এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় স্ত্রী রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, উক্ত স্ত্রীগণ নিজেদেরকে চার মাস দশ দিন পর্যন্ত বিবাহ থেকে বারণ রাখবে। অতঃপর যখন তাদের ইদ্দত পূর্ণ হবে তখন তারা নিজেদের সম্বন্ধে দস্তুর মোতাবেক যা কিছু করবে তাতে তোমাদের কোন অপরাধ হবে না, এবং আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল।

(২৩৫) এবং তোমরা উক্ত স্ত্রীলোকদের নিকট আভাসে ইঙ্গিতে যদি বিবাহের প্রস্তাব কর অথবা অন্তরে গোপন রাখ তবে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ নেই। আল্লাহ্ পাক জানেন যে তোমরা তাদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, কিন্তু তোমরা তাদের সঙ্গে বিবাহের কোন গোপন অঙ্গীকার করে রেখো না। অবশ্য শরীয়তের বিধান মোতাবেক তাদের সাথে কথা বলতে পার এবং নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত তোমরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা করোনা, জেনে রাখ তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে সে সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক অবগত আছেন অতএব, তাঁকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত ক্ষমাপরায়ণ, অতীব সহনশীল।

তফসীরুল কোরআন

ইদ্দতের বিধান

স্বামীর সাথে সহবাস হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীলোকেরা চার মাস দশ দিন ইদ্দত পালন করবে। এ ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। এ আয়াতের দ্ব্যর্থহীন নির্দেশই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় প্রমাণ হলো মসনদে আহ্‌মদে সংকলিত হাদীস। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রঃ)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তি বিবাহ করেছিল। স্ত্রীর সাথে সহবাসও করেনি এবং দেনমোহরও ধার্য করেনি, এ অবস্থায় স্বামী মারা গেল। এখন এই স্ত্রীর ইদ্দতের ব্যাপারে কিরূপ ফতোয়া হবে? যখন কয়েকবার এ প্রশ্ন নিয়ে লোকটি আসে তখন তিনি বললেন, 'আমি নিজ বিবেচনায় ফতোয়া দিচ্ছি। যদি ফতোয়াটি শুদ্ধ হয় তবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে হয়েছে মনে কর। আর যদি ফতোয়াটি ভুল হয় তবে তা আমার তরফ থেকে অথবা শয়তানের তরফ থেকে হয়েছে মনে কর, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল ভুল থেকে মুক্ত। আমার ফতোয়া হলো, সেই স্ত্রীলোকটিকে তার বংশ-মর্যাদা অনুযায়ী পূর্ণ মোহরানা দিতে হবে, কোনরূপ কমবেশী করা চলবে না। অতঃপর সে স্ত্রীলোকটি পূর্ণ সময় ইদ্দত পালন করবে এবং সে যথা নিয়মে পাবে উত্তরাধিকার।

একথা শুনে হযরত মা'কাল বিন ইয়াসার আশ্‌জায়ী (রাঃ) উঠে দাঁড়ালেন এবং বলতে লাগলেন, বারাও বিন্‌তে ওয়াশেক (রাঃ)-এর ব্যাপারে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) একথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তবে স্বামীর মৃত্যুর সময় যে সকল স্ত্রী গর্ভস্থ থাকবে তাদের এইরূপ ইদ্দত পালন করতে হবে না। তাদের জন্যে ইদ্দত হলো গর্ভস্থিত সন্তান প্রসব কাল পর্যন্ত। স্বামীর মৃত্যুর এক মুহূর্ত পরেও এ সময় উপস্থিত হতে পারে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ (সূরা তালাক)

"এবং গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত"।

তবে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সন্তান প্রসব এবং চার মাস দশদিন– এ দু'য়ের মধ্যে যে সময়টি বিলম্বে আসবে সেটি হবে গর্ভবতী নারীর ইদ্দতের সময় সীমা। কথাটি চমৎকার এবং একথা দ্বারা দু' আয়াতের মধ্যে সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করা যায়। কিন্তু আবার এর বিরুদ্ধে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত একখানি স্পষ্ট হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসখানি নিম্নরূপ ঃ

হযরত সাবঈয়া আসলামিয়া (রাঃ)-এর স্বামীর যখন এন্তেকাল হলো তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন এবং মাত্র কয়েক রাত পরই সন্তান প্রসব করলেন। অতঃপর গোসল শেষে উত্তম পোষাক পরিধান করলেন। এ দেখে হযরত আবুস সানাবুল বিন বালাবাক্কা বলেন, "আপনি কি বিবাহ করতে ইচ্ছা করেন? তাহলে আল্লাহ্‌র কসম, যতদিন চার মাস

দশ দিন অতিক্রান্ত না হবে ততদিন আপনি বিবাহ করতে পারেন না"। একথা শুনে হযরত সাবঈয়া (রাঃ) নীরব হয়ে পড়লেন এবং সন্ধ্যার সময় হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে মাসআলা জানতে চাইলেন। তিনি তখন এরশাদ করলেন, "যখন সন্তান প্রসব হয়েছে তখনই তুমি ইদ্দতের সময়-সীমা অতিক্রম করেছ। এখন যদি তুমি চাও তবে নিঃসন্দেহে বিবাহ করতে পার"। একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) যখন এই হাদীসের বক্তব্য জানতে পারলেন তখন তিনি নিজের উক্তিটি প্রত্যাহার করেন। তার প্রমাণ দেখা গেছে হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সঙ্গী এবং শাগরেদগণ (তাঁর কথা অনুযায়ী ফতোয়া না দিয়ে) এই হাদীস অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন। এ ইদ্দতের সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়ার মধ্যে একটি হেকমত রয়ে গেছে। যদি স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়ে থাকে তবে এ সময়ের মধ্যে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে।

মানব সৃষ্টির ইতিবৃত্ত

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে মাসউদ (রাঃ) কতৃক বর্ণিত হাদীস শরীফে রয়েছে, মানুষের ইতিবৃত্ত এই যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত মায়ের রেহেমে শুক্র হিসেবে থাকে। এরপর জমাট রক্তের পিন্ড রূপে আরও চল্লিশ দিন অতিবাহিত করে। এরপর আরও চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এরপর আল্লাহ্ পাক ফেরেশ্তা প্রেরণ করেন যেন তার মধ্যে রূহ সঞ্চারিত করে। এভাবে ১২০ দিন তথা চার মাস হয়। সর্তকতা অবলম্বন করে আরও দশ দিন মেয়াদের সঙ্গে বাড়ানো হয়েছে। কারণ কোন কোন মাস ২৯ দিনেরও হয়। যখন আত্মা সঞ্চারিত হয় তখন শিশুর নড়াচড়াও অনুভূত হয় এবং অন্তস্বত্বা হওয়ার আলামত প্রকাশ পায়। এজন্যে চার মাস দশ দিন ইদ্দতের সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১]

এ আয়াতে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দতের কথা বর্ণিত হয়েছে। যেসব স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হয় তাদের প্রতি নির্দেশ হলো চার মাস দশ দিন তাকে ইদ্দত অতিবাহিত করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে বিবাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে এবং বিবাহের উপকরণ থেকেও আত্ম-রক্ষা করবে। এই সময়ের মধ্যে সৌন্দর্য চর্চা থেকে বিরত থাকবে। সুগন্ধি ব্যবহার থেকে, অলংকার ব্যবহার করা থেকে, রঙিন পোষাক পরিধান থেকে, সুরমা তৈল ব্যবহার করা থেকে -এক কথায় সর্বপ্রকার সাজ-সজ্জা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিরত রাখবে। এই সমস্ত কথা يتربصن শব্দ থেকে বোঝা যায় এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও এ বিষয়ে তাগিদ করেছেন। আর যদি স্ত্রীলোকটি অন্তঃসত্বা হয় তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া পর্যন্ত তার ইদ্দত। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে ঃ

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন ঃ يتربصن শব্দটির তাৎপর্য হলো নিজেকে বিরত রাখা। প্রশ্ন হলো কোন্ জিনিষ থেকে বিরত রাখবে? এর জবাবে বলা হয়েছে ঃ (১) বিবাহ থেকে, এ ব্যাপারে সকল ওলামায়ে কেরাম একমত, (২) যে-বাড়ীতে স্বামীর এন্তেকাল হয়েছে সে বাড়ী থেকে বের হওয়ার ব্যাপারে নিজেকে বিরত রাখা। অবশ্য একান্ত প্রয়োজন হলে তা বৈধ। (৩) সর্ব প্রকার সৌন্দর্য চর্চা থেকে নিজেকে বিরত রাখা কেননা, হযরত আয়েশা (রাঃ) ও হাফছা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে স্ত্রীলোক আল্লাহ্ পাক এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে তার জন্যে মৃতের প্রতি তিন রাত্রির বেশী শোক পালন করা বৈধ নয়, তবে যে স্ত্রীলোকের স্বামীর মৃত্যু হয়েছে সে চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।[১]

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ

অর্থাৎ যখন ইদ্দত শেষ হয় তখন তারা শরীয়ত মোতাবেক যথারীতি পুর্নবিবাহ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ায় কোন অপরাধ নাই।

যেহেতু পূর্বের আয়াতে স্ত্রীলোকদেরকে বিবাহ এবং তার আনুষঙ্গিক বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাই পরবর্তী আয়াতে পুরুষদের সম্পর্কেও রয়েছে বিধি-নিষেধের ঘোষণা। এরশাদ হয়েছেঃ তোমরা ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিও না। প্রকাশ্যে বা গোপনে তাদের সাথে বিবাহের ব্যাপারে অঙ্গীকার বদ্ধ হয়োনা। আর আল্লাহ্ পাক যেহেতু তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য সব কিছু সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত তাই এসব বিষয়ে আল্লাহ্ পাককে ভয় করতে থাক কেননা, তোমাদের অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবর তিনি রাখেন। তোমাদের অন্যায়ের জন্যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি বিধান করেন না কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমা-পরায়ণ এবং অতীব সহনশীল।

(১) তফসীরে হক্কানী পারা ২, পৃষ্ঠা ৯১
তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১২৮

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا
لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ
فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ
عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ
بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

তরজমা

(২৩৬) যদি তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে স্পর্শ করার অথবা তাদের মোহর নির্ধারণের পূর্বেই তালাক দাও তবে তাতে কোন গুনাহ্ নেই এবং তাদেরকে নিয়ম মোতাবেক কিছু খরচ-পত্র দিও, অবস্থাশালী ব্যক্তির জন্যে তার অবস্থা অনুযায়ী আর দরিদ্র ব্যক্তির জন্যে তার সাধ্য অনুযায়ী। এটি নেককার লোকদের জন্যে অবশ্য করণীয়।

(২৩৭) এবং যদি তোমরা স্ত্রীলোকদেরকে স্পর্শ করার পূর্বে তালাক দাও অথচ তাদের দেনমোহর নির্ধারিত করে ফেলেছ, তবে নির্ধারিত মোহরানার অর্ধেক। কিন্তু যদি স্ত্রীগণ ক্ষমা করে দেয় অথবা যার হাতে বিবাহ বন্ধন রয়েছে সে ক্ষমা করে। আর তোমরা ক্ষমা কর– এটি পরহেযগারীর নিকটতম এবং তোমরা পরস্পরের মধ্যে উদারতার নীতি অবলম্বন করতে ভুলে যেওনা। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তোমাদের সমস্ত কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করছেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতে সেই নারীদের সম্পর্কে বিধান প্রদত্ত হয়েছে যাদের বিয়ে হয়েছে কিন্তু মোহর নির্ধারিত হয়নি এবং স্বামী তার স্ত্রীকে স্পর্শও করেনি। এমন অবস্থায় তালাক প্রদান করা হলে স্বামীর কর্তব্য হলো তার সামর্থ অনুযায়ী তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে কিছু দিয়ে দেয়া। এটি আল্লাহ্ পাকের বিধান। যার বাস্তবায়ন অবশ্য কর্তব্য। আল্লাহ্ পাক তাঁর বন্দাদের প্রতি কত দয়াবান তা এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে কেননা, তিনি স্পর্শ করার পূর্বে স্ত্রীকে তালাক দিলে তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন কিন্তু দানের পরিমাণ নির্দিষ্ট করেননি, বরং স্বামীর সঙ্গতির উপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। স্বামী সঙ্গতি সম্পন্ন হলে যথারীতি স্ত্রীকে দ্রব্য-সামগ্রী দেবে। পক্ষান্তরে, স্বামী দরিদ্র হলে তার সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রীকে প্রদান করবে। তফসীরকারগণ তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদেরকে চার ভাগে বিভক্ত করেছেন।

(১) যাদের মোহর নির্দিষ্ট হয়েছে এবং স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর তালাক দেয়া হয়েছে এদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তাদের সম্পর্কে হুকুম হলো তাদের মোহরানার হক্ব আদায় করতে হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ে কোন জিনিস ফেরত নেবে না এবং তাদের ইদ্দত হলো তিন হায়েয।

(২) যে সমস্ত স্ত্রীলোকের মোহর নিদিষ্ট হয়নি এবং স্বামী তাকে স্পর্শও করেনি, বিয়ের পরই তালাক হয়ে গেছে তাদের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতে বিধান ঘোষণা হয়েছে যে, তাদেরকে মোহরানার হক্ব দেয়া হবে না, শুধু নিয়ম মাফিক কিছু খরচ-পত্র দিতে হবে, এদের কোন ইদ্দত পালন করারও প্রয়োজন হবে না।

(৩) যে সমস্ত স্ত্রীলোকের দেনমোহর নির্দিষ্ট হয়েছে অথচ স্বামী তাদেরকে স্পর্শ করেনি এদের সম্পর্কে পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা রয়েছে, মোহরানার অর্ধেক তাদেরকে দিতে হবে তবে তাদের ইদ্দত পালন করতে হবে না।

(৪) সে সব স্ত্রীলোক যাদের মোহরানা নির্ধারিত হয়নি, কিন্তু তাদের স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে তাদের সম্পর্কে বিধান হলো সেই স্ত্রীলোকের আত্মীয়-স্বজনের যে পরিমাণ মোহর নির্দিষ্ট হয়েছে সে পরিমাণ তাকে দিতে হবে।[১]

আলোচ্য আয়াতে যেহেতু এমন স্ত্রীলোক সম্পর্কে বিধান পেশ করা হয়েছে যার মোহরানাও নির্দিষ্ট হয়নি এবং স্বামীও তাকে স্পর্শ করেনি তাই তার সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে সঙ্গতি অনুযায়ী তাকে কিছু খরচ-পত্র দান করতে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এই খরচ-পত্রের পরিমাণ সম্পর্কে বলেছেন ঃ যদি সঙ্গতি থাকে তবে তাকে একজন খাদেম দেয়া উচিত। তা না হলে কিছু রৌপ্য সামগ্রী অথবা কমপক্ষে তাকে পোষাক দেয়া উচিত। ইমাম শাবী (রঃ)

---

(১) তফসীরে হক্কানী পারা, ২ পৃষ্ঠা ৯২-৯৩
তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৩৫

বর্ণনা করেন ঃ মধ্যম পরিমাণে কিছু প্রদান করবে। যেমন কোর্তা, দোপাট্টা, চাদর এবং লেপ দেয়া উচিত। শোরাইহ্ (রঃ) বর্ণনা করেন, পাঁচশত দেরহাম প্রদান করা উচিত। আল্লামা এবনে সীরিন বলেন ঃ গোলাম, খাদ্য-দ্রব্য অথবা পোষাক প্রদান করা উচিত। হযরত ইমাম হাসান এবনে আলী (রাঃ) এমন একজন স্ত্রীলোককে দশ হাজার দেরহাম প্রদান করেছিলেন।

যদি এ খরচ-পত্রের ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে কলহ-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তবে ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে মোহরে মেছেলের অর্ধেক দেয়া উচিৎ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের আত্মীয়-স্বজনের যে পরিমাণ মোহর তার অর্ধেক হওয়া উচিত।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে এমন অবস্থায় স্বামীকে নির্দিষ্ট কোন কিছু দেয়ার জন্যে বাধ্য করা যায় না। যে পোষাক পরিধান করে একজন স্ত্রীলোক নামায আদায় করতে পারে এমন পোষাক দেয়াই যথেষ্ট।[১]

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ

অর্থাৎ যদি বিবাহের সময় স্ত্রীর মোহর নির্ধারিত হয় কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পূর্বেই স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা হয় তবে তাকে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক আদায় করতে হবে।

পবিত্র কোরআন একথাও ঘোষণা করেছে–

اِلَّآ اَنْ يَّعْفُوْنَ

অর্থাৎ তবে যদি স্বামী-স্ত্রী বা বিবাহ-বন্ধনের ভাঙ্গা গড়ার দায়িত্ব যাদের প্রতি অর্পিত তারা যদি মাফ করে দেয়, তবে এ দাবী মাফ হতে পারে। স্ত্রীর মাফ করার অর্থ হলো তার প্রাপ্য অর্ধেক মোহরও মাফ করে দেয়া, আর পুরুষের মাফ করার তাৎপর্য হলো স্বামী নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক না কেটে পূর্ণ মোহর আদায় করে দেয়া। অথবা যদি মোহর পূর্বেই আদায় করে থাকে তবে অর্ধেক ফেরত না নেয়া। আল্লামা ওসমানী (রঃ) লিখেছেন ঃ পুরুষের পক্ষেই এমন উন্নত আদর্শ পেশ করা অধিকতর শ্রেয় কেননা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন নারী-জাতির উপর পুরুষদের ফজিলত ও মর্যাদা দান করেছেন, অতএব পুরুষেরই কর্তব্য হলো এমনি মহৎ কাজ করা। এতদ্ব্যতীত, স্ত্রীর তরফ থেকে কোন দোষ হয়নি, সে তার দায়িত্ব পালনে প্রস্তুত, স্বামী ইচ্ছানুযায়ী এ তালাক দিয়েছে, প্রদত্ত মোহরের অর্ধেক ফেরত না নেয়া তাকওয়া পরহেযগারীর অধিকতর নিকটবর্তী।[২]

اَوْ يَعْفُوَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ عُقْدَةُ النِّكَاحِ

(১) তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৮
(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৪৯

অথবা সে যদি মাফ করে যার হাতে বিয়ের ভাঙ্গা গড়ার দায়িত্ব রয়েছে, তাহলেও মাফ হয়ে যাবে।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরামের দুটি অভিমত রয়েছে–

(১) এতদ্বারা স্বামীকে বোঝানো হয়েছে কেননা, বিবাহ ভাঙ্গা গড়ার অধিকার স্বামীরই রয়েছে। আর স্বামীর মাফ করার তাৎপর্য হলো দেন মোহর অর্ধেক আদায়ের হুকুমের কারণে সে যে অর্ধেকের অধিকারী হয়েছে তা যদি সে ছেড়ে দেয়, তখন মোহরের পূর্ণ টাকাটাই স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। এ অভিমত প্রকাশ করেছেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ এবনে মোসাইয়্যেব (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)।

বর্ণিত আছে, হযরত যোবায়ের এবনে মোতয়েম (রাঃ) বিবাহ করেন এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠার পূর্বেই তিনি স্ত্রীলোকটিকে তালাক প্রদান করেন এবং তাঁকে দেন মোহরের সমুদয় অর্থ দিয়ে দেন এবং বলেন ঃ মাফ করার অধিক হক্বদার আমিই। (বায়হাকী)

(২) এর অর্থ বাক্যটি স্ত্রীলোকের আত্মীয়-স্বজন সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছে কেননা, তাদের অনুমতি ব্যতীত বিবাহ হওয়া সম্ভব ছিল না। অর্থাৎ স্ত্রীলোকটির যারা মুরুব্বী তারা যদি মাফ করে দেয় তবে মাফ হতে পারে কেননা, তাদের অনুমতির কারণেই স্ত্রীলোক দেন মোহরের হক্বদার হয়েছে।

এ অভিমত ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম আহমদ (রঃ)-এর। আর এ অভিমত আল্‌কামা (রঃ), আতা (রঃ), হাসান (রঃ) এবং জুহুরী (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দের। তাঁদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, দেন মোহরের একমাত্র হক্ব হলো স্ত্রীলোকের। অতএব, মোহরের ব্যাপারে মাফ করার অধিকার শুধু তার। যদি স্ত্রীলোক বয়স্কা হয় তবে সে নিজেই এই অধিকার প্রয়োগ করবে। আর যদি অল্প বয়স্কা হয় তবে তার ওলী বা মুরুব্বীগণ মাফ করার অধিকারী হবে।

وَاَنْ تَعْفُوْٓا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

অর্থাৎ যদি তোমরা মাফ কর তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। এতদ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়েকেই সম্বোধন করা হয়েছে, অর্থাৎ হয়তো স্ত্রী তার মোহরের অর্ধেকের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যদি স্বামীকে তা ক্ষমা করে তবে তা হবে পরহেযগারীর নিকটবর্তী অথবা স্বামী অর্ধেকের স্থলে পূর্ণ মোহরই স্ত্রীকে আদায় করে দেয়, তাও তার জন্যে পরহেযগারীর নিকটবর্তী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে নিজের হক্ব ছেড়ে দেবে তথা নিজের হক্ব ত্যাগ করে অন্যের হক্বকে প্রধান্য দেবে, সে-ই উত্তম ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হবে।

অতঃপর এরশাদ হয়েছে ঃ

وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ

অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের প্রতি এহ্সান করা ভুলে যেয়ো না তথা পরস্পরের প্রতি এহ্সান কর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এমন এক কঠিন সময় আসবে যখন মোমেনও তার হাতের বস্তুকে দাঁত দিয়ে আঁকড়ে ধরে রাখবে। পরস্পরের ফজিলত ও বুজুর্গীর কথা ভুলে যাবে অথচ আল্লাহ্ পাকের আদেশ হলো, "পরস্পরের ফজিলতের কথা ভুলে যেয়ো না"। মন্দ সে সব লোক, যারা মুসলমানের অসহায় ও দারিদ্র অবস্থায় তার জিনিষপত্র কম দরে ক্রয় করে। অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমনি ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন, তিনি এরশাদ করেছেন ঃ যদি তোমার নিকট কল্যাণ থাকে তবে তা তোমার মুসলমান ভাইয়ের নিকট পৌঁছাও, তার ধ্বংসের ব্যাপারে অংশীদার হয়োনা। একজন মুসলমান অন্য মুসলমানের ভাই। একজ নের দায়িত্ব হলো অন্যজনকে ব্যথিত করবে না, চিন্তিতও করবে না এবং তাকে কল্যাণ থেকে বঞ্চিতও করবে না। হযরত আওন (রাঃ) এই হাদীস বর্ণনা করতেন এবং ক্রন্দন করতে থাকতেন এমনকি, তাঁর দাঁড়ি থেকেও অশ্রুর ফোঁটা পড়তো। তিনি বলতেন, এ আয়াতে আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ হলো তোমরা একে অন্যের ফজি লত ভুলে যেয়ো না। যখন কারো নিকট কোন সাহায্য প্রার্থী হাযির হয় এমন অবস্থায় যে তখন তার নিকট কিছুই নেই, তবে অন্ততঃ সেই সাহায্য প্রার্থীর জন্যে দোয়া করে তাকে বিদায় দেয়া কর্তব্য। আর আল্লাহ্ পাক তোমাদের যাবতীয় কার্যাবলী দেখছেন। অদূর ভবিষ্যতে তোমাদেরকে সৎ কার্যের জন্যে পুরস্কার এবং মন্দ কার্যের শাস্তি প্রদান করা হবে।[১]

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَ
الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى ۚ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ ﴿٢٣٨﴾ فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا
اَوْ رُكْبَانًا ۚ فَاِذَاۤ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٣٩﴾
وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا ۖ وَّصِيَّةً لِّاَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعًا
اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ ۚ فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْ مَا فَعَلْنَ
فِيْۤ اَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوْفٍ ۗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٢٤٠﴾

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০০

তরজমা

(২৩৮) তোমরা নামাযের হেফাজত কর, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের (আছরের নামায) এবং অত্যন্ত বিনীত হয়ে আল্লাহ্ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হও।

(২৩৯) অতঃপর যদি তোমরা ভয় কর (যুদ্ধের ময়দানে) তবে পদাতিক বা আরোহী অবস্থায় নামায কায়েম কর। অতঃপর যখন নিরাপদ হও তখন আল্লাহ পাককে স্মরণ কর, যেভাবে তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা জানতে না।

(২৪০) এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী বর্তমানে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তারা যেন এক বছর কাল তাদের স্ত্রীদেরকে বহিষ্কার না করে, বরং এক বছরের ভরণ পোষণের জন্যে ওসিয়ত করে যায়। কিন্তু স্ত্রীগণ যদি নিজেরাই স্বেচ্ছায় চলে যায় তবে তারা নিজেদের ব্যাপারে নিয়ম মাফিক যা কিছু করে তাতে তোমাদের কোন গুনাহ্ নেই এবং আল্লাহ্ পাক মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

যেহেতু এ আয়াত সমূহে পারিবারিক জীবনের বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তাই আল্লাহ্ পাক মানুষকে আখেরাত সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার লক্ষ্যে এ আয়াতে নামাযের তাগিদ করেছেন যাতে করে মানুষ স্বামী-স্ত্রী, সন্তান-সন্ততির মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহ্কে ভুলে না যায়। তাই এ আয়াতে নামাযের বিশেষ তাগিদ করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

নামায

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ

তোমরা সমস্ত নামাযের হেফাজত কর অর্থাৎ সঠিক সময়ে নামায আদায় কর, আরকান, আহকাম যত্ন সহকারে পালন কর, মনের পূর্ণ একাগ্রতা নিয়ে নামায আদায় কর। সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়া এ ব্যাপারে একমত যে, নামায ফরয বা অবশ্য কর্তব্য। যে নামায আদায় করতে অস্বীকৃতি জানায় সে মুসলমান থাকে না। আর যে সব কিছু জেনে-শুনেও নামায না পড়ে তার সম্পর্কে ইমাম আহমদ (রঃ) এত মত হলো সে কাফের হয়ে যায়। ইমাম মালেক (রঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত হলো সে কাফের হয় না কিন্তু তাকে তওবা করানো কর্তব্য। যদি সে তওবা করলো তবে ভাল কথা অন্যথায় তাকে হত্যা করা উচিত। আর আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মত হলো তাকে হত্যা না করা। তবে তাকে সর্বদা বন্দী করে রাখতে হবে। তখন হয়তো সে তওবা করবে অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হবে।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪২

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম রাজী (রঃ) বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কোন কোন লোকের ধারণা , পবিত্র কোরআনে নামাযের হুকুম করা হয়েছে কিন্তু পাঁচবার নামায পড়তে হবে একথা পবিত্র কোরআনে নেই। ইমাম রাজী (রহঃ) বলেছেন যে, এ আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ একথা প্রমাণিত হয় কেননা, আয়াতে আল্লাহ্ পাক"সালাওয়াত"শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা সালাত শব্দের বহুবচন। কোন বিষয় সম্পর্কে যখন বহুবচন ব্যবহৃত হয় তখন কমপক্ষে তিন অনুমান করা যায়। এ শব্দের পরে এরশাদ হয়েছে ঃ ওয়াসালাতিল উস্‌তা অর্থাৎ মধ্যম নামায। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তিন সংখ্যার বাড়তি আরও কিছু । আর সেই বাড়তি সংখ্যার মধ্যে সর্বনিম্ন হলো পাঁচ। যেন দুয়ে দুয়ে চার, তার মধ্যে সংখ্যা হবে আরও এক, এ আয়াত দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের কথা প্রমাণিত হয় কিন্তু এর দ্বারা নামাযের সময় কখন হয় তা প্রমাণিত হয় না। অন্য আয়াতে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত, এরশাদ হয়েছে ঃ

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ্ পাকের তসবীহ পাঠ কর সন্ধ্যায় এবং সকালে অর্থাৎ মাগরিবে এবং ফজরে। আরও এরশাদ হয়েছে ঃ

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ

"সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত্রির ঘন অন্ধকার পর্যন্ত নামায কায়েম কর"।

এতদ্বারা জোহর, আসর, মাগরিব, এশার নামাযের কথা প্রমাণিত হয়।

وَقُرْاٰنَ الْفَجْرِ

শব্দ দ্বারা ফজরের নামায প্রমাণিত হয়।

আলোচ্য আয়াতে নামায সমূহের সংরক্ষণের বা হেফাজত করার যে তাগিদ করা হয়েছে তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন ইমাম রাজী (রঃ)। তিনি বলেছেন ঃ নামাযের হেফাজতের তাৎপর্য হলো নামাযের যাবতীয় শর্ত সমূহ পালন করা তথা দেহ, পোষাক এবং স্থান পাক হওয়া, শরীয়ত সম্মত পোষাক পরিধান করা, কেবলা মুখী হওয়া, নামাযের সকল আরকান ও আহকাম পূর্ণ করা, নিয়ত দুরস্ত হওয়া ইত্যাদি। যারা এসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করে নামায আদায় করে তারাই নামাযের হক্ব আদায় করতে সক্ষম হয়।[১]

মওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী (রঃ) তাঁর তফসীরে লিখেছেন ঃ নামাযের হেফাজতের তিনটি স্তর রয়েছে-

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৪৬

(১) নামায সঠিক সময়ে আদায় করা, ফরজ ওয়াজিব তরক না করা। এটি সর্বনিম্ন স্তর।

(২) দেহ পবিত্র থাকা, রিয্ক হালাল হওয়া, অন্তরে ভয়-ভীতি বিদ্যমান থাকা, সুন্নত ও মোস্তাহাব সমূহের প্রতিও সম্পূর্ণ নজর রাখা, এটি উত্তম স্তর।

(৩) নামাযী আল্লাহ পাকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকা, এমনি হুজুরে ক্বলব নিয়ে সম্পূর্ণ নামায আদায় করা। এটি হলো সর্বোত্তম স্তর।[১]

উল্লেখ্য, স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির তথা আল্লাহ্ পাকের সাথে তাঁর বন্দার নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের মাধ্যম হলো নামায। মানুষ তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার সমীপে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হয় নামাযের সময়। তাঁর স্মরণে বিভোর ও তন্ময় হয়ে থাকে নামাযে রত হয়ে এবং আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ আনুগত্য ও আত্ম-সমর্পণের শপথ গ্রহণ করে তাঁর মহান দরবারে চরম ভক্তি ও বিনয় প্রকাশ করে নামাযের মাধ্যমে। অন্তরের সকল ভক্তি শ্রদ্ধা, আল্লাহ্র প্রতি প্রেমের গভীরতা ও তন্ময়তা ও মনের সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে মানুষ যখন আল্লাহ্ পাকের দরবারে দণ্ডায়মান হয় তখন সে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়, তার হৃদয়-মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। সে তাঁর সমীপে স্বীয় কাকুতি-মিনতি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়। নামাযের এমনি মাহাত্ম রয়েছে বলেই পবিত্র কোরআনে এর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ

"এবং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর, আর বিনয়ীদের সাথে বিনয় প্রকাশ কর"।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ্ পাক স্বীয় বন্দাদের উপর যে সমস্ত কর্তব্য আরোপ করেছেন তন্মধ্যে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাসের পর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ হলো নামায। বস্তুতঃ নামাযের মধ্যেই নিহিত রয়েছে এ জীবনে শান্তি এবং পরকালীন জন্দেগীর চির মুক্তি।

কিন্তু এর জন্যে নামাযের মধ্যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের মনকে আল্লাহ্ পাকের দরবোরে হাযির রাখা পূর্ব শর্ত। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যে নামাযে মন আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির না হয়, সে নামাযের দিকে আল্লাহ পাক দৃষ্টিপাতও করবেন না।

বিখ্যাত সুফী, বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান সওরী (রঃ) বলেছেন ঃ নামাযের সময় যার মনে ভয়-ভীতি, বিনয় ও মিনতির ভাবের উদ্রেক না হয় তার নামাযই শুদ্ধ নয়।

(১) তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা ৯৬

আর বিখ্যাত সাধক বুজুর্গ হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন ঃ যে নামাযে আল্লাহ্ পাকের দরবারে মন হাযির না হয়, সে নামায শাস্তির নিকটবর্তী।

নামাযের সময় আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কি অবস্থা হতো তার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমি ও হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলাপে রত থাকতাম এমন অবস্থায় যদি নামাযের সময় আসতো তবে তিনি আমাকে চিনতে পারতেন না, আমিও তাঁকে চিনতে পারতাম না। অর্থাৎ নামাযের ডাক এলে তথা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবার মুহূর্ত এলে মনে এমন ভয় ভীতি সঞ্চারিত হতো যে একে অন্যের কথা আদৌ মনে থাকতো না। এপর্যায়ে পবিত্র কোরআনে একখানি আয়াত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এরশাদ হয়েছে ঃ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ

"সেসব মোমেনগণ অবশ্যই সফলকাম, যারা তাদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত ও তন্ময় থাকে"।

'খুশু' শব্দের অর্থ হলো ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে কারো সম্মুখে উপস্থিত হওয়া এবং তন্ময় হয়ে থাকা। পবিত্র কোরআনের বিখ্যাত তফসীরকার হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) 'খাশেউন' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'খায়েফুন' বলে অর্থাৎ যারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হয়। এ শব্দটি পবিত্র কোরআনে অন্য একখানি আয়াতে এ মর্মেই ব্যবহৃত হয়েছে।

এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِاللّٰهِ

অর্থাৎ মোমেনদের কি এখনও সেই সময় আসেনি? যখন আল্লাহ্ স্মরণের জ ন্যে তাদের অন্তর কম্পমান হবে।

অতএব, অন্তরে যখন আল্লাহ্ পাকের ভয়-ভীতি জাগ্রত থাকবে তখন নামাযের সময় এদিক ওদিক দৃষ্টিপাত করা, হস্ত চালনা-প্রভৃতি আদৌ সম্ভব হবে না। এমনকি মনেও কোন প্রকার কথা বার্তার ভাবনা পর্যন্ত সৃষ্টি হওয়া উচিত হবে না, বরং আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হবার কারণে স্থবির হয়ে থাকবে এবং তন্ময়তা ও একাগ্রতার উজ্জল ও অনুপম দৃষ্টান্ত পেশ করবে।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নামায

আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে রত হতেন তখন তাঁর অন্তর থেকে এমন শন্ শন্ শব্দ শ্রুত হতো যেন কোন তামার কড়াই, যা পানিতে ভরপুর রয়েছে এবং প্রচণ্ড অগ্নির উপর থাকার কারণে তা থেকে শব্দ হয়ে থাকে।

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নামায

হযরত আবু বকর (রাঃ) ও হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়েরের (আঃ) অবস্থা এই ছিল যে, তাঁরা যখন নামাযে দণ্ডায়মান হতেন তখন মনে হতো যেন একটা প্রাণহীন কাষ্ঠখণ্ড দণ্ডায়মান রয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়র (রাঃ) যখন কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে নামায আদায় করতেন বিশেষ করে যখন সেজাদায় রত হতেন, পবিত্র কা'বার বহু কবুতর তাঁর পৃষ্ঠদেশে উপস্থিত হতো।

হযরত আলী (রাঃ)-এর নামায

হযরত আলী (রাঃ) অজু শেষ করে উঠতেন তখন তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থর থর করে কম্পমান থাকতো। চেহারার রং ফ্যাকাশে হয়ে যেতো। তাঁকে এমনি ভীত-সন্ত্রস্ত হতে দেখে একবার তাঁর খাদেম বিস্ময় প্রকাশ করে জিজ্ঞাসা করলো ঃ হে আমীরুল মোমেনীন! আপনি কি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? তিনি খাদেমকে বললেন ঃ তুমি জান না? আমি কোন্ দরবারে যাচ্ছি? সেই সর্বশক্তিমান আহকামুল হাকেমীন আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের মহান দরবারে উপস্থিত হতে চলেছি, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা, যিনি বিশ্ব নিয়ন্তা, যিনি শেষ বিচারের দিনের মালিক।

বস্তুতঃ যারা আল্লাহ্র ভয়ে এতখানি ভীত-সন্ত্রস্ত হন এবং আল্লাহ্র ধ্যানে এমনি ভাবে তন্ময় হয়ে নামাযে রত হন তাদের জীবন সাধনা যে সার্থক ও সুন্দর হবে, একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়র (রাঃ)-এর নামায

একবার হযরত আবদুল্লাহ এবনে জোবায়র (রাঃ) নামাযে রত ছিলেন, তাঁর সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিল এমন সময় একটি সাপ এসে হাযির হলো, শিশুটি চিৎকার করতে লাগলো। শিশুর চিৎকার শ্রবণ করে তার মাতা উপস্থিত হলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোকও হাযির হলো, সাপটিকে লাঠির আঘাতে মারা হলো, এতো সব কিছু হয়ে গেল কিন্তু তিনি নামাযেই রত ছিলেন, চার পার্শ্বে কি ঘটছে তার সংবাদও তিনি পেলেন না। নামায শেষে সমবেত লোকদেরকে তাদের উপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে তিনি ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন। তাঁর স্ত্রী এর জন্যে অনুযোগের সুরে কিছু বলতে চাইলে তিনি বললেন ঃ দোযখের মধ্যে পাপী তাপী মানুষের শাস্তির জন্যে যে বিষাক্ত সাপ অপেক্ষা করছে সেগুলোর কথা স্মরণ করে এ সাপের কথা বিস্মৃত হয়েছি। এটি কোন রূপকথা নয়, গল্প কাহিনী নয়; বরং বাস্তব ঘটনা।

ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রাঃ) নামায

এমনি একটা ঘটনা ঘটেছে ইমাম জয়নুল আবেদীনের (রঃ) জীবনেও। তিনি দৈনিক এক হাজার রাকাআত নামায আদায় করতেন, একবার তিনি তাঁর ঘরে নামাযে

রত ছিলেন। ঘটনাক্রমে বাড়ীতে আগুন ধরে গেল, চারি পার্শ্বের লোক এসে আগুন নিভিয়ে দিল কিন্তু তাঁর তন্ময়তার এতটুকু ব্যত্যয় ঘটলো না। নামাযের পর শুধু জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি কারণে এত হৈ চৈ? পরে তাঁকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হলো।

বস্তুত ঃ যারা প্রেমময় আল্লাহ্ পাকের প্রেমে মুগ্ধ, মত্ত, মাতোয়ারা, করুণাময়ের অনন্ত অসীম করুণার কৃতজ্ঞতায় বিভোর, যারা সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ পাকের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, তারা যখন নামাযে দণ্ডায়মান হন তখন একান্ত ভাবেই আল্লাহ্র দরবারে হাযির হন। এ জগত ও জগতের সব কিছু পরিত্যাগ করে ক্ষণিকের জন্যে হলেও স্রষ্টা পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হন। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একখানি হাদীসে এরশাদ করেছেন ঃ

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ

তুমি এমনিভাবে আল্লাহর এবাদত করবে যেন তাঁকে দেখছ, যদি তোমার মনের অবস্থা এমন না হয় যে, তুমি তাঁকে দেখতে পারছ তবে একথা নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। মনে এমন ভাব সৃষ্টি হলে ভীত-সন্ত্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

মূলতঃ যারা এভাবে নামায আদায় করেন, গভীর ভাবে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হন, তাদের সাফল্য ও কামিয়াবীর ঘোষণা রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। আর এমন নামাযের জন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সুসংবাদ দিয়েছেন। একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বৃক্ষের একটা শুষ্ক ডাল টেনে আনলেন। ফলে তাতে যে পাতা ছিল সবই ঝরে গেলো, তিনি তখন এরশাদ করলেন ঃ যারা নামায আদায় করে তাদের গুনাহ এভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এ পাতাগুলো ঝরে গেল। এরপর এর প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের এ আয়াত পাঠ করেন ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ؕ اِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ ذٰلِكَ ذِكْرٰى لِلذّٰكِرِيْنَ

"তোমরা নামায কায়েম কর দিনের প্রথম ভাগে ও শেষ ভাগে এবং রাত্রির কিছু অংশে। নিশ্চয় ভাল মন্দকে দূর করে দেয়। উপদেশ গ্রহণ কারীদের জন্যে এটি উত্তম উপদেশ"।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ আল্লাহ পাক বন্দার পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ (অবশ্য করণীয়) ঘোষণা করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তম রূপে অজু সুসম্পন্ন করে যথা সময়ে খুশু ও খুজুর সাথে নামায আদায় করে তার পাপ মোচন

করা, তাকে ক্ষমা করা আল্লাহ পাকের হক্ব হয়ে পড়ে। পক্ষান্তরে যে নামাযের ব্যাপারে অসলতা করে তাকে ক্ষমা করা ও মুক্তি দানের ব্যাপারে আল্লাহ্ পাকের কোন যিম্মাদারী থাকে না। ইচ্ছা করলে তিনি তার শাস্তি বিধান করতে পারেন আর তাঁর মর্জি হলে, তাকে ক্ষমাও করতে পারেন।

অন্য একখানি হাদীসে এরশাদ হয়েছে, তিনটি বস্তু কাফ্ফারা স্বরূপ। আর তিনটি বস্তু দ্বারা উচ্চ মর্যাদা অর্জিত হয়। আর তিনটি বস্তু হলো মুক্তিদানকারী। কাফ্ফারার তিনটি বস্তু হলোঃ (এক) তুহিন শীতের মধ্যেও উত্তমরূপে অজু সুসম্পন্ন করা। (দুই) একটি নামাযের পর আরেকটি নামাযের জন্যে অপেক্ষা করা। (তিন) জামাআতে নামাযের জন্যে বের হওয়া। উচ্চ মর্যাদার কারণ তিনটি বস্তু হলো (এক) মানুষকে সাহায্য দান করা (দুই) একে অন্যকে অধিক পরিমাণে সালাম দেয়া (তিন) রাত্রি বেলায় মানুষ যখন নিদ্রিত থাকে তখন নামায আদায় করা। আর মুক্তি দানকারী তিনটি বস্তু হলো (এক) ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থায় সুবিচার করা (দুই) দারিদ্র ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া। (তিন) গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহ্ পাককে ভয় করা। আর একখানি হাদীসে রয়েছে, একমাত্র সেজদা এমন আমল যার দ্বারা বন্দা আল্লাহ্ আল্লাহ্ পাকের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে। আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এটি অত্যন্ত পছন্দনীয় কেননা, তাঁর সম্মুখে সেজদায় রত হয়ে বন্দা স্বীয় মুখমণ্ডলটি মাটি মাখা করে ফেলে।

উল্লেখ্য, নামাযের মাধ্যমেই স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে এক গভীর ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সৃষ্টির সেরা স্রষ্টার প্রতিনিধি মানব জাতির জন্যে নামাযের মাধ্যমে আসে এক সুবর্ণ সুযোগ। সে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে পারে, তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভে সক্ষম হয়, এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

الصَّلٰوةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ

নামায হলো মোমেনদের মে'রাজ। ঐতিহাসিক শবে মে'রাজে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হয়েছিলেন তখন আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান স্বরূপই তিনি নিয়ে এসেছিলেন নামাযের এ বিধান। তাই নামায শবে মে'রাজের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারণিক এবং আল্লাহ্র দরবারে হাযির হবার ও তাঁর নৈকট্য লাভের এক অপূর্ব সুযোগ। এ যেন বিশ্ব প্রতিপালকের তরফ থেকে বিশ্ব মানবের জন্যে শবে মে'রাজের উপঢৌকন যা বহন করে এনেছেন বিশ্ব নবী হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম। যারা নামাযের প্রতি অবহেলা করে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে তারা যেন বিশ্ব নিয়ন্তার উপঢৌকনের প্রতিই অবহেলা, উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে।

পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভও হয় নামাযের মাধ্যমে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهٖ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ

বন্দা যখন সেজাদায় রত থাকে তখনই তার প্রতিপালকের অধিকতর নিকটবর্তী হয়। অতএব, সেজাদারত অবস্থায় তোমরা অধিক পরিমাণে দোয়া কর।

স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের দরবারে মনের সকল কাকুতি-মিনতি, চরম ভক্তি অনুরক্তি প্রকাশ করার এবং তাঁর স্মরণে তন্ময় ও বিভোর থাকার নির্দেশ রয়েছে পবিত্র কোরআনে, আর এজন্যেই এর বাস্তব ব্যবস্থা করা হয়েছে নামাযের মাধ্যমে। এরশাদ হয়েছে ঃ

أَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ

"আমাকে স্মরণ করার জন্যেই নামায কায়েম কর"।

তাই যারা আল্লাহ্ পাককে যত বেশী স্মরণ করে তারা নামাযে তত বেশী তন্ময় থাকে, আল্লাহ্ পাকের স্মরণে রসাস্বাদন করতে থাকে। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

আমার নয়ন মনের পরিতৃপ্তি হলো নামায। এজন্যেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সারারাত আল্লাহ পাকের দরবারে নামাযে দণ্ডায়মান থাকতেন, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন বলেই তাঁর চরণ যুগল ফুল উঠতো। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদের কথা। এ নামাযে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এত দীর্ঘ সময় সেজদারত থাকতেন যে কখনো আমার ভয় হতো যে হয়তো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রাণ বায়ু উড়ে গেছে, হয়তো তিনি এ নশ্বর জগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। তখন আমি তাঁর পায়ের আঙ্গুলগুলো স্পর্শ করে দেখতাম এবং তাঁর অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতাম।

বস্তুত ঃ এজন্যেই পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে ঃ নামাযের সাধনা নিতান্ত সহজ নয়; বরং অত্যন্ত কঠিন। এর জন্যে চাই মনের একাগ্রতা, তন্ময়তা, আল্লাহ পাকের প্রতি পরম ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা, তাঁর স্মরণে বিভোর ও মুগ্ধ থাকা, তাঁর আনুগত্যের জন্যে দৃঢ় সংকল্পতা এবং নিজের দীনতা হীনতা প্রকাশ করা। তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ-الاية

"এবং তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা সাহায্য প্রার্থনা কর এবং নিশ্চয় নামায অত্যন্ত কঠিন তবে যারা বিনয়ী, যারা আল্লাহ্র ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত, যারা একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, একদিন আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে তাদের জন্যে অবশ্য নামায কঠিন নয়"।

অতএব, আল্লাহর প্রতি এবং পরকালীন জিন্দেগীর প্রতি যার বিশ্বাস যত বেশী হবে নামাযেও তার একাগ্রতা ও তন্ময়তা তত বেশী হবে।

এখানে একথাও উল্লেখ্য, নামাযই একমাত্র এবাদত যা কোন অবস্থাতেই মাফ হয় না, এর কোন বিকল্প নেই। কোন মুসলমান যদি অসুস্থ রুগ্ন হয়, দাঁড়িয়ে নামায আদায়ে অক্ষম হয় তবে উপবিষ্ট অবস্থায়ই নামায আদায় করতে হবে। আর যদি তাতেও অক্ষম হয় তবে শায়িত অবস্থায় ইশারা-ইঙ্গিতে হলেও নামায আদায় করতে হবে। যদি অজু করতে অক্ষম হয় তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। যদি যুদ্ধ করতে থাকে তবে সে অবস্থায়ও নামায আদায় করতে হবে, শত্রুর মোকাবেলা করার সময় মুসলমানদেরকে দু' দলে বিভক্ত করে একদল নামাযের জন্যে ইমামের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হবে আর অন্য দল দুশমনের মোকাবেলা করতে থাকবে। দু' রাকাআত শেষ হলে প্রথম দল দুশমনদের মোকাবেলায় চলে যাবে এবং অপর দল ইমামের পশ্চাতে হাযির হয়ে নামায আদায় করবে। এ দায়িত্ব পালনে এতটুকু গাফলত বা অবহেলা করা চলবে না। পবিত্র কোরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ নামাযে অসলতা মুনাফেকের বৈশিষ্ট্য।

وَاِذَا قَامُوْٓا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى

যখন মুনাফেকেরা নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন তারা আলস্য করে। এমনকি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একথাও এরশাদ করেছেন ঃ নামায পরিত্যাগ করার পর সেই বে-নামাযী ব্যক্তির মধ্যে এবং কাফেরের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না; বরং সে কুফরের সীমানায় পৌঁছে যায়। যে নামায আদায় করে সে যেন ঈমানের সুশীতল ছায়াতলে থাকে পক্ষান্তরে যে নামাযের ব্যাপারে গাফলত করে সে যেন কুফরের উত্তপ্ত রৌদ্রে তার স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়।

নামায ধর্মের খুঁটি

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে এরশাদ করেছেন ঃ

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

যে ব্যক্তি এ খুঁটিকে বিনষ্ট করে সে যেন ধর্মকেই বিনষ্ট করে ফেলে, অর্থাৎ ইসলামের ইমারত যে পাঁচটি রোকন বা স্তম্ভের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, তন্মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হলো নামায, অতএব যে নামাযের ব্যাপারে গাফলত করে, নামায আদায়ে অবহেলা করে সে যেন ইসলামের এ ইমারতটি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করে।

আধুনিক মনের জিজ্ঞাসা ও জবাব

আধুনিক মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হতে পারে যে, নামাযের জন্যে এত তাগিদ কেন? পবিত্র কোরআনের শতাধিক আয়াতে এর প্রতি এত বেশী গুরুত্বারোপ করা হয়েছে কেন?

এ প্রশ্নের জবাব দেখতে পাই আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানে, কোন ব্যক্তি যদি কোন রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার লাভ করতে চায় তবে তার প্রথম ও প্রধান শর্ত হলো সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, সে দেশের বা সে রাষ্ট্রের সমস্ত আইন কানুন মেনে চলার জন্যে প্রস্তুত থাকা।

পক্ষান্তরে যদি কোন ব্যক্তি সে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অস্বীকৃতি জানায়, আইন কানুন মেনে চলতে আপত্তি জানায় তথা বিদ্রোহী হয় তবে সে ব্যক্তিকে নাগরিক অধিকার দেয়া হয় না এমনকি, তার অস্তিত্বও সহ্য করা হয় না, তাকে কোন অবস্থাতে ক্ষমার যোগ্য বলে মনে করা হয় না। এটি সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত নিয়ম, এর ব্যতিক্রম হয় না কোন অবস্থাতেই, কোন দেশেই।

নামাযের মাধ্যমে মানুষ বিশ্ব-স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁর প্রতি আত্মসমর্পণের, তাঁর আইন কানুন মেনে চলার সংকল্প প্রকাশ করে। স্বীয় দ্বীনতা হীনতা প্রকাশ করে, মনের কাকুতি-মিনতি জানিয়ে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করে নামাযে দণ্ডায়মান হয়েই সূরা ফাতেহায় মানুষ সর্ব প্রথম মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এ আনুগত্যের শপথ করে এভাবে ঃ

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

হে আল্লাহ! আমরা শুধু তোমারই বন্দেগী করি। তোমারই সমীপে আত্মসমর্পণ করি, আর তোমারই আইন কানুন মেনে চলার শপথ করি। আর এ গুরু দায়িত্ব পালনে তোমারই সাহায্য কামনা করি। কিন্তু যারা নামায আদায় করেনা তারা যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনা। যিনি এ বিশাল আসমান, এ সুবিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে, সমগ্র বিশ্ব মানবকে, যিনি মানব জাতিকে লালন-পালন করেন, যাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত মানুষ অহরহ ভোগ করছে তাঁর প্রতি আনুগত্যের অভাব হলে তাঁর আইন কানুন মেনে চলতে অস্বীকৃতি জানালে, তার শাস্তি বিধান কি অযৌক্তিক? তার ব্যাপারে কোন বিধি-বিধান প্রবর্তন করা কি অনুচিত? অবশ্যই নয়। এজন্যেই ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে কোন মুসলমান নামধারী ব্যক্তি নামায আদায় না করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গ্রেফতার করতে হবে এবং তওবা না করা পর্যন্ত তাকে বন্দী রাখতে হয়। অন্য ইমামগণের মতে এই শাস্তি আরও কঠিন আরও কঠোর করতে হবে। অবশ্য এ অবস্থা শুধু তখনই সম্ভব যখন কোন দেশে ইসলামী অনুশাসন সম্পূর্ণরূপে প্রবর্তিত হয়, ঠিক যেভাবে কোন লোক সম্পর্কে যখন এ সন্দেহ হয় যে, লোকটি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত নয় তখন সঙ্গে সঙ্গে তাকে বন্দী করা হয়, তাকে মুক্ত রাখা দুনিয়ার কোন রাষ্ট্রেই সমীচীন মনে করা হয় না। তবে যিনি ত্রিভূবনের মালিক, যিনি সর্ব শক্তির মূল উৎস, তাঁর অবাধ্য হলে তাকে কোন যুক্তিতেই ক্ষমার যোগ্য মনে করা হবে না।

এই বিধান তাদের জন্যে যারা কালেমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান বা বিশ্বাসের শপথ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস করেনা নিজেকে মুসলমান বলে জাহির করে না আল্লাহ্ পাক তাদেরকে দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জিন্দেগীতে অবকাশ দিয়ে থাকেন। পরকালীন জিন্দেগীতেই হবে তাদের বিচার। নামাযের এমনি গুরুত্ব রয়েছে বলেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

اَوَّلُ مَايُحَاسَبُ بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلٰوةُ- الحديث

সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব

কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম নামাযের হিসাব গ্রহণ করা হবে। যদি নামাযের হিসাব শুদ্ধ হয় তবে অন্যান্য আমলও শুদ্ধ বলে পরিগণিত হবে।

সর্বোত্তম আমল নামায

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন ঃ একবার এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো সর্বোত্তম আমল কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার জবাবে এরশাদ করলেন ঃ নামায। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলো অতঃপর কি? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, নামায। লোকটি পুনরায় অনুরূপ প্রশ্ন করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তৃতীয় বারও উত্তর দেন, নামায। যখন লোকটি চতুর্থবার সেই একই প্রশ্ন উত্থাপন করে তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে জেহাদ।

তেবরানী বর্ণিত আরও একখানি হাদীসে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ

وَاعْلَمُوْا اَنَّ اَفْضَلَ اَعْمَالِكُمُ الصَّلٰوةُ

"জেনে রাখ নামাযই তোমাদের সর্বোত্তম আমল"।

নামাযের দৃষ্টান্ত

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ তোমাদের কারো বাড়ীর দ্বার প্রান্তে যদি কোন নহর প্রবাহিত হয় আর সে তাতে দৈনিক পাঁচবার গোসল করে তবে কি দেহে কোন প্রকার ময়লা বা অপবিত্রতা থাকতে পারে? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বললেন, 'না'। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ পাঁচবার নামাযের দৃষ্টান্তও তেমনি, পাঁচবার নামায আদায় করার পরও কোন গুনাহ অবিশিষ্ট থাকে না। নামায গুনাহকে মুছে ফেলে। (বোখারী ও মুসলিম)

নামায গুনাহ্ দূরীভূত করে

হযরত আবু আইউব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ নামায তার পূর্বের গুনাহ সমূহ (ছগিরা গুনাহ) দূর করে দেয় (কবীরা গুনাহ তওবা ব্যতীত মাফ হয় না)।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায এবং জুমআর নামায পরবর্তী নামায ও জুমআ পর্যন্ত অন্তবর্তী কালের কবীরা গুনাহ ব্যতীত সগীরা গুনাহ-সমূহের জন্যে কাফ্ফারা। (মুসলিম) অর্থাৎ এই নামায সমূহ সগীরা গুনাহকে দূরীভূত করে।

নামায পাপ প্রতিরোধক

নামাযের মাধ্যমে শুধু যে সগীরা গুনাহ্ মাফ হয় তাই নয়, বরং নামায অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরতও রাখে। পবিত্র কোরআনের ঘোষণা এ পর্যায়ে সুস্পষ্ট। এরশাদ হয়েছে ঃ

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ط اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

এবং তোমরা নামায কায়েম কর, নিশ্চিত ভাবে জেনে রাখ যে, নামায ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কাজ সমূহ থেকে মানুষকে বিরত রাখে। কেননা নামাযের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্যের ও তাঁর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের শপথ গ্রহণ করা হয়। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর বিধি-নিষেধ পালনের প্রতিজ্ঞা করা হয়।

বিশেষ করে নামাযের প্রারম্ভেই সূরায়ে ফাতেহায় "সীরাতুল মুস্তাকীম" বা সরল সঠিক পথ লাভের জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে মুনাজাত করা হয়। এমন অবস্থায় যে নিয়ম কানুন মোতাবেক, আরকান ও আহকাম ঠিক করে নামায আদায় করবে সে নামায তাকে অবশ্যই ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ থেকে, পাপ-পংকিলতা থেকে আত্মরক্ষা করতে সাহায্য করে। মানুষ যখন নিজেকে একান্ত ভাবে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করে, মন যখন আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সুখ দুঃখের চিন্তায় যখন মানব মন চিন্তিত হয়, মনের এ অবস্থা নিয়ে যখন মানুষ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ রব্বুল আলামীনের দরবারে বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হয়, আরও অধিক বিনয় প্রকাশ করার নিমিত্তে আল্লাহ্র দরবারে রুকু করে, এমনকি অবশেষে আত্মসমর্পণের পূর্ণ পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে সেজদারত হয়। তখন এই নামায মানুষকে অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে ও পাক-পংকিলতা থেকে বিরত রাখে। এটি যেমন স্বাভাবিক তেমনি বাস্তব সত্য।

আধুনিক বিশ্বের সমস্যা সমাধানে নামায

আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অপরাধ দমনের সর্বাধুনিক প্রচেষ্টা পর্যন্ত ব্যর্থ হওয়ায় শান্তিকামী মানুষ প্রায় নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশেই

চলছে হানাহানি, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, অরাজকতা, অবিচার, ব্যাভিচার, দুর্নীতি এক কথায় মানবতার চরম অবমাননা হচ্ছে অহরহ। মানুষ স্বার্থান্ধ হয়ে পশুত্বের পর্যায়ে অবনমিত হয়েছে। বর্বরতার যুগ তথা আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগকেও এই তথাকথিত সভ্যতার যুগের আধুনিক মানুষ হার মানিয়েছে, মানবতার উৎকর্ষ সাধনের সফল জাগতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ব্যর্থতার গ্লানি ভোগ করছে আজকের পৃথিবীর অগণিত মানুষ। জেল হাজত এমনকি, মৃত্যদণ্ড পর্যন্ত আধুনিক যুগের চরম অপরাধ প্রবণতাকে রোধ করতে পারেনি।

এ পর্যায়ে আসমানী ব্যবস্থা তথা আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রদত্ত ব্যবস্থার প্রতি আজও মানুষ গাফেল। কিন্তু নিরাশ হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। আল্লাহ্ পাক মানুষের চরিত্রকে সুসংহত, সুসংযত করার তথা নৈতিক মান উন্নত করার যে ব্যবস্থা দিয়েছেন তার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত এ পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করা সুকঠিন। তাই পবিত্র কোরআনের ঘোষণা হলো নামায পাপ প্রতিরোধক, অন্যায় অবিচার পাপাচারের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হলে গ্রহণ করতে হবে নামাযের কর্মসূচী।

আধুনিক বিশ্বে সকল সুখ-সামগ্রী থাকা সত্ত্বেও মানুষের জীবনে শান্তি নাই। জীবন দুর্বিষহ, প্রাণ ওষ্ঠাগত কেননা, মানুষই আজ মানুষের জন্যে আতংকের কারণ। এ যুগে জঙ্গলের সর্প, বিচ্ছু ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুকে মানুষ ভয় করেনা, ভয় করে সর্বাধুনিক পোষাক পরিহিত কেতা দুরস্ত, স্বার্থান্ধ হামলায় উদ্দত তথাকথিত মানুষকে।

মানবতার অবমাননায় লিপ্ত, সভ্যতার কলংক, দুরন্ত দুরাচার মানুষকে সত্যিকার মানুষ রূপে গড়ে তোলার, পথভ্রষ্ট মানুষকে পথে আনার শক্তি যে কোন জাগতিক ব্যবস্থায় নেই, একথার সত্যতার প্রমাণ আধুনিক বিশ্বের ইতিহাস।

এমনি অবস্থায় পবিত্র কোরআন প্রদত্ত ইসলামের নির্দেশিত পন্থা অবলম্বন অবশ্য কর্তব্য। আর সে পন্থা হলো যথা নিয়মে নামায কায়েম করা। যা মানুষকে কুকর্ম, কুচিন্তা থেকে বিরত রাখে। প্রশ্ন হতে পারে বহু নামাযী ব্যক্তিকেও অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকতে দেখি– নামায যে তাদেরকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে না!

এ প্রশ্নের জবাব হলো, নামাযের মত নামায হতে হবে। এর আরকান ও আহকাম সঠিক হতে হবে। যথা সময়ে যথা নিয়মে হতে হবে। এর মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে। মসজিদে হাযির হলাম, কি পড়লাম তা বুঝলাম না। আমি নিজে কি পড়লাম, কি বললাম কি করলাম- এর কোনটিই উপলব্ধি করলাম না, শুধু একটি নিয়ম পালন করলাম। এমনি প্রাণহীন নামায অন্যায় থেকে মানুষকে কিভাবে বিরত রাখতে পারে? কোন রোগের অব্যর্থ মহৌষধ যদি যথা নিয়মে যথা সময়ে শর্ত পালন করে সেবন না করা হয় তবে রোগ নিরাময় হয় না। আর এজন্যে কোন বুদ্ধিমানই ঔষধের উপকারীতা সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করেনা; বরং ঔষধ সেবনের নিয়ম পালন না করারই সমালোচনা করা হয়। ঠিক এমনিভাবে নামায যে পাপ প্রতিরোধক এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এ পর্যায়ে আমাদের অবহেলা সীমাহীন। এর নিয়ম কানুনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ নেই অথচ তার উপকারীতার জন্যে উদগ্রীব। এ নীতি অচল, অকেজো।

হযরত হাতেম আসেমের নামায

এ পর্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই হযরত হাতেম আসেমের নামাযে। একবার এসাম এবনে ইউসুফ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে তাঁর নামায আদায়ের কায়দা কানুন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ যখন নামাযের সময় হয় তখন আমি দু' প্রকার অজু করিঃ অর্থাৎ জাহেরী ও বাতেনী বা প্রকাশ্য ও গোপনীয়। প্রকাশ্য অজুঃ অজুর যা নিয়ম কানুন রয়েছে তা পালন করি। অপ্রকাশ্য অজুঃ অর্থাৎ আমার পাপ কাজের জন্যে আল্লাহ্ পাকের দরবারে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই, তওবা করি। এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লোভ লালসা পরিত্যাগ করি, মনের নিভৃত কোণ থেকে হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি দূরীভূত করি। এরপর মসজিদে উপস্থিত হয়ে বিনীত ভাবে কেবলা মুখী হয়ে দণ্ডায়মান হই। অবস্থা এই, যেন আমি পবিত্র কা'বা শরীফকে দেখছি। আল্লাহ্ পাক যেন আমাকে দেখছেন। বেহেশ্‌ত যেন আমার ডান পার্শ্বে, আর দোযখ থাকে আমার বাম পার্শ্বে। মৃত্যুদূত আজরাঈল (আঃ) থাকে আমার পশ্চাতে। আমি যেন পুলসিরাতের উপর পা রাখি। তখন আমি একথা মনে করি যে, এ নামাযই আমার জীবনের শেষ নামায। পরে নামাযের নিয়ত করি। অত্যন্ত চিন্তা সহকারে সূরা সমূহ পাঠ করি। অতি বিনয়ের সাথে রুকু, সেজদা আদায় করি। বহু আশা আকাঙ্ক্ষা করে তাশাহহুদ পড়ি। এভাবে বিগত ৩০ বছর যাবত আমি নামায আদায় করছি।

বস্তুতঃ এমনিভাবে নামায আদায় করলে তা অবশ্যই মানুষকে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত রাখবে। আধুনিক বিশ্বের বহু জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান করবে। এ পর্যায়ে আরও দু-একটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

হযরত আলীর (রাঃ) চরণে একটি বর্শা এমনভাবে বিদ্ধ হলো যা বের করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ আমার আলী (রাঃ) যখন নামাযে দণ্ডায়মান হবে তখন তোমরা তা খুলে ফেলবে। বাস্তবেও তাই ঘটলো। হযরত আলী (রাঃ) যখন নামাযে দণ্ডায়মান হলেন তখন বর্শাটি টেনে খুলে ফেলা হলো। কিন্তু তিনি তার খোঁজও পাননি যে কখন কি হয়েছে। এভাবে আল্লাহ্‌র প্রিয় বন্দাগণ নামায আদায় করতেন। আর এমনি নামায অবশ্যই পাপ প্রতিরোধাক।

একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দু' জন সাহাবীকে সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। তাঁরা উভয়ে রাত্রিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিলেন অর্থাৎ প্রথম অর্ধেক একজন প্রহরায় রত থাকবেন, শেষার্ধে আরেকজন এ দায়িত্ব পালন করবেন, ফলে উভয়েই বিশ্রামের সুযোগ পাবেন।

এ ব্যবস্থা মোতাবেক একজন নিদ্রামগ্ন হলেন আর অন্যজন নামাযে দণ্ডায়মান হলেন। এমন সময় দুশমনের দিক থেকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হলো, একটু পর আরেকটি তীর, এভাবে একে একে দুটি তীর তাঁর চরণে বিদ্ধ হলো, মুজাহিদের দেহ

থেকে তাজা রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল কিন্তু তবু নামায পরিত্যাগ করলেন না। পরে দেখলেন এভাবে থাকলে হয়তো দুশমনের স্পর্ধা আরো বৃদ্ধি পাবে, তারা মুসলমানদের দুর্বল মনে করে আক্রমণের দুঃসাহস দেখাবে এবং এতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ লংঘনের এবং তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলা করার ভয়ও ছিল। তাই তাঁর ঘুমন্ত সাথীকে তিনি জাগ্রত করলেন। এদিকে হানাদার বাহিনী লক্ষ্য করলো ইতোপূর্বে একজন মুসলমান ছিলেন, এখন আরও একজন এসেছেন, হয়তো আরও মুসলিম সৈন্য অবিলম্বে এসে পড়বে তাই তারা পলায়ন করলো। উক্ত সাহাবী বললেন ঃ যদি কাফেরের আক্রমণের ভয় না থাকত তবে তীর যতই আসুক না কেন, আমি নামায পরিত্যাগ করতাম না। নামাযে সূরা কাহাফ পাঠ করা শুরু করেছিলাম, তা তেলাওয়াত শেষ করেই সালাম ফেরাতাম। (আবু দাউদ শরীফ)

নামায জাতীয় জীবনের উন্নতির কারণ হয়

ইতিহাস সাক্ষী! আমাদের জাতীয় জীবনের স্বর্ণ যুগে নামাযের প্রতি এমনি গুরুত্বই আরোপ করা হতো, আর এটিই ছিল তাঁদের উন্নতি অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির মূল কারণ। কেননা, নামাযের মাধ্যমে যেমন মানুষ আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভে সমর্থ হয়, মনের পবিত্রতা অর্জনের সুযোগ পায়, অন্যায় অসুন্দর কাজ থেকে আত্মরক্ষা পারে, তেমনি নামাযের মাধ্যমে জাতীয় জীবনের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখা, পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা ও সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি করাও সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য, জাতীয় জীবনের উন্নতির জন্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি পূর্ব শর্ত। প্রথমে মহল্লার প্রতিটি মুসলমান দৈনিক ৫ বার নামাযের জামাআতে একত্রিত হবার কারণে তাদের মধ্যে অতি স্বাভাবিকভাবেই ভাবের আদান প্রদান হয়, পরস্পরের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়, সৌহার্দ ও বন্ধুত্বের ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরপর আরও বড় এলাকার মুসলমান শুক্রবারে জুমআর জামাআতে একত্রিত হয়। এরপর দু' ঈদের দিনে সমস্ত শহরের বা গ্রামের সকল মুসলমান ঈদগাহে একত্রিত হবার কারণে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পায়, এরপর সমগ্র মুসলিম জাহানের একত্রিত হবার সুযোগ আসে ঐতিহাসিক আরাফাতের ময়দানে হজ্জের মওসুমে। এভাবে নামাযের মাধ্যমেই মুসলমানদের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করার তথা জাতীয় উন্নতি অগ্রগতি লাভের সুবর্ণ সুযোগ আসে। পবিত্র কোরআনে তাই এরশাদ হয়েছে ঃ

لَئِنْ اَقَمْتُمُ الصَّلٰوةَ وَاٰتَيْتُمُ الزَّكٰوةَ وَاٰمَنْتُمْ بِرُسُلِىْ .....فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ (সূরা মায়েদা)

"যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত আদায় কর নিয়মিত ভাবে এবং আমার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর ও আল্লাহ্ পাককে করজ দান কর (তথা

আল্লাহ্ রাহে ব্যয় কর মানবতার কল্যাণে, আর্তের সেবায় অর্থ সম্পদ দান কর) তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের গুনাহ দূরীভূত করব এবং তোমাদেরকে এমন একটি বেহেশতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত হবে। তবে এরপরও যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কুফরী ও নাফরমানী করে তবে সে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়েছে"।

মুসলিম জাতির গৌরবোজ্জ্বল যুগের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আমাদের পূর্ব পুরুষগণ নামাযের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করতেন, এটিই ছিল তাঁদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, এ যুগে আমরা এ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি। এ যুগে নামায আদায় না করেও মুসলমান থাকা যায় কিন্তু পূর্ব যমানায় তা ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। এজন্যে বর্তমান যুগকে মুসলিম জাতির দুর্দিন বা দুযোগ বলা যেতে পারে। শুধু এজন্যে নয় যে, পৃথিবীর বহু দেশে মুসলমানগণ ক্ষমতাচ্যুত এবং বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে বরং এজন্যেও যে, আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শকে বিস্মৃত করেছি, জাতীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি, জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছি, জাতীয় শিক্ষার প্রতি অবহেলা করেছি, জাতীয় জীবনের উন্নতি-অগ্রগতির সকল পথ নিজেরাই বন্ধ করে দিয়েছি। পরানুকরণই এখন মুসলমানদের বৈশিষ্ট্য, আত্মবিস্মৃত, বিভ্রান্ত মুসলিম জাতি তাই আজ দিশেহারা।

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানগণ নামায রোজা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে বরং আমাদের কিছু লোক আজও নামায রোজায় অভ্যস্ত। নামায আজও আছে তবে প্রাণহীন অবস্থায়। যে মুয়াজ্জিনের ডাকে সাড়া দিয়ে মুসলমান একত্রিত হতো এবং আল্লাহু আকবর বলে আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা বর্ণনা করে আল্লাহ ছাড়া আর সব কিছুকে পদদলিত করতো, সে মুসলমান আজ আর নাই, সেই মুয়াজ্জিনের বেলালী কণ্ঠও আজ আর নেই এবং সে নামাযও আর নেই।

نماز روزہ قربانی وحج
یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے
صفین کج دل پریشان سجدہ بے ذوق
کہ جزب اندروں باقی نہیں ہے

অর্থাৎ নামায, রোজা, হজ্জ, কোরবানী সবই ঠিক আছে, কিন্তু এ সমস্ত পর্বে ইতোপূর্বে যে প্রাণ প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হতো তা আজ আর নেই। কাতার বাঁকা, অশান্ত অন্তর, অনুভূতিহীন সেজদা এর কারণ এই যে, পূর্বের ন্যায় মুসলমানদের মধ্যে সেই সদ্ভাব, সহযোগিতা, আকর্ষণ, উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিদৃষ্ট হয় না।

مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے
یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے

মসজিদ সমূহ আজ শোকে মুহ্যমান এজন্যে যে, তারা আজ নামাযীর সাক্ষাত পায় না। অর্থাৎ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মহান আদর্শের অনুসারী নামাযী আজ আর পরিলক্ষিত হয় না।

আমাদের বুজুর্গানে দ্বীন নামাযকে জীবনের সবেচেয়ে বড় সম্পদ এবং সাফল্য মনে করতেন, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজই তাঁদের নিকট ছিল না, ইহকালেও না, পরকালেও না। তাই হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ মোহাজেরে মক্কী (রঃ) বলেছিলেন ঃ যদি কেয়ামতের দিন আমাকে আল্লাহ্ পাক কোন আকাঙ্ক্ষা পেশ করার অনুমতি দান করেন তবে আমি আরজ করব, হে আল্লাহ্! "তোমার আরশের সুশীতল ছায়াতলে দণ্ডায়মান হয়ে তোমার দীদার লাভে ধন্য হয়ে দু' রাকাআত নামায আদায় করার অনুমতি দাও"। কেননা যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের দীদার লাভ না করেই সেজদায় রত থাকতেন এবং তাতেই পরম আনন্দ ও তৃপ্তি এবং শান্তি লাভ করতেন আর নামাযকে জীবনের সর্ব শ্রেষ্ঠ সম্পদ মনে করতেন, তাঁদের মনের গহনে অতি স্বাভাবিক ভাবেই আল্লাহ্ পাকের দরবারে উপস্থিত হয়ে, তাঁর আরশের ছায়াতলে দণ্ডায়মান হয়ে, তাঁর দীদারে ধন্য হয়ে সেজদায়ে রত হবার আকাঙ্ক্ষা জাগবে। এ অবস্থা শুধু সুফী বুজুর্গদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, মুসলিম বীর মুজাহেদগণ সারাদিন রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতেন, দিনের শেষে শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় তাঁবুতে প্রত্যার্বতন করতেন এবং সারারাত নামাযে রত থাকতেন এবং আল্লাহ্র দরবারে স্বীয় কাকুতি মিনতি প্রকাশ করতেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধে একজন শত্রু সেনাধ্যক্ষ বলেছিলেন, মুসলিম জাতিকে পরাজিত করা আমাদের শক্তির উর্দ্ধে কেননা, তারা দিনে বাঘ আর রাতে ফেরেশতা।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর নামায

অনেক মুসলিম মনীষী এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করতেন কেননা, তাঁরা এশার নামায শেষে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন না, বরং সারা রাত নামাযে রত থাকতেন। আমাদের ইমাম আবু হানিফা (রাঃ) সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। এজন্যে ইমাম শা'বী (রঃ) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন ঃ এমন কোন দিন দেখিনি যেদিন ইমাম সাহেব রোজাদার ছিলেন না, আর কোন রাতও দেখিনি যে রাত তিনি আল্লাহ্র দরবারে দণ্ডায়মান হয়ে নামাযে রত অবস্থায় অতিবাহিত করেননি।

অতএব, মুসলমান মাত্রকে এ পর্যায়ে তার দায়িত্ব পালন করতে হবে। জাতির উন্নতির নিমিত্ত নামাযের কর্মসূচীকে সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করতে হবে। নামাযের ব্যাপারে গাফলত বা অবহেলা আত্মহত্যারই নামান্তর কেননা, আল্লাহ্র অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে মুসলিম জাতির বাঁচার কথা, উন্নতি অগ্রগতির কথা চিন্তাও করা যায় না। নামাযই এ ব্যাপারে কষ্টি পাথর ও মানদণ্ড। যে নামায কায়েম করলো, যথা নিয়মে এর মর্ম ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে, সে আল্লাহ্ পাকের সাথে স্বীয় সম্পর্ককে ঘণিষ্টতর করে তুললো, তাঁর সান্নিধ্য ও সন্তুষ্টি লাভে সফল হলো এবং পাপ-পংকিলতা থেকে

আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সফল হলো এবং জাতীয় জীবনের উন্নতির অগ্রগতি সাধনে, ঐক্য ও সংহতি রক্ষায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলো (আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর তওফিক দান করুন)।

وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى

অর্থাৎঃ "সকল নামাযের হেফাজত কর এবং মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে সতর্ক থাক"।

মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি এ ব্যাপারে তফসীরকার বিশেষজ্ঞ ওলামাদের মত বিরোধ রয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথম কথা হলো আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে সতর্ক থাকার তাগিদ করেছেন, কিন্তু মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি তা নির্দিষ্ট করেননি, এতে হেকমত হলো সকল নামাযের প্রতি যেন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যেভাবে লায়লাতুল কদর কোন্ রাত্রি? তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; বরং রমজানের শেষ দশ দিনের বেজোড় রাত সমূহে গোপন রাখা হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ পাকের পবিত্র নাম সমূহের মধ্যে এস্‌মে আযমকে গোপন রাখা হয়েছে। জুমআর দিনে একটি বিশেষ মুহূর্ত রয়েছে যখন আল্লাহ্ পাক বন্দাদের দোয়া কবুল করেন, কিন্তু সেই মুহূর্তটি কখন তা সারাদিনের মধ্যে গোপন রয়েছে। যেমন মানুষের মৃত্যুর সময়কে গোপন রাখা হয়েছে যাতে করে মানুষ সকল সময়েই মৃত্যুর ব্যাপারে সতর্ক থাকে, ঠিক এমনিভাবে মধ্যবর্তী নামাযের তাগিদ করেও তাকে গোপন রাখা হয়েছে, যেন প্রত্যেকটি নামায সম্পর্কে মানুষ সর্তকতা অবলম্বন করে।

মোহাম্মদ এবনে সিরীন বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি যায়েদ এবনে সাবেতকে (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি। তিনি বললেন, সকল নামাযকে সঠিকভাবে আদায় কর তাহলেই তুমি মধ্যবর্তী নামায পাবে।

এক ব্যক্তি রবী এবনে হায়সমের নিকট মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো, তিনি বললেন, যদি তুমি মধ্যবর্তী নামায কোন্‌টি জানতে পার তবে তার হেফাজত করবে কিন্তু অন্য নামাযগুলো বিনষ্ট করবে। প্রশ্নকারী বললো যে, না তা হবে না, তখন রবী বললেন, তুমি সমস্ত নামায সঠিক ভাবে আদায় কর তাহলেই মধ্যবর্তী নামায পাবে।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মধ্যবর্তী নামায সম্পর্কে মত বিরোধ ছিল। তাঁদের একদল ফজরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায মনে করতেন। যেমন হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ), হযরত আবু উমামা আল বাহেলী (রাঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম ফজরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায মনে করতেন। আর তাবেয়ীনদের মধ্যে তাউস (রহঃ), আতা (রহঃ), একরামা (রহঃ), মুজাহেদ (রহঃ) ফজরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায মনে করতেন এবং এটিই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মাজহাব। যারা এ মত পোষণ করেন তাদের দলিল হলো ঃ

(১) এ নামাযটি অন্ধকারে শুরু হয় মনে হয় রাতের নামায। আর শেষ হয় আলোতে মনে হয় দিনের নামায। অতএব, ফজরের নামাযই মধ্যবর্তী নামায।

(২) ফজরের নামায সোবহে সাদেকের পর সূর্যোদয়ের পূর্বে আদায় করা হয়, যখন পূর্ণ অন্ধকারও থাকে না পূর্ণ আলোও থাকে না। অতএব, এ নামায রাত ও দিনের মধ্যবর্তী নামায।

(৩) দিনের বেলা দু'টি নামায অর্থাৎ জোহর ও আসর আর রাতে দুটি নামায অর্থাৎ মাগরেব ও এশা। আর রাত ও দিনের এ নামায সমূহের মাঝে হলো ফজরের নামায।

(৪) আরফার ময়দানে ও হজ্জের সময় জোহর আসর একত্রে আদায় করতে হয়। এমনিভাবে মোজদালেফায় মাগরিব ও এশা একত্রে আদায় করতে হয়। অতএব, জোহর ও আসরের একই সময় কিন্তু ফজরের নামাযের সময় স্বতন্ত্র এবং তা মধ্যবর্তী।

(৫) পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, ফজরের নামাযের সময়ই জ্বীন এবং ফেরেশতাগণ একত্রিত হয়। ফজরের নামায ব্যতীত অন্য কোন নামাযের সময় ফেরেশতাগণ এভাবে একত্রিত হন না। যেহেতু রাত ও দিনের মধ্যবর্তী সময় হলো ফজরের সময় তাই এ নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলা হয়।

(৬) وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى শব্দটির পরেই আল্লাহ্ পাক কুনুতের উল্লেখ করেছেন, ফজরের নামায ব্যতীর্ত অন্য কোন নামাযে কুনুতের ব্যবস্থা নেই।

এতে একথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, মধ্যবর্তী নামায হলো ফজরের নামায।

(৭) আল্লাহ্ পাক সমস্ত নামাযের তাগিদ করার পর বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লেখ করেছেন মধ্যবর্তী নামাযের, ফজরের নামায সবচেয়ে কঠিন। মানুষকে সুখ-নিদ্রা পরিত্যাগ করে নামাযে হাযির হতে হয়। এজন্যে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের অন্য একটি দল আসরের নামাযকে মধ্যবর্তী নামায বলেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ), হযরত আব হোরায়রা (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)। এতদ্ব্যতীত ইমাম নখয়ী (রঃ), কাতাদা (রঃ), যাহ্যাক (রঃ)-ও মধ্যবর্তী নামায হিসেবে আসরের নামাযকে চিহ্নিত করেছেন। আর এটি ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মাযহাব। তাঁদের দলীল হলো-

(১) হযরত আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস, তিনি বর্ণনা করেনঃ পঞ্চম হিজরীতে অনুষ্ঠিত খন্দকের যুদ্ধের দিন ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে আছরের নামায আদায় করা সম্ভব হয়নি। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ এ কাফেররা সালাতুল উসতা বা মধ্যবর্তী নামায থেকে আমাদেরকে বিরত রেখেছে। আল্লাহ্ পাক তাদের ঘর এবং কবরকে আগুন দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিন। এই হাদীস সংকলিত হয়েছে

বোখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফে। আর মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে ঃ

شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ

অর্থাৎ কাফেররা আমাদেরকে বিরত রেখেছে মধ্যবর্তী নামায তথা আসরের নামায থেকে।

(২) হাদীস শরীফে আসরের নামাযের জন্যে যে তাগিদ এসেছে অন্য কোন নামাযের জন্যে তা আসেনি। একখানি হাদীসে প্রিয়নবী সালল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেল, তার জান-মাল যথাসর্বস্ব নষ্ট হলো।

এতদ্ব্যতীত আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে আসরের শপথ করেছেন সূরায়ে ওয়াল আসরে ঃ

وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ

(৩) যেহেতু আসরের সময় অধিকাংশ মানুষ কর্ম-ব্যস্ত থাকে এবং এ সময় নামাযের ব্যাপারে গাফলত হওয়ার আশংকা থাকে অনেক বেশী, তাই আসরের নামাযের তাগিদ করে এরশাদ হয়েছে ঃ 'ওয়াসসালাতুল উসতা'। আল্লামা ওসমানী (রহঃ) তাঁর ফাওয়ায়েদে ওসমানীতে লিখেছেন, মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামাযই উদ্দেশ্য।[১]

হযরত আবদুল্লাহ এব্নে আব্বাস (রাঃ)-এর তফসীরে সালাতুল উসতার ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "সালাতুল আসর" অর্থাৎ তোমরা সকল নামাযের হেফাজত কর বিশেষতঃ আসরের নামাযের ব্যাপারে সতর্ক থাক।[২]

কেননা, আসরের নামাযের সময় হাট-বাজার জমজমাট থাকে, গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে।[৩] এজন্যে এ নামাযের প্রতি এত তাগিদ।

মুসলিম শরীফে রয়েছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকার (রাঃ)-এর আজাদ করা গোলাম আবি ইউনুস বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হুকুম করেন, আমার জন্যে একখানা কোরআন শরীফ লিপিবদ্ধ কর, এরপর তিনি আরও বলেন ঃ যখন এ আয়াত পর্যন্ত পৌঁছ (আলোচ্য আয়াত) তখন আমাকে খবর দিও, আমি তাঁর নির্দেশ মোতাবেক তাঁকে খবর দিলাম তিনি আয়াত খানি এভাবে লিখে দিলেন ঃ

---

(১) তফসীরে কবীর, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৮-৫১

(২) ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা ৪৯

(৩) তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা ৩৫
তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা - ৫৪৪

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ

অর্থাৎঃ মূল আয়াতেই সালাতিল আসরের উল্লেখ করেছেন অতঃপর তিনি বললেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শ্রবণ করেছি।

সাহাবী হযরত বারা এবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করেন, আয়াত খানি সর্ব প্রথম এভাবেই নাযিল হয়েছিল, যতদিন আল্লাহ্‌র মর্জি ছিল আমরা এভাবেই তেলাওয়াত করেছি, পরবর্তীতে আল্লাহ্‌পাক 'সালাতুল আসর' শব্দটিকে মনছুখ করেন। (মুসলিম শরীফ)

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

"এবং আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে বিনয় ও আদবের সাথে দণ্ডায়মান হও"।

হযরত যায়েদ এবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায আদায় করতাম এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাও বলতাম তখন এ আয়াত নাযিল হলো এবং নামাযে কথা-বার্তা বলা নিষিদ্ধ হলো।

এবনে জরীর (রহঃ) মুজাহেদ (রহঃ)-এর একটি বর্ণনায় উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেন, ইসলামের প্রথম যুগে লোকেরা নামাযে কথা-বার্তা বলতো, কেউ কেউ নামায-রত অবস্থায় তার ভাইকে জরুরী কাজের নির্দেশও দান করতো। অতঃপর এ আয়াত নাযিল হলো এবং নামাযে কথা-বার্তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। মুজাহেদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, কুনুত হলো মনের একাগ্রতা, আল্লাহ্‌র ভয়, রুকুতে দীর্ঘক্ষণ থাকা, দৃষ্টিকে নীচের দিকে নিবদ্ধ রাখা। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, কুনুতের তাৎপর্য হলো নামাযে দীর্ঘক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা। তাউস (রহঃ) বলেন, কুনুতের অর্থ হলো আল্লাহ্‌ পাকের প্রতি আনুগত্য অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ অনুগত হয়ে আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হও।[১]

আল্লামা ওসমানী (রহঃ) লিখেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো খাওয়া-দাওয়া, কথা-বার্তা এক কথায় যে সমস্ত কাজের কারণে নামায হয় না বলে উপলব্ধি করা হয়, সে সমস্ত কাজ বর্জন করে আল্লাহ্‌ পাকের দরবারে বিনীত অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়াই কর্তব্য।

فَاِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا

যেহেতু পূর্বের আয়াতে নামাযের হেফাজত করার হুকুম করা হয়েছে এবং নামাযের আদব রক্ষা করার তাগিদ করা হয়েছে তাই এ আয়াতে যেসব পরিস্থিতিতে নামাযের সকল আদব রক্ষা করা সম্ভব নয় সেসব পরিস্থিতি সম্পর্কে উল্লেখ করা

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৪৫-৫৬

হয়েছে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যখন দুশমনের আঘাতের আশংকা সর্বক্ষণ থাকে তখন নামায পড়তে হবে আরোহী অথবা পদাতিক তথা যে কোন অবস্থায়, এমনকি কেবলার দিকে মুখ ফেরাতে না পারলেও নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর একটি বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন ঃ 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বাড়ীতে অবস্থানকালে চার রাকাআত ফরজ করেছেন, আর সে নামাযই কোন ব্যক্তি সফরে থাকলে দু' রাকাআত পড়া যথেষ্ট। যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভয়ের সময়ে এক রাকাআতই ফরজ করেছেন। আর এ মত পোষণ করেন আতা, তাউস, হাসান, মুজাহেদ এবং কাতাদা (রহঃ) ('সালাতুল খওফ' বা যুদ্ধকালীন অবস্থায় ভয়ের সময়ে নামায সম্পর্কে সূরায়ে নেছায় ইনশা-আল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে)।

فَاِذَآ اَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ

অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ বোধ করবে তখন আল্লাহ্কে স্মরণ কর, যেমন তোমাদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যা তোমরা জানতে না অর্থাৎ তখন তোমরা নামায আদায় কর সমস্ত আরকান আহ্কাম ও শর্ত পূরণ করে।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ

এবং তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে ইন্তেকাল করে তাদের কর্তব্য হলো স্ত্রীদের জন্যে এক বছরের ভরণ-পোষণ বাবদ ব্যয় ব্যবস্থা করা এবং তাদেরকে বাড়ী থেকে বের না করার অসিয়্যত করা।

ইসলামের প্রথম যুগে স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর ইদ্দতের সময় ছিল এক বছর। কিন্তু পরবর্তীতে মীরাছ বা উত্তরাধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত হুকুম আহ্কাম নাজিল হয়। তখন এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের গুরুত্ব রহিত হয়। পরে মীরাছের যে নির্দেশ এসেছে তাতে স্ত্রীর প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট হয়েছে এবং চার মাস দশ দিন ইদ্দতকাল নির্দিষ্ট হয়েছে। ফলে এ আয়াতের নির্দেশ আর অবশিষ্ট নেই।

فَاِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ স্ত্রীর যদি এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই স্বেচ্ছায় ঘর থেকে বের হয়ে যায়, নিজের বিয়ে-শাদী সম্পর্কে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে তবে ওয়ারিষদের তাতে গুনাহ নেই, এমনকি তাদেরকে এমন কাজ থেকে বিরত রাখারও কোন দায়িত্ব নেই।

وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

২৪০ এবং আল্লাহ্ পাক পরাক্রমশালী, তাঁর অবাধ্য হলে তিনি যে কোন প্রকার শাস্তি দিতে পারেন, তিনি বিজ্ঞানময়, তাঁর প্রতিটি কাজই হেকমতপূর্ণ। এজন্যে অবাধ্য অকৃতজ্ঞ লোকদেরকে সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি দেন না।

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعٌۢ
بِالْمَعْرُوْفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿٢٤١﴾ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٤٢﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ
حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ ع ١٥
عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٢٤٣﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٤﴾

তরজমা

(২৪১) এবং তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীলোকদেরকে নিয়মানুযায়ী ভরণ-পোষণ প্রদান করা পরহেযগারদের কতর্ব্য।

(২৪২) এভাবে আল্লাহ্ পাক তোমাদের জন্যে তাঁর আয়াত সমূহ বর্ণনা করে থাকেন যেন তোমরা বুঝতে পার।

(২৪৩) (হে রসূল!) আপনি কি তাদের কথা জানেন না যে, হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুর ভয়ে তাদের বাড়ী থেকে বের হয়েছিল? পরে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ তোমরা মরে যাও। অতঃপর আল্লাহ্ পাক তাদেরকে জীবিত করলেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক মানব জাতির প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না।

(২৪৪) আল্লাহ্র রাহে জেহাদ কর এবং নিশ্চিত ভাবে জেনে রেখ নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

তফসীরুল কোরআন

তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদের খরচ-পত্র নিয়ম মোতাবেক প্রদান করা মুত্তাকীদের একান্ত কর্তব্য। অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলে, পরকালীন জিন্দেগীতে চির শান্তি লাভের আশায় সাধনায়-রত হয়, তাদের কর্তব্য হলো তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদের নিয়ম মফিক খরচ-পত্র বহন করা। এ নিয়মটি আল্লাহ্ পাকেরই তরফ থেকে নির্ধারিত হয়েছে অর্থাৎ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি তার অবস্থা অনুযায়ী এবং অভাবগ্রস্ত লোক তার সাধ্যানুযায়ী তালাক প্রদত্ত স্ত্রীর খরচ-পত্র বহন করবে। তফসীরকারগণ বলেছেন ঃ

যখন এ আয়াত নাযিল হলো–

مَتَاعًا بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থাৎ তালাক প্রদত্ত স্ত্রীদের নিয়ম মাফিক খরচ-পত্র প্রদান করা নেককার মুসলমানদের একান্ত করণীয় কাজ। এ আয়াত শ্রবণ করে এক ব্যক্তি বললো স্ত্রীকে কিছু দান করা সৎ কাজ। যদি সম্ভব হয় তাহলে এই সৎ কাজ করবে পক্ষান্তরে, যদি সম্ভব না হয় তবে করবে না, তখন এ আয়াত নাযিল হয়। এর দ্বারা বিষয়টির গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا- الاية

"(হে রসূল!) আপনি কি তাদের কথা জানেন না? যারা মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী থেকে বের হয়েছিল"।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, পবিত্র কোরআনের একটি নিয়ম হলো যখনই শরীয়তের কোন বিধান বর্ণিত হয় তখনই তার পরে কোন একটি ঘটনার উল্লেখ করা হয়, এখানেও তাই হয়েছে। পারিবারিক জীবনের অনেক বিধান পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে, এ আয়াতে তাই একটি উপদেশমূলক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি বণী ইসরাঈল জাতির।

এ সম্প্রদায়ের কিছু লোক একটি শহরে বাস করতো, তাদের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অভিমতে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে এদের সংখ্যা ছিল চার হাজার। আর অন্য একটি বিবরণে রয়েছে তাদের সংখ্যা ছিল আট হাজার। মতান্তরে নয় হাজার, ত্রিশ হাজার, চল্লিশ হাজার। ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, কোরআনে করীমে যে শব্দ চয়ন করা হয়েছে তা দ্বারা বোঝা যায় যে, সেই এলাকার লোক সংখ্যা দশ হাজারের কিছু বেশী ছিল। যা হোক একথা প্রমাণিত হয় যে, অনেক লোকই ছিল। ঘটনাক্রমে সেখানে একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি 'প্লেগ' দেখা দেয়, তারা এ অবস্থায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে শহর ছেড়ে পলায়ন করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি বিস্তৃত ময়দানে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মনে করেছিল এভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। কিন্তু তারা জানতো না যে, এ পৃথিবীতে যে একবার আগমন করে তাকে অবশ্যই এখান থেকে গমনও করতে হবে। আল্লাহ্ পাক এ সত্য হাতে কলমে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যে তাদের নিকট দু' জন ফেরেশতা প্রেরণ করলেন। তাঁরা ঐ ময়দানের দু' প্রান্তে দাঁড়িয়ে এমন বিকট শব্দ করলেন যে, উপস্থিত সকলেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লো। এদের মধ্যে একজন মানুষও জীবিত রইলো না এমনকি, চার পাশের লোক এসে এ হাজার হাজার মৃত মানুষের ভয়াবহ মৃত্যু দৃশ্য অবলোকন করলো। তাদের চারিদিকে একটি দেয়াল তুলে দিল এবং হাজার হাজার মানুষের মৃত দেহগুলো পঁচে গলে একাকার হয়ে গেল।

অনেক দিন পরে বণী ইসরাঈলের একজন নবী হযরত হিজকীল (আঃ) ঐ স্থান অতিক্রম করার সময় এ ভয়াবহ দৃশ্য দেখলেন এবং মৃত লোকদের ঘটনা সম্পর্কে অবগত হলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে এই বলে দোয়া করলেন ঃ "হে আল্লাহ্! তাদের সকলকে পুনর্জীবন দান কর"। আল্লাহ্ পাক তাঁর দোয়া কবুল করলেন এবং তাঁকে নির্দেশ দিলেন তুমি তাদের হাড়গুলো সম্বোধন করে ডাক, তিনি ডাকলেন- 'হে পুরাতন হাড় সমূহ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে স্ব-স্ব স্থানে একত্রিত হওয়ার আদেশ দিচ্ছেন। আল্লাহ্ পাকের কুদরতের অপূর্ব নমুনা দেখা গেলো, হাড়গুলো আল্লাহ্ পাকের আদেশ শ্রবণ করলো এবং এ আদেশ পালন করে প্রত্যেকটি হাড় স্ব-স্ব স্থানে অনতিবিলম্বে পুনঃ স্থাপিত হলো। এরপর হযরত হিজকীল (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের আদেশ হলো আর একবার হাড় সমূহকে ডেকে গোশত ও চামড়ার আবরণ-গ্রহণের জন্যে আদেশ দিতে। হযরত হিজকীল (আঃ) তাই বললেন, "হে হাড় সমূহ! আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আদেশ করছেন, তোমরা গোশত্ পরিধান কর এবং রগ ও চামড়া দ্বারা সুসজ্জিত হও"।

হযরত হিজকীল (আঃ) এ বাক্য উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে কংকাল মাত্রকে দেখা গেলো এক একটি লাশে পরিণত হতে। এরপর রূহকে সম্বোধন করে বলা হলো- 'হে রূহ বা আত্মা সমূহ, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন তোমরা যেন যার শরীরে পূর্বে ছিলে তার শরীরে ফিরে আস, তাঁর একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের অপূর্ব নমুনা স্বরূপ প্রতিটি মানুষ জীবন্ত অবস্থায় তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান হলো এবং সকলের মুখে একই বাক্য উচ্চারিত হলো- "সোবহানাকা লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা" অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমারই পবিত্রতা বর্ণনা করি, হে আল্লাহ্! তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই।

এ ঘটনায় একথা প্রমাণিত হলো মৃত্যু থেকে পলায়নের চেষ্টা বৃথা কেননা, মৃত্যু জীবনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। জীবন ও মৃত্যু সর্ব শক্তিমান আল্লাহ্ পাকের দুটি আদেশের নাম। একটি আদেশের মাধ্যমে সৃষ্টি আর একটি আদেশের মাধ্যমে লয় হয়, প্রত্যেকটি মানুষের মৃত্যুর জন্যে সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। ঐ নির্দিষ্ট সময় আসার পূর্বে মৃত্যু আসার কোন সম্ভাবনা নাই। কোরআনে করীমে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন ঃ

اِذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَاْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ

"যখন তাদের মৃত্যু আসে তখন এক মুহূর্ত বিলম্বও হয় না, আর তা এক মুহূর্ত পূর্বেও আসে না"।

আর যখন মৃত্যুর সঠিক মুহূর্ত আসে তখন তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারোই নাই। কোরআনে করীমে এ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট ঘোষণা। এরশাদ হয়েছে ঃ

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, যত সুরক্ষিত এমারতেই আত্মরক্ষা করার চেষ্টা কর না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে পাবে"।

এ ঘটনা বর্ণনা করে কোরআনে করীম বিশ্ব-মানবকে এ সত্য উপলব্ধি করার আহবান জানাচ্ছে যে, মৃত্যু থেকে পলায়ন সম্ভব নয়। মৃত্যুকে ভয় করে জেহাদ থেকে বিরত থাকাও সমীচিন নয়। এজন্যেই পরবর্তী নির্দেশ দিয়ে এরশাদ হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর কেননা দুষ্টের দমনের জন্যে শিষ্টের পালনের জন্যে তথা বিশ্ব-মানবের বৃহত্তম কল্যাণ সাধনের জন্যে জেহাদ এক অনুপম বিধান। এ আয়াতের তফসীরে বিখ্যাত তফসীরকারগণ হযরত ওমর এবনে খাত্তাব (রাঃ)-এর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। হযরত ওমর (রাঃ) একবার সিরিয়ার উদ্দেশে রওনা হলেন, সিরীয় সীমান্তের "সারাগ" নামক স্থানে পৌঁছার পর তাঁকে জানানো হলো যে, সিরিয়াতে এখন মহামারী রয়েছে। এমনি অবস্থায় সিরিয়ার দিকে তিনি অগ্রসর হবেন কি-না? এ সম্পর্কে তিনি উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তখন বিখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুর রহমান এবনে আওফ (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ শোনালেন ঃ

নিশ্চয় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম প্লেগ মহামারী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন, এটি একটি আযাব। এতদ্বারা পূর্ববতী কোন কোন উম্মতকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। এর কিছু অংশ অবশিষ্ট রয়েছে এখন তা কখনও চলে যায় পুনরায় কখনও ফিরে আসে। অতএব, যদি কেউ একথা শ্রবণ করে যে, কোন জায়গায় এ মহামারী দেখা দিয়েছে তবে সেখানে কোন অবস্থাতেই তার গমন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পূর্ব থেকেই সেখানে রয়েছে সে যেন উক্ত স্থান ত্যাগ না করে।[১] (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুর রহমান এবনে আউফের (রাঃ) নিকট থেকে এই হাদীস শ্রবণের পর হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়া সফরের কর্মসূচী বাতিল করলেন। তদানীন্তন

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫৪
তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১০৭

প্রশাসক হযরত আবু ওবায়দাহ্ (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনি কি আল্লাহ্ পাকের তকদীর থেকে পলায়ন করতে চান? তিনি উত্তর দিলেন, আবু ওবায়দা! একথা অন্য কেউ বললে এক কথা ছিল কিন্তু তোমার তরফ থেকে এমন কথা বলা আদৌ সমীচীন নয়। মূলতঃ আমরা আল্লাহ্ পাকের নির্ধারিত তকদীর থেকে আল্লাহ্র নির্দিষ্ট তকদীরের দিকেই পলায়ন করছি। অর্থাৎ আমরা যা কিছু করছি তা আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেকই করছি।

বণী ইসরাইল জাতির যে সব লোকের সম্পর্কে আলোচ্য আয়াতের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাদের সম্পর্কে আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, বণী ইসরাঈলের একজন বাদশাহ তাদেরকে দুশমনের বিরুদ্ধে লড়াই করার নির্দেশ দিয়েছিলো। তারা যথারীতি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু পরে সাহস-চ্যুত হয়ে পড়লো এবং মৃত্যুকে ভয় করতে লাগলো, অতঃপর বাদশাহকে বললো, যে এলাকায় আমাদেরকে যাওয়ার আদেশ দিয়েছেন সেখানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়েছে এমনি অবস্থায় আমরা সেখানে যেতে পারবো না। তখন আল্লাহ্ পাক তাদেরকে মৃত্যুর শাস্তি দিলেন। মৃত্যু থেকে পলায়ন করে তারা বাড়ী-ঘর ছেড়ে ময়দানে আশ্রয় নিল আর তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তাদের জন্যে মৃত্যুর শাস্তি ঘোষিত হলো।[১]

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ
قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗۤ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ؕ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُۜطُ
وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ۝ اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ
مُوْسٰى ۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ
قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا ؕ قَالُوْا وَمَا
لَنَاۤ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا ؕ
فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ
بِالظّٰلِمِيْنَ ۝

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫৪

তরজমা

(২৪৫) কে সেই ব্যক্তি? যে আল্লাহ্ পাককে উত্তম ঋণ প্রদান করবে, ফলে আল্লাহ্ পাক তাকে দ্বিগুণ বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহ্ পাকই রিয্ক সংকুচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন আর তোমাদেরকে তাঁর নিকটই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(২৪৬) (হে রসূল!) আপনি কি জানেন না? মূসার পরবর্তী বণী ইসরাঈলের নেতাদের সম্বন্ধে, যখন তারা তাদের নবীকে বলেছিল, আমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত করুন, যেন আমরা আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করতে পারি, তিনি বলেছিলেন ঃ তোমাদের জন্যে যুদ্ধ ফরজ হলে এমনও হতে পারে যে যুদ্ধ না কর, তারা বলেছিল, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র রাহে যুদ্ধ করব না, অথচ আমাদের ঘর-বাড়ী ও সন্তানগণ থেকে আমরা বিতাড়িত হয়েছি অতঃপর যখন যুদ্ধ ফরজ করা হলো, তখন অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত তাদের সকলেই পশ্চাদ-পসরণ করল, এবং আল্লাহ্ পাক জালেমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই জানেন।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, যখন এ আয়াত নাযিল হয়–

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ- الاية

তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন- "হে পরওয়ারদেগার! আমার উম্মতকে (আল্লাহ্র রাহে দানের বিনিময়) আরও বৃদ্ধি করে দিন"। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে ইমাম রাজী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু দারদা (রাঃ) সম্পর্কে। তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দুটি বাগান আছে যদি তার একটি আমি আল্লাহ্র রাহে দান করি তবে কি তার অনুরূপ বাগান জান্নাতে পাব? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলে, হ্যাঁ পাবে, পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, আমার স্ত্রীও কি ঐ বাগানে আমার সঙ্গে থাকতে পারবে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ, পুনরায় উক্ত সাহাবী প্রশ্ন করলেন, আমার সন্তান-সন্ততিও কি আমার সাথে থাকতে পারবে? তিনি এরশাদ করলেন ঃ হ্যাঁ, তখন তিনি তাঁর সর্বোত্তম বাগানটি আল্লাহ্র রাহে দান করলেন। এ বাগানটির নাম ছিল হোনায়না। এরপর এই সাহাবী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন যা ঐ বাগানেই অবস্থিত ছিল এবং বাগানের প্রবেশ দ্বারে দাঁড়িয়ে তাঁর স্ত্রীকে ডাক দিলেন

এবং সমস্ত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বললেন, তোমরা বেরিয়ে আস কেননা, এই বাগান আমি জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহ্‌র রাহে দান করেছি। তাঁর স্ত্রী সন্তান-সন্ততির হাত ধরে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ আপনার এ ব্যবসায় বরকত দান করুন।

এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে দান করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কর্জ বা ঋণ বলা হয় সেই অর্থ-সম্পদকে যা ফেরত পাওয়া যায়। আলোচ্য আয়াতে শব্দটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে আল্লাহ্ পাকের রাহে যা দান করা হয় তার অনুরূপ নয়; বরং তার চেয়ে বহুগুণ বেশী অবশ্যই পাওয়া যাবে। হযরত আবু বকর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ হে বণী আদম! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম কিন্ত তুমি আমাকে খাবার দাওনি। তখন বন্দা বলবেঃ হে পরওয়ারদেগার। আমি কি করে তোমাকে খাবার দেব অর্থাৎ তুমি হলে বিশ্ব প্রতিপালক। তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন ঃ তোমার নিকট আমার অমুক বন্দা খাবার চেয়েছিল কিন্তু তুমি তাকে খাবার দাওনি, তুমি কি জানতে না সেদিন যদি তাকে খাবার দিতে তবে আমার নিকট তা অবশ্যই পেতে?[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে আল্লাহ্ রাহে জেহাদের কথা বলা হয়েছে আর এ আয়াতে আল্লাহ্‌র রাহে ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। যারা জেহাদে শরীক হতে পারেনি তারা মুজাহেদদের ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব পালন করতে পারে। এতদ্ব্যতীত যারা বিপদগ্রস্ত, দারিদ্র-পীড়িত তাদের দুঃখ দুর্দশা নিবারণ করতে পারে। আর যে দানই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে হয় তাকে আল্লাহ্‌র রাহে দান করা বলা হয়। আল্লাহ্‌র রাহে দান করার সময় একথা উপলব্ধি করতে হবে যে, আল্লাহ্ পাক পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীতে এ দানের বিনিময়ে বহু গুণ দান করবেন। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার উত্তম রোজগার থেকে একটি খেজুর আল্লাহ্‌র রাহে দান করে আল্লাহ পাক তাঁর ডান হাতে কবুল করেন, সে দানকে তিনি অতঃপর লালন-পালন করেন যেমন তোমরা বাছুরকে লালন-পালন কর। এমনকি, সে খেজুরটি একটি পাহাড়ের সমান হয়ে যায়। আর আল্লাহ্ পাক শুধু উত্তম রোজগারই (হালাল) কবুল করেন।

সাধারণত ঃ আল্লাহ্‌র রাহে দান করার সময় নিজের অভাব-অনটনের কথা মনে আসে এ কারণে আল্লাহ্‌র রাহে দান করার ইচ্ছা করেও অনেক সময় বিরত থাকতে হয়। তারই জবাবে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ

(১) তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬৬

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকই মানুষের রিয্ক সংকুচিত করেন এবং বৃদ্ধি করেন, অতএব অভাবের ভয়ে আল্লাহ্র রাহে দানে করা থেকে বিরত থাকা অনুচিত। কেননা আল্লাহর রাহে দান করলে সম্পদ কমে না; বরং বাড়ে। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন ঃ প্রতিদিন সকালে যখন আল্লাহর বন্দাগণ জাগ্রত হয় তখন দু' জন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়। একজন বলে হে আল্লাহ! যে দাতা তাকে বিনিময় দান কর, আর যে কৃপণ তার সম্পদ ধ্বংস কর।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাহে দান করার ফজিলত ও মাহাত্ম অনেক বেশী, আর আল্লাহ্র রাহে দান থেকে বিরত থাকার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এরপর আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

অর্থাৎ অবশেষে তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারেই প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, আল্লাহ্র রাহে দান করা এবং অন্যান্য নেক আমল করে পরকালীন জিন্দেগীর সম্বল সংগ্রহ করা পরিণামদর্শী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।[১]

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَا

(হে রসূল!) আপনি কি বণী ইসরাঈলের সেই দলের কথা জানেন না যারা মূসার মৃত্যুর পর এসেছে।

বণী ইসরাঈল জাতি হযরত মূসা (আঃ)-এর মৃত্যুর পর কিছু দিন পর্যন্ত সঠিক পথে ছিল, কিন্তু কালের চক্রে সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা শেরক ও বেদআতে মশগুল হতে শুরু করলো। এতদসত্ত্বেও তাদের মধ্য নবী প্রেরিত হতে থাকেন, আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে সত্য ও ন্যায়ের হেদায়েত অব্যাহত থাকে কিন্তু বণী ইসরাঈলের অন্যায় অনাচারের কারণে তারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত থেকেও বঞ্চিত হয়, যে বংশে নবীগণ জন্ম গ্রহণ করতেন সে বংশের লোকেরা বিভিন্ন যুদ্ধে মৃত্যু মুখে পতিত হন। শুধু একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা জীবিত ছিলেন যার স্বামী নিহত হয়েছিল। বণী ইসরাঈলের দৃষ্টি তখন নিবদ্ধ ছিল এই মহিলার প্রতি, যদি আল্লাহ্ পাক তাকে কোন পুত্র সন্তান দান করেন আর তাকে যদি নবী হিসেবে মনোনীত করেন তবে নবুওয়্যতের এই নেয়ামত অব্যাহত থাকতে পারে। সেই মহিলা দিনরাত আল্লাহ পাকের দরবারে এ দোয়াই করতেন। অবশেষে আল্লাহ পাক তার দোয়া কবুল করলেন। তার ঘরে আল্লাহ্ পাক একটি পুত্র সন্তান দান করলেন, তার নাম রাখা হলো শীমবীল বা শামউন, যার অর্থ হলো "আল্লাহ্ পাক আমার দোয়া কবুল করেছেন"। মাতা তার এ সন্তানকে তৌরাত শিক্ষা দেয়ার জন্যে বায়তুল মোকাদ্দাসে রেখে এলেন। একজন বয়ো-বৃদ্ধ আলেম তাঁকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এভাবে

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৫৮-৫৯

নবুওয়্যতের বয়স হওয়ার পর যখন তিনি সেই শিক্ষকের নিকট নিদ্রিত ছিলেন তখন তাঁর নিকট জিব্রাঈল (আঃ) আগমন করেন এবং তাঁকে তাঁর বৃদ্ধ শিক্ষকের সুরে "হে শীমবীল" বলে ডাক দেন। তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বৃদ্ধ শিক্ষকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হন এবং বলেন "পিতা! আপনি কি আমাকে ডেকেছেন"? তিনি তখন 'না' বলা সমীচিন মনে করলেন না তাতে তিনি আরো ভীত হলেন, তখন শিক্ষক বললেন, তুমি আরও ঘুমিয়ে থাক। এরপর তিনি পুনরায় নিদ্রিত হলেন। তখন জিব্রাঈল (আঃ) পুনরায় এসে ডাক দিলেন, এবারও তিনি জাগ্রত হয়ে শিক্ষককে প্রশ্ন করলেন ঃ আপনি কি আমাকে ডেকেছেন? তিনি বললেন, যদি এভাবে তৃতীয় বার আমার ডাক শোন তবে আমার ডাকে সাড়া দিও না। কিন্তু তৃতীয় বারও যখন তাঁকে ডাকা হলো তখন তিনি উপলব্ধি করলেন যে এই ডাক শিক্ষকের নয় জিব্রাঈলের (আঃ)। জিব্রাইল (আঃ) তাকে বললেন, "তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট গমন কর এবং তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের পয়গাম পৌঁছাও। কেননা আল্লাহ্ পাক তোমাকে পয়গম্বর মনোনীত করেছেন"।

অতঃপর তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট গমন করলেন কিন্তু তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালো। তাঁকে মিথ্যা জ্ঞান করলো এবং বললো, "যদি তুমি সত্য নবী হও তবে আমাদের জন্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত কর যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহর পথে লড়াই করবো"। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে একজন বাদশাহ নিযুক্ত কর যার নেতৃত্বে আমরা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করতে পারি (সে যুগে বাদশাহ বা রাষ্ট্র প্রধানগণ নবীগণের অনুগত থাকতেন আর নবীগণের হাতেই ছিল বাদশাহদের নিযুক্তির ক্ষমতা)।

قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ

অর্থাৎ হযরত শীমবীল (আঃ) তাদেরকে বললেন, "তোমাদের জন্যে বাদশাহ নিযুক্ত করা হলে এবং তোমাদের প্রতি জেহাদ ফরজ করা হলে এমনও হতে পারে যে তোমরা জেহাদ না কর। তারা বললো, পবিত্র কোরআনের ভাষায় ঃ

قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ

অর্থাৎ তারা বললো, আমাদের কি হয়েছে যে, আমরা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করবো না? আমাদের প্রকৃত অবস্থা এই যে, আমাদেরকে আমাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে, আমাদেরকে আমাদের সন্তান-সন্ততি থেকে দূরে রাখা হয়েছে। কিন্তু যখন তাদের প্রতি জেহাদ ফরজ হলো তখন তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক ব্যতীত সকলেই জেহাদে গমনে অস্বীকৃতি জানালো।

অতঃপর আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক জালেমদের সম্পর্কে খুব ভালো ভাবেই অবগত। হযরত শীমবীল (আঃ)-এর সম্প্রদায় ইতোপূর্বে জেহাদের আকাঙ্ক্ষা পেশ করেছিল। কিন্তু জেহাদ ফরজ করা হলে তারা জেহাদ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে রয়েছে সতর্কবাণী।

বর্ণিত আছে হযরত শীমবীল (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করেছিলেন ঃ "হে আল্লাহ! এই সম্প্রদায়ের জন্যে একজন বাদশাহ প্রেরণ কর"। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁকে দুটি বস্তু দান করলেন (১) একটি লাঠি (২) একটি শিং। এতে ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসের তেল। আর তাঁর প্রতি হুকুম হয়েছিল, যে ব্যক্তি এই লাঠির সমান লম্বা হবে, যখন সে তোমার ঘরে প্রবেশ করবে তখন তুমি দেখবে শিংয়ে সংরক্ষিত তেল উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠবে তখন তুমি এই তেল সেই ব্যক্তির মাথায় মালিশ কর এবং তাঁকে বণী ইসরাঈলের বাদশাহ বলে ঘোষণা কর।

ঘটনাক্রমে তালূত নামক এক ব্যক্তি যিনি পেশার দিক থেকে চামড়ার কাজ করতেন অথবা পানি বিতরণে মশগুল থাকতেন, তাঁর গাধাটি হারিয়ে গিয়েছিলো। তিনি এ সম্পর্কে আলাপ করার জন্যে শীমবীল (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হন। তালুত ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিংয়ে সংরক্ষিত তেল উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠলো। তখন শীমবীল (আঃ) দণ্ডায়মান হলেন এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত লাঠিটি দ্বারা তার মাপ নিলেন এবং তালূতকে লাঠিটির সমান দেখতে পেয়ে মাথায় উক্ত তেল ব্যবহার করলেন এবং তাকে বণী ইসরাইলের বাদশাহ বলে ঘোষণা করলেন।[১]

ইমাম রাজী (রাঃ) লিখেছেন যে, এ আয়াত সমূহের সাথে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহের সম্পর্ক এভাবে রয়েছে যে, পূর্ববর্তী আয়াতে জেহাদ ফরজ বলে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

(এবং তোমরা আল্লাহর রাহে জেহাদ কর) জেহাদের এ ঘোষণার পর আলোচ্য আয়াত সমূহে বণী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে কেননা, বণী ইসরাঈলের প্রতি যখন জেহাদের নির্দেশ হয়েছিল তখন তাদের অধিকাংশ লোক জেহাদের এ নির্দেশকে অমান্য করেছে। আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং এজন্যে আল্লাহ পাক তাদেরকে জালেম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতদ্বারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা যেন বণী ইসরাঈলের ন্যায় আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করো না"।[২]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬০-৬১
(২)তফসীরে কবীর খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৭০

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ
مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ
يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً
فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٤٧﴾
وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۚ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾ ع ١٢ ٣٧

তরজমা

(২৪৭) এবং তাদের নবী তাদেরকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ পাক তালুতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন, তারা বলেছিল, আমাদের উপর তার রাজত্ব কিভাবে সম্ভব হতে পারে? অথচ রাজত্বের জন্যে আমরাই তার চেয়ে অধিক উপযুক্ত এবং তাকে ধন-দৌলতও প্রচুর পরিমাণে দেয়া হয়নি। নবী বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে তাকেই পছন্দ করেছেন এবং তাকে জ্ঞান ও দৈহিক শক্তি বেশী দিয়েছেন, আল্লাহ পাক যাকে ইচ্ছা বাদশাহী দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ পাক অতি উদার, তিনি মহাজ্ঞানী।

(২৪৮) আর তাদের নবী তাদেরকে বলে দিলেন যে, নিশ্চয় তার বাদশাহীর লক্ষণ এই যে, তোমাদের নিকট একটি সিন্দুক উপস্থিত হবে, তাতে তোমাদের পালনকর্তার নিকট থেকে শান্তি এবং মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-এর বংশের অবশিষ্ট বস্তু সমূহ থাকবে। ফেরেশতাগণ তা বহন করে আনবে। যদি তোমরা ঈমানদার হও তবে নিশ্চয় এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে উত্তম নির্দশন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন ঃ লোকেরা যখন পয়গম্বরের নিকট একজন বাদশাহ নিযুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলো তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে হযরত তালূতকে বাদশাহ নির্বাচন করে তাঁর জাতির সম্মুখে পেশ করলেন। তালূত শাহী খান্দানের লোক ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক। ইয়াহুদার বংশধররাই ছিল শাহী খান্দান। তাই তাঁর বাদশাহ

নিযুক্তির ব্যাপারে লোকেরা এ প্রশ্ন উত্থাপন করলো যে, তালূত বাদশাহ হওয়ার উপযুক্ত নয়, বাদশাহ হওয়ার যোগ্য আমরা।

দ্বিতীয়ত ঃ তার নিকট অর্থ-সম্পদও নেই, সে একজন দরিদ্র ব্যক্তি। তালূতকে বাদশাহ হিসেবে গ্রহণ না করার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নবীর হুকুম অমান্য করা হলো। নবী শীমবীল (আঃ) তাদেরকে জবাব দিলেন যে, তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করা আমার কাজ নয় যে, আমি এতে কোন প্রকার পরিবর্তন করতে পারব বরং এটি আল্লাহ্‌র হুকুম যা মেনে নেয়া আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য।

এতদ্ব্যতীত, তালূত তোমাদের মধ্যে একজন বড় আলেম বা শিক্ষিত ব্যক্তি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি। তিনি দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী।

এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বাদশাহকে হতে হবে জ্ঞানী, শক্তিশালী, দেখা-শুনায়ও তাকে হতে হবে আকর্ষণীয় এবং মেধাবী ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারী।

আর এ আয়াতে একথাও এরশাদ হয়েছে যে, ক্ষমতার মূল উৎস বা প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীন।

وَاللّٰهُ يُؤْتِىْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَآءُ

"তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতার মালিক নিযুক্ত করেন"।

পবিত্র কোরআনে এ বিষয়টির ঘোষণা অন্য আয়াতে এভাবে রয়েছে ঃ

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِى الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুণ, হে আল্লাহ্! তুমিই মুলকের মালিক, তুমিই ক্ষমতার উৎস, তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে ক্ষমতা দান কর, যাকে ইচ্ছা তার নিকট থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও। তুমি যাকে ইচ্ছা তাকে সম্মানিত কর, যাকে ইচ্ছা তাকে অপমানিত কর। তোমার হাতেই রয়েছে সার্বিক কল্যাণ, তুমি সর্বোপরি সর্বশক্তিমান"।

وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অর্থাৎ তাঁর দান বিশাল বিস্তৃত, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন, তিনি মহাজ্ঞানী, কাকে দান করা উচিত তা তিনি ভাল ভাবেই জানেন।

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ- الاية

অর্থাৎ যারা তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করার ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করেছিল তাদেরকে তাদের নবী বললেন ঃ তালূতকে বাদশাহ নিযুক্ত করার জ্বলন্ত নির্দশন হিসেবে তোমাদের নিকট আসবে তাবুত। তাবুত হলো একটি কাষ্ঠ নির্মিত সিন্দুক, তিন হাত লম্বা, দু' হাত চওড়া এতে রয়েছে তোমাদের জন্যে শান্তি, এ তাবুতে মূসা (আঃ) এবং হারুন (আঃ)-এর পরিত্যক্ত অনেক বরকতময় জিনিস রয়েছে যা ফেরেশতাগণ বহন করে আনবে। তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ সিন্দুকটি অত্যন্ত বরকতময় ছিল, বণী ইসরাঈল যখন কোন যুদ্ধে গমন করতো তখন এই তাবুতকে সম্মুখে রাখতো এবং এর বরকতে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে বিজয় দান করতেন, যখন এই সিন্দুক অগ্রসর হতো তখন তারাও তার অনুসরণ করতো। আর যখন সিন্দুক থেমে যেতো তারাও সঙ্গে সঙ্গে দাড়িয়ে যেতো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন, এ তাবুতটিকে ফেরেশতাগণ আসমান এবং যমিনের মধ্যখানে উঠিয়ে রেখেছিলেন এবং অতঃপর সেখান থেকে জনগণের সম্মুখে হযরত তালূতের নিকট পেশ করা হলো। এ দৃশ্য দেখার পর শীমবীল (আঃ)-এর নবুওয়্যত এবং হযরত তালূতের বাদশাহীর প্রতি তাদের পূর্ণ বিশ্বাস হলো। এজন্যে এরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ নিশ্চয় এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে এক জীবন্ত নিদর্শন যদি তোমরা প্রকৃত মোমেন হও।

তাবুত সম্পর্কে তফসীর গ্রন্থ সমূহে আরও বহু বিবরণ রয়েছে।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬২
তফসীরে এবনে কাসীর খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১০
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১১০

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ
بِالْجُنُوْدِ ۙ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ۚ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ۚ
وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْٓ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً ۢ بِيَدِهٖ ۚ فَشَرِبُوْا
مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۙ قَالُوْا
لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ۗ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا
اللّٰهِ ۙ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ مَعَ
الصّٰبِرِيْنَ ۝٢٤٩

তরজমা

(২৪৯) পরে যখন তালূত সৈন্যদেরকে সঙ্গে নিয়ে বের হলো, সে বললো নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক একটি নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা নেবেন, অতঃপর যে সেই নদী থেকে (পানি) পান করবে সে আমার দলভুক্ত নয় এবং যে তা পান করবে না তবে হ্যাঁ শুধুমাত্র একটি অঞ্জলী যে পান করবে সে আমার দলভুক্ত (থাকতে পারবে)। অতঃপর অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত সকলেই তা পান করলো। অনন্তর যখন সে এবং তার সাথী মোমেনগণ নদী পার হলো তখন তারা বললো আজকের দিনে জালূত এবং তার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নেই। যারা আল্লাহ্ পাকের দরবারে হাযির হবে বলে বিশ্বাস করেছিল তারা বললো ঃ আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছায় বহু ছোট দল বড় দলের উপর জয়ী হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক বিপদে ধৈর্য ধারণকারীদের সাথেই আছেন।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতেও পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত ঘটনার অংশ বিশেষ বর্ণিত হয়েছে, যখন বণী ইসরাঈল তালূতের বাদশাহী মেনে নিল তখন তিনি তাদের নিয়ে জেহাদের জন্যে রওনা হলেন। তফসীরকার সাদীর মতে, এদের সংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। তালূত তাদেরকে বললেন, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন একটি নহরের পানি দ্বারা, যারা এই নহরের পানি পান করবে তারা আমার সাথে জেহাদে যেতে পারবে না, অথবা পান করলেও এক অঞ্জলী মাত্র, তারা আমার সাথে জেহাদ করতে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে, এই নদীটি হলো জর্ডান এবং ফিলিস্তিনের মধ্যে অবস্থিত। এর নাম হলো নাহরুশ শারিআহ্।

তালূতের সতর্কবাণী উচ্চারণ করা সত্বেও বণী ইসরাঈলের অধিকাংশ লোক সেই নহরের পানি পান করেছিল, যদিও তারা ছিল তৃষ্ণার্ত কিন্তু তালূতের হুশিয়ারী বাণী উচ্চারণের কারণে তাদের সবর অবলম্বন করা উচিত ছিল।

কিন্তু তারা তালূতের হুকুম অমান্য করলো এবং পানি পান করলো। এদের মধ্যে যারা সুদৃঢ় ঈমানের অধিকরী ছিল তারা তালূতের নির্দেশ মোতাবেক পানি পান থেকে বিরত রইল তথা সবর অবলম্বনের মাধ্যমে বাদশাহর আদেশ পালন করলো। তফসীরকারগণ বলেছেন, ৮০ হাজারের মধ্যে ৭৬ হাজার লোক পানি পান করেছিল। শুধমাত্র ৪ হাজার লোক নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করলো।

যারা নিষিদ্ধ পানি পান করলো, তাদের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়ে যায়, তারা হীনবল হয়ে জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অস্বীকৃতি জানালো। যারা ঈমানদার ছিলেন, তারা এ সাহসহীন লোকদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, জয় পরাজয় সম্পূর্ণ আল্লাহ্ পাকের হাতে, সবর অবলম্বন করলে এবং নিয়ত সঠিক হলে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভ করা যায়। ইতিহাস সাক্ষী! কত ছোট দল বড় দলের উপরে বিজয়ী হয়েছে, আর তা হয়েছে আল্লাহ্ পাকের সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে। অতএব আল্লাহ্র প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখ, সংকল্পে দৃঢ়তা অর্জন কর। আল্লাহ্র সাহায্যের যে অঙ্গীকার রয়েছে তার প্রতি আস্থা রাখ এবং সবর অবলম্বন কর। এ সবরের বরকতে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন ঃ

وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

আর আল্লাহ পাক সবর অবলম্বনকারীদের সাথে রয়েছেন এবং যাদের সাথে আল্লাহ পাক রয়েছেন তাদের সাফল্য যে সুনিশ্চত একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا
صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ۝ فَهَزَمُوْهُمْ
بِاِذْنِ اللّٰهِ ۙ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَ
عَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۙ
لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ۝
تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ۗ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝

তরজমা

(২৫০) আর যখন তারা জালূত ও তার সেনাবাহিনীর মোকাবেলায় উপস্থিত হলো তখন (আল্লাহ্ পাকের দরবারে মোনাজাত করে) বললো-হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান করুন এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন আর আমাদেরকে এই কাফের সম্প্রদায়ের উপর বিজয় দান করুন।

(২৫১) অতঃপর আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তারা জালূত ও তার বাহিনীকে পরাজিত করেছিল এবং দাউদ জালূতকে নিহত করেছিল, আর আল্লাহ্ পাকই তাঁকে বাদশাহী এবং জ্ঞান দান করেছিলেন। যদি আল্লাহ্ পাক একদলকে অন্য দল দ্বারা দমন না করতেন তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করতো। কিন্তু আল্লাহ্ পাক বিশ্ববাসীর প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।

(২৫২) (হে মোহাম্মদ!) এই সমস্ত আল্লাহ পাকের নিদর্শন যা সঠিক ভাবে আপনার নিকট পাঠ করছি এবং নিশ্চয় আপনি রসূলগণের অন্যতম।

তফসীরুল কোরআন

এ আয়াতেও উপরোক্ত ঘটনার অবশিষ্টাংশ স্থান পেয়েছে। তালূতের নেতৃত্বে এ সংক্ষিপ্ত দলটি জালূতের মোকাবেলায় উপস্থিত হলো, অর্থাৎ যারা নহরের পানি পান না করে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে তারাই আল্লাহ্র রাহে জেহাদের উদ্দেশে রণাঙ্গনে হাযির হওয়ার তওফিক পেয়েছে। তারা জালূতের সৈন্যবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এই বলে মুনাজাত করলেন ঃ হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে সবর অবলম্বনের শক্তি দান করুন। হে আল্লাহ্! আমাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকার তওফিক দান করুন। আমাদেরকে দুশমনের উপর বিজয় দান দান করুন। আল্লাহ্ পাক তাদের এ দোয়া কবুল করেন, ফলে তারা আল্লাহ্ পাকের সাহায্য লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তারা জালূত বাহিনীকে পরাজিত করে।

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ

অর্থাৎ দাউদ জালূতকে হত্যা করে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত দাউদ (আঃ) তখন অল্প বয়স্ক যুবক ছিলেন। বকরী চরানোই তাঁর কাজ ছিল। তিনি তাঁর পিতা এবং তেরজন ভাই সহ তালূতের সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের নবীর নিকট আল্লাহ্ পাক এই ওহী প্রেরণ করেন, এ যুবকই জালূতকে হত্যা করবে, পথে তিনটি পাথরকে আল্লাহ্ পাক বাকশক্তি দান করেন। তারা দাউদকে বলে, আমাদের উঠিয়ে নাও, কারণ তুমি আমাদের দ্বারাই জালূতকে মারবে, তাই তিনি ঐ পাথরগুলো সঙ্গে নিয়ে নিলেন। তালূত তাঁকে একটি ঘোড়া, একটি লৌহ ও একটি তরবারি দিতে চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেন, যদি আল্লাহ পাক আমাকে সাহায্য না করেন তবে এসব বস্তু আমার

জন্যে উপকারী হবে না, এজন্যে তিনি ঐসব বস্তু সেখানেই রেখে দিলেন এবং ঐ পাথর গুলো নিয়ে দুশমনের দিকে অগ্রসর হলেন, হযরত দাউদ (আঃ) বেঁটে ছিলেন এবং সর্বদা অসুস্থ থাকতেন, এজন্যে বর্ণ ছিল তাঁর হলুদ। তাকে যখন জালূত দেখলো, সে ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী মানুষ, সে একাই অনেকের মোকাবেলা করত কিন্তু আল্লাহ পাক তার অন্তরে দাউদ (আঃ)-এর প্রভাব সৃষ্টি করে দিলেন। সে তাঁকে দেখেই বললো, তুমি কি আমাকে হত্যার জন্যে পাথর নিয়ে এসেছ? যেমন মানুষ কুকুরকে পাথর দ্বারা মারে। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি তো কুকুরের চেয়ে নিকৃষ্ট। অতঃপর "বিছমে এলাহি, ইবরাহীমা ওয়াইসহাকা ওয়া ইয়াকুব" বলে তিনটি পাথর একসঙ্গে জালূতের কপাল লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করলেন, এতে জালূত নিহত হলো। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ

এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করলো। অতঃপর তালূত দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিলেন।

তালূতের মৃত্যুর পর আল্লাহ্ পাক দাউদ (আঃ)-কে দান করলেন বাদশাহী এবং হেকমত। এ আয়াতে উল্লেখিত 'হেকমত' শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন তফসীরকারগণ নবুওত দ্বারা অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যেমন দাউদ (আঃ)-কে বাদশাহী দান করেছেন তেমনি নবুওয়্যতের দ্বারাও ধন্য করেছেন। এ পর্যায়ে কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বণী ইসরাঈলের মধ্যে এই প্রথম একজন ব্যক্তিকে বাদশাহী এবং নবুওয়্যত এক সঙ্গে দান করা হলো। এবং وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَآءُ অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক যা ইচ্ছা তা তাঁকে শিক্ষা দিলেন কেননা, আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যবুর কিতাব নাযিল করেছেন। অন্যদিকে তাঁকে লৌহবর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়েছেন এবং লৌহকে তাঁর জন্যে মোমের ন্যায় নরম করে দিয়েছেন। তিনি স্বহস্তে রোজগার করতেন তাঁর আহার্য। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম খাবার তাই যা মানুষ স্বহস্তে রোজগার করে। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আঃ) স্বহস্তে রোজগার করে তাঁর আহার্য গ্রহণ করতেন। (বোখারী শরীফ)

আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে পাখি এবং পিপীলিকার ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মধুর কণ্ঠস্বর দান করেছেন। তিনি যখন যবুর পাঠ করতেন তখন বনের পশুরা পর্যন্ত তাঁর নিকট একত্রিত হতো। এ অবস্থায় মানুষ সেগুলোকে ধরে ফেলত, অগণিত পাখি তাঁর মাথার উপর জড়ো হতো এবং তাঁর প্রতি ছায়া ফেলত, প্রবাহিত পানির গতি বন্ধ হয়ে যেত এবং বাতাস থেমে যেত।[১]

(১) তফসীরে মাজহারী খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৬৭

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ-الاية

অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ পাক মানুষের মধ্যে একজন দ্বারা অন্যজনকে দমন না করতেন, তবে পৃথিবীতে অশান্তি বিরাজ করতো, যেমন জালূতকে দমন করা হয়েছে তালূতের দ্বারা। অতএব জেহাদের বিধান প্রবর্তনের মাধ্যমে আল্লাহ পাক মানব জাতির বিশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

এ আয়াতে পৃথিবীর বুকে যে সমস্ত পরিবর্তন হয়, যে সব বিপ্লব ঘটে তার হেকমত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক মহান দাতা, তাঁর দান অনন্ত-অসীম। তিনি করুণাময়, তিনি দয়াময়। তাঁর দয়া-মায়ার কারণেই জালেমের জুলুমের অবসান ঘটে, মজলুম পায় পরিত্রাণ। তিনি ভাল লোকের দ্বারা মন্দ লোকের ক্ষতি সাধন থেকে মানুষকে রক্ষা করবেন।

تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ

এ নিদর্শন সমূহ অর্থাৎ বণী ইসরাঈলের যে ঘটনাবলী এ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যেমন মৃত্যুর ভয়ে হাজার হাজার মানুষের বাড়ী-ঘর থেকে পলায়ন, আল্লাহ্র আদেশে তাদের মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া, আল্লাহ্র নবীর দোয়ার বরকতে পূর্নজীবন লাভ করা, দারিদ্র প্রপীড়িত তালূতের রাজত্ব লাভ এবং জালেম জালূতের মোকাবেলায় বিজয়, দুর্বল দাউদের দ্বারা জালূতের হত্যা, দাউদের নবুওয়্যত ও বাদশাহী একই সাথে লাভ করা প্রভৃতি আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত এবং কুদরত ও হেকমতের জ্বলন্ত প্রমাণ ও উজ্জ্বল নিদর্শন। (হে রসূল!) এই সমস্ত সত্য ঘটনার বিবরণ আপনার নিকট নাযিল করছি কেননা, আপনি আমার প্রেরিত রসূল শুধু তাই নয়; বরং শীর্ষতম রসূল, সাইয়্যেদুল মুরসালীন বা নবী রসূলগণের দলপতি, কোন কিতাবাদি পাঠ না করেও এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী আপনি বর্ণনা করেছেন তা আপনার নবুওয়্যত ও রেসালতের সত্যতার অকাট্য প্রমাণ।

একথা সুস্পষ্টভাবে আপনি লক্ষ্য করেছেন যে, পূর্বের আম্বিয়ায়ে কেরামের সঙ্গে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা কি ব্যবহার করেছে, কিভাবে তাদের অবমাননা করা হয়েছে। অতএব, (হে রসূল!) আজ যদি কেউ আপনার নবুওয়্যতকে অস্বীকার করে তবে আশ্চর্যন্বিত ও দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নেই কেননা, আপনি আল্লাহ্র রসূল, একথা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সত্য।

وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

"নিশ্চয় আপনি আল্লাহ্র রসূলগণের অন্যতম"।

ইতিপূর্বে রসূলগণের বিরোধিতা করা হয়েছে কিন্তু অবশেষে জয় তাদেরই হয়েছে। এ অবস্থা আপনার জীবনেও হবে। যারা ভাগ্যবান, তারা আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে, আর যারা ভাগ্যাহত তারা আপনার হেদায়েত থেকে বঞ্চিত থাকবে। আপনার দায়িত্ব তো শুধু আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়া।

পবিত্র কোরআনের ভাষায় :

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ.

"আর সুস্পষ্টভাবে আল্লাহ্‌র বাণী পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব"।

আলহামদুলিল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআন ২য় খণ্ড এখানেই সমাপ্ত।

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf